আমরা কোথায় চলেছি

বরুণ সেন

মৌসুমী প্রকাশনী • কলিকাতা-৯

প্রকাশকাল :

এপ্রিল, ১৯৬১

প্রকাশক :

শ্রীদেবকুমার বসু

মৌসুমী প্রকাশনী

১৫।২এ, কলেজ রো

কলিকাতা-৯

মুদ্রক :

শ্রীশরৎচন্দ্র গুড়ে

নারায়ণী প্রেস

২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :

শ্রীপ্রণব শূর

এ গ্রন্থের জন্য কোন ভূমিকা লেখার কথা ভাবিনি। কারণ, এ গ্রন্থের নামই গ্রন্থটি সম্পর্কে একটি ভূমিকা।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে আজ তেইশ বছর অতিক্রান্ত। বস্তুত, স্বাধীনতার কী স্বাদ আমরা পেয়েছি! ব্যক্তিগতভাবে আমার যা মনে হয়েছে, তা হল, সমগ্র ভারতবাসীকে পরাধীনতার জেল থেকে বার করে এনে স্বাধীনতার জেলে পুরে রাখা হয়েছে। শুধু দুটি কথা—স্বাধীনতা আর পরাধীনতা! দুটি শব্দের মানে আলাদা—কিন্তু অবস্থা এক।

বাংলার তথা ভারতবর্ষের গত তেইশ বছরের রাজনীতিতে নেতাদের দেউলিয়া নেতৃত্ব, দুর্নীতি-প্রশ্রয়, দ্বিধাগ্রস্থতা, অপরিনাম-দর্শিতা আজ সমগ্র ভারতবাসীকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে! একটি জিজ্ঞাসা, আমরা কোথায় চলেছি— ?

-লেখক

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা ও শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে

বরুণ সেন-এর অন্যান্য রাজনৈতিক গ্রন্থ

ইয়েনান থেকে শ্রীকাকুলাম

হো চি মিন ও ভিয়েতনাম

সাজানো সেনাপতি

আমরা স্বাধীন! পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষ আজ একটা স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত। দুনিয়ার বনেদী সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীন হয়েছে। ফিরে পেয়েছে নাগরিক অধিকার। অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছি আমরা। ইংরেজের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি শাসন ক্ষমতা। কিন্তু রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে নয়, দুর্বার গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে। কংগ্রেস তথা মহাত্মা গান্ধীর বলিষ্ঠ নির্ভুল নীতি এবং নেতৃত্ব ভারতাত্মার মুক্তি এনেছে। অহিংসার মহামন্ত্রে হিংসা ভুলিয়ে ইংরেজকে পাঠিয়ে দিয়েছে তার আপন ঘরে। যে ইংরেজ ছিল দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, শাসনে শোষণে ছিল নিষ্ঠুর জহ্লাদ, দয়া মায়া মমতাহীন পিশাচ, অহিংসার মহামন্ত্রে ভুলে গেল নিষ্ঠুরতা, চরিত্রের ঘটলো আমূল পরিবর্তন, শত্রু থেকে বন্ধু হয়ে উঠলো! ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতার দাবীকে মেনে নিল। স্বাধীন হলাম আমরা!

ভারতবর্ষের মানুষের জীবনের স্মরণীয় দিন উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের পনেরোই আগষ্ট। বিদেশী শাসনমুক্ত ভারতবর্ষ। দুঃস্বপ্নের রাত্রি প্রভাতে নবজীবনের অরুণোদয়। জনজীবন মুক্তির আনন্দে উত্তাল—আত্মহারা। স্বাধীনতা মুক্তি! পরাধীনতার নাগপাশ মুক্ত ভারতের মানুষ আমরা, আপন অধিকারে অধিকারী। সুখ-শান্তি সাম্য মৈত্রীর রাখীবন্ধন উৎসব। প্রেম-প্রীতি, স্নেহ মমতা

সেবা ভালবাসায় জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার প্রতিজ্ঞা। আশা-আকাঙ্খা স্বপ্ন সম্ভাবনায় জীবন হবে বিকশিত। আমরা এক জাতি, একপ্রাণ—আমরা মানুষ!

মানুষ! ভারতবর্ষের মানুষ। সোনায় সম্পদে ভরা শুধুমাত্র একটা দেশ নয়, তার মানুষগুলোও সহজ সরল সুন্দর। সুখ শান্তি সমৃদ্ধিতে ভরা একটা দেশ। অশান্তিতে যে ছিল না তা নয়, অশান্তি ছিল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বুদ্ধিবলে যথেষ্ট উন্নত হলেও অন্যের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি। কিন্তু ঠগ্ জোচ্চর বিদেশী বেনিয়া লুন্ঠনকারী দস্যু, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ নামধারী পরস্ব অপহরণকারী পশুর দল ভারতবর্ষের মানুষের সরলতা উদারতা বন্ধুত্ব প্রীতি আতিথেয়তার সুযোগ নিয়েছে। বন্ধুত্বের মুখোশ টেনে ফেলে দিয়ে হিংস্র থাবা বসিয়েছে। আপন দেশের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে লুঠে নিয়ে গেছে ভারতের সোনার সম্পদ। মুঘল পাঠান, আর্মানী দিনেমার ফরাসী জার্মান, পর্তুগীজ, মগ বিভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন ধারায় এসেছে—গেছে। উদ্দেশ্য একটি, সোনার দেশের সম্পদ লুন্ঠন।

নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে জাতীয়তা-বোধ ও চেতনাকে। ধর্মকে করেছে কলঙ্কিত। শিশু আর নারীদের চালান দিয়েছে বিদেশের বাজারে। আত্মতৃপ্তি লাভ করে ভেবেছে, হিন্দুস্থান শেষ—তারা জয়ী। মানুষের মনুষ্যত্ব বোধ নিঃশেষিত, আত্মচেতনা মৃত। শবের শ্মশান ভ্রমে প্রেতের নৃত্য সুরু করেছে স্বেচ্ছাচারীর আত্ম অহঙ্কারে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, অত্যাচারের প্রান্ত সীমায় উপনীত বিদেশী দস্যুর দল বিস্ময় বিভ্রান্তিতে হয়েছে উদ্‌ভ্রান্ত। খুশির খোয়াব শেষ হয়ে গেছে তাদের। মরা নদীর দুকূল ভাসিয়ে দেখা দিয়েছে প্লাবন। জনজাগরণের ঢেউয়ে ঢেউয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথ পায়নি কেউ, কেউ-বা নিয়েছে শেষশয্যা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস। সে ইতিহাস ত্যাগের, ধর্মের-প্রেমের-

জ্ঞানের। বন্ধুর আপনজন—অন্ধের আলো। জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী, ভারতবর্ষ তাই মার খেয়েছে দিনের পর দিন। লোভীর লালসা মিটিয়েছে নিজেকে নিঃশেষ করে।

একদিন হিন্দুস্থানের মাটিতে সুযোগ সন্ধানী ইংরেজ এসেছে বন্ধুত্বের মুখোশ এঁটে। এক বিদেশী লুণ্ঠনকারীর কাছে আর এক বিদেশী লাভ করেছে শোষণের অধিকার। বেনিয়া ইংরেজ বেচা-কেনার হাট বসিয়েছে। বাণিজ্যের অন্তরালে চলেছে তাদের ষড়যন্ত্র। তলে তলে শক্তি সঞ্চয় করেছে। কালে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃত স্বরূপ। ব্রিটিশের নগ্নমূর্তি। বনিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। শাসনের সঙ্গে অবাধ শোষণ। কিন্তু লোভ আর লালসায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তারা হয়নি। ফন্দিবাজির ফিকির খুঁজেছে, সৃষ্টি করেছে বেইমানের দল, ছলনা করেছে নানাভাবে একটা দেশকে— সমগ্র জাতিকে নির্জীব করে তুলতে চেয়েছে শাসনে-সোহাগে, ছলনায়-প্রলোভনে। জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে চেয়েছে তাদের কূটনীতির শতেক অপকৌশলে।

ছুনিয়ার সেরা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। তারা দেশকে শাসন শোষণের সঙ্গে সোহাগ করেছে। তাদের ছলনার নানা পন্থা, নানা পথ। অগ্রগতিকে থামিয়ে রাখেনি, শিক্ষাকে পথ করে দিয়েছে, সভ্যতার নামে ব্যাভিচারের বীজ বপন করেছে, সৃষ্টি করেছে নতুন জাতি। সৃষ্টি করেছে বেইমানের দল, দেখিয়ে দিয়েছে বিভেদের পথ। কোন চেষ্টাতেই তারা ত্রুটি রাখতে চায়নি।

তবু ব্যর্থ হয়েছে তাদের সব প্রয়াস। ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে কিছু ছুরন্ত দামাল ছেলে। অবাধ্যতা সুরু করেছে। প্রভুত্বের মহিমাকে গ্রহণ করেনি। দিনের পর দিন চিন্তা করেছে, পথ খুঁজেছে। অবশেষে পথের সন্ধান পেয়েছে তারা। সে পথ মৃত্যুর-জীবনের, আলোর রক্ত বন্দনার। সন্ধি নয়—সংগ্রাম। মেরে মরার নীতি গ্রহণ

করেছে তারা। অন্যায়ের শাস্তি দিতে চেয়েছে। চূর্ণ করতে চেয়েছে পরাধীনতার শৃঙ্খল।

নির্ভিক দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে তারা তাদের লক্ষ্যপথে। স্ত্রী-পুত্র পিতা মাতা কেউ তাদের পথ রোধ করতে পারেনি। গর্ভধারিনী মায়ের চেয়েও দেশমাতৃকার দাবীকে তারা বড় ভেবেছে। আপন প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মরণ যজ্ঞে। একমাত্র লক্ষ্য, বিদেশী শাসনের অবসান। কোন আপোষ নয়। আপোষের প্রশ্ন ওঠে না। আপোষের কথা ভাবে ভীরু দুর্বল কাপুরুষ সুবিধাবাদীর দল। আপোষ কাদের সঙ্গে? কিসের আপোষ? এদেশ আমাদের। এদেশের অধিকারী আমরা। আমাদের দেশ যারা অন্যায় ভাবে অধিকার করে শাসন-শোষণ চালাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সন্ধি করা শুধুমাত্র অন্যায় নয়, অমার্জনীয় অপরাধ। ইংরেজ ভারত ছাড়ো। যদি না যাও, মেরে তাড়াবো তোমাকে। যত অন্যায় অত্যাচার তুমি করেছো তার শাস্তি তোমাকে দেব। ভুলের ক্ষমা আছে কিন্তু শয়তানকে ক্ষমা করা অন্যায়।

দেশের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী যুবকদের হাতে গর্জে উঠেছে আগ্নেয়াস্ত্র। শাসকের শক্তি উপেক্ষা করে লুণ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার। বুড়িবালামের তীরে চলেছে মরণ-পণ সংগ্রাম।

শাসক-শক্তি দিশাহারা। আঘাতের ভয়ঙ্করতায় অস্থির চঞ্চল। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শেষের সেদিনের ছবি। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ইংরেজ আর তার বংশবদের দল দামাল ছেলেগুলোকে ধরার জন্যে পথ প্রান্তর গ্রাম সহর তোলপাড় করেছে। অত্যাচারের চাবুক হাঁকিয়েছে শত-সহস্র নিরপরাধী মানুষের পিঠে। শান্তির সংসার করেছে তছনছ,সেই সঙ্গে উপলব্ধি করেছে দিন শেষের বেলা। ঘুমন্ত শক্তি জেগেছে, জাগছে। অত্যাচারীর শাস্তি তাকে গ্রহণ করতেই হবে।

শাস্তির ভয়ে দুরু দুরু কেঁপে উঠেছিল বুক। সন্ধান করেছিল পথের। অবশেষে পথ পেয়েছে, জয়ী হয়েছে পশুশক্তি। এসেছে স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা! আমরা স্বাধীন-মুক্ত। বিদেশী শাসকের দল ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে ফিরে গেছে আপন দেশে। সেই সঙ্গে আমাদের সুবিধার জন্ত দেশটাকে দু'টুকরো করে দিয়ে গেছে। সৃষ্টি করে গেছে দুটো জাতি। অখণ্ড ভারতের দুই অংশ আজ পরস্পরের শত্রু। ইংরেজের মহত্ব পরস্পরকে চিনিয়ে দিয়ে গেছে, কানে দিয়ে গেছে হানাহানির মন্ত্র। আমরা যতবার কাছাকাছি হতে গেছি, তারা সরগোল তুলেছে। আমাদের নিয়ে তাদের চিৎকারের শেষ আজও হয়নি। কারণ অবিভাবকের দায়িত্ব বোধ এড়িয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরাও তাদের অবিভাবকত্ব মেনে নিয়েছি। তাদের তুষ্ট করতে আমরা যেন বাধ্য। সেই বাধ্যতার সামান্ত নিদর্শন, লণ্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে আজ স্বাধীনতা লাভের সুদীর্ঘ বছর পরেও বিট্রিশ-সিংহের স্মরণচিহ্ন বিগুমান। আমাদের দাসত্বের দাসখত।

আমরা স্বাধীন?

সত্যাই আমরা স্বাধীন। স্বাধীনতার স্বপ্ন আজ স্মৃতি-বিস্মৃতির পথযাত্রী। প্রতি বছর পনেরোই আগষ্ট হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়, আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। সরকারী ছুটি, স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিবস পালনের সরকারী আয়োজন কিছুটা ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে কিন্তু প্রাণের উত্তাপ অনুভূত হয় না। ভারতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ক্ষুধার্ত নিরন্ন মানুষের কাছে স্বাধীনতা রূপকথা। সে রূপকথার নায়ক যারা তারা রাজপুত্র, কোটালপুত্র, মন্ত্রীপুত্রের দল। আর লক্ষ কোটি মানুষের মনে অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা—সত্যিই আমরা স্বাধীন?

সত্যাই আমরা স্বাধীন। সাতচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের চৌদ্দই আগষ্ট মধ্যরাত্রে আমরা জেগে উঠেছি। সেদিন নিদ্রামগ্ন জাতির জাগরণ সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন পণ্ডিত নেহেরু। আমাদের জাগরণ-সংবাদ জানিয়ে আবেগে উচ্ছ্বাসে তিনি তাঁর ধরা-ধরা গলায় বলেছিলেন, 'আজ মধ্যরাত্রে যখন সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়বে, ঠিক সেই সময় ভারত জেগে উঠে এক নতুন ও স্বাধীন জীবন লাভ করবে।'

আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম, জেগে উঠেছি। সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখের বিস্ময় কাটতে না কাটতে যন্ত্রণায় আর্তনাদে ককিয়ে উঠেছি। রক্তে লাল হয়ে গেছে মাটি। ভাই বসিয়েছে ভাইয়ের বুকে ছুরি, মা হয়েছে ধর্ষিতা, বোনের কুমারী স্বপ্ন হয়েছে কলঙ্কিত। আর্তনাদ হাহাকারে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ। স্বাধীনতার উৎসব।

দর্শকের দল সেদিন দু'চোখ ভরে দেখছে সে দৃশ্য। বা হো রে। কি অপরূপ দৃশ্য। কি মনোমুগ্ধকর করুণ বিলাপধ্বনি। জীবন স্বার্থক! ধন্য ভারত! তোমার তুলনা মেলা ভার! তোমার স্বাধীনতার উৎসব যেন চিরস্থায়ী হয়।

স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠানকারীর দল সেদিন অক্লান্ত কর্মী। প্রাণ প্রাচুর্য্যে কানায় কানায় পূর্ণ। উৎসবে ত্রুটি থাকলে চলবে না। 'ফটোগ্রাফার, আমার চেষ্টাকৃত বিষন্ন করুণ মুখোচ্ছবি তোমার ক্যামেরার লেন্সে ঠিক ঠিক ধরা পড়বে তো?··· রিপোর্টার, আমার বিবৃতি ভাল করে লিখে নাও, যেন ভুল না হয়। মনে রেখ, ভুলের ক্ষমা নেই।'

ভ্রান্ত নেতৃত্ব, ভণ্ড নেতৃত্ব, লোভী নেতৃত্ব। ক্ষমতা লাভের মোহে অন্ধ স্বার্থপর কিছু মানুষ অন্যায় আপোষে স্বাধীনতা লাভের নামে ভারতের জনগণের পায়ে নতুন শিকল পরিয়ে দিয়েছে। নেতা সেজে বাজার গরম করেছে। ভারতের ভাগ্য বিধাতার স্বপ্ন সফল করেছে আপন আপন জীবনে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন? কি পেয়েছে তারা? দারিদ্র অনাহার অশিক্ষা দূর হয়েছে কি মানুষের জীবন থেকে? হয়নি। হবে না। কারণ দেশের মানুষ যদি আজ দুবেলা পেটপুরে খেতে পায়, যদি দূর হয় দারিদ্র, অশিক্ষার অন্ধকার কেটে যায় মন থেকে— তাহলে যে ফাঁকির বেসাতি বন্ধ হয়ে যাবে। রাজা সাজার লোক ঠকানো খেলা চলবে না আর। স্বাধীনতার স্বাদ তিক্ত হয়ে উঠবে।

ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছিল। সে চাওয়া ছিল

আন্তরিক। সে চাওয়ার মধ্যে প্রত্যাশার স্বপ্ন কেঁপেছিল। ঠকানো হয়েছিল মানুষকে। বোঝানো হয়েছিল, যত অনিষ্টের মূলে ইংরেজ। ইংরেজ চলে গেলে সুখের দিন, শান্তির দিন, নিরাপত্তার দিন ফিরে আসবে। ইংরেজকে সাগর পারে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা সে-দিন ফিরিয়ে আনবো। আমরা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবো।

প্রতিষ্ঠা হয়েছে মানুষের অধিকার। আমরা স্বাধীন। মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের দল আজ সমগ্র জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা। তাদের ইচ্ছাই ইচ্ছা। তারা ঐশ্বর্যে বিলাসে দিন কাটায় আর দেশের মানুষকে উপদেশ দেয় কৃচ্ছ্রতা সাধনের। কারণ দেশ আমাদের গরীব। যতদিন না আমরা স্বাবলম্বি হচ্ছি, দুঃখ এবং দারিদ্রকে হাসি মুখে বরণ করে নিয়ে সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যেতে হবে। পাওয়া না পাওয়ার হিসাব কষলে চলবে না। ভুলতে হবে ঈর্ষা, দ্বেষ। ভুলতে হবে পরশ্রী কাতরতা। যদি না ভুলতে পার মহাপাপ করবে। মেনে নাও ভাগ্যকে। ভাগ্যই সব। ভাগ্যগুণেই ছোট বড়, ধনী দরিদ্র— যদিও আমরা সবাই সমান। দেশের মানুষ তোমরা সাধু হও। সমস্ত বিষয়ে সাধু-সাধু করো। মুনাফাখোর কালোবাজারীর রক্ত শোষণের প্রতিবাদ কোর না। ভুলে যেওনা তারাও তোমার ভাই, তোমার আত্মার আত্মীয়। ভাইয়ের সম্পদ দেখে চোখ টাটালে চলে? ছিঃ লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে সব। ভাবছো কেন, না খেয়ে মরে গেলে তোমাদের চমড়া ফেলা যাবে? ত্যাগ স্বীকার করো, ত্যাগ করো —সর্বস্ব ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও। শুধু ভুলে যেওনা, গরীব দেশ আমাদের।

সত্যই গরীব দেশ আমাদের। গরীব দেশের গরীব মানুষ আমরা। আমাদের ঘরে নুন আনতে পানতা ফুরোয়। আমাদের সংসারের মানুষগুলোর মুখে দুবেলা দুমুঠো দিয়ে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার খরচ জোটে না। রোগের চিকিৎসা হয়না। কুমারী কন্যা বিয়ের পিঁড়ির স্বপ্ন দেখে জীবন কাটায়। আমরা গরীব। আমরা দেশের সাধারণ

মানুষ। দেশ যাতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে সেই জন্যেই আমাদের ত্যাগ স্বীকার।

বহুৎ আচ্ছা। কেয়া বাত কেয়া বাত। বাচ্চা লোগ এক দফে তালি বাজা দেনা।

তালি দাও। হাত তালি দাও স্বাধীন ভারতের সাধারণ মানুষ। শুধুমাত্র তালি দেওয়ার অধিকার তোমাদের। তোমরা অনাহারে অনিদ্রায় দিন কাটাবে, ভাগ্যকে দোষারোপ করে সান্ত্বনা লাভ করবে, রোগে শোকে মরবে কাঁদবে। আর জন্ম মৃত্যুর মাঝের সময়টুকু ধোপার গাধার মত ভার বহন করবে। কেন বইছো? কার জন্যে বইছো? প্রশ্ন করবে না। প্রশ্ন করার অধিকার তোমাদের নেই। বলছো, আছে। মিথ্যা কথা। কোথায় অধিকার? কে দিয়েছে তোমাদের সে অধিকার? স্বাধীনতা? তোমরা স্বাধীন? এ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চই স্বাধীন—আমরা স্বাধীন ক্রীতদাস, ভাগ্যহীনের দল। স্বাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে আমাদের মিথ্যার নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমাদের ঠকানো হয়েছে, প্রতারণা করা হয়েছে। চল্লিশ কোটি মানুষকে নিয়ে জুয়া খেলা হয়েছিল সেদিন। স্বার্থপর ক্ষমতালোভী কিছু মানুষ সেদিন লোভে মোহে অন্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল। অমানুষের মত ভবিষ্যৎ চিন্তা, তাদের মনে এতটুকু রেখাপাত করেনি। তারা পড়ে পাই চোদ্দ আনা নীতি গ্রহণ করে-ছিল। তাদের অন্ধত্ব অহমিকা লালসা মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের বাদ দিয়ে সমগ্র জাতির জীবনে অভিশাপ ডেকে এনেছে। আলো নেই, শুধু অন্ধকার। আমরা কোথায় চলেছি? কোথায়? কোথায়? কোথায়?...

চমকে উঠলো বিনোদ। কার যেন ডাক শুনতে পেল। তাকে ডাকছে, আহ্বান জানাচ্ছে। জাগতে বলছে। জাগাতে চাইছে। সেকি ঘুমিয়ে ছিল?

বিনোদ শুনছো, বিনোদ···

সে ঘুমোয় নি, জেগে ছিল। এখন চোখ মেলে চাইলো। আহ্বানকারীর মুখের দিকে তাকাল।

ছোট খাটো শীর্ণ মানুষটি একটু বিব্রত বোধ করলেন। জানতে চাইলেন, কেমন আছো?

উত্তরে মৃদু হাসল সে।

তিনি বললেন, দুদিন তোমাকে দেখতে এসে ঘুমোচ্ছ দেখে ফিরে গেছি। আজ না জাগিয়ে পারলাম না।

—আমি জানি, আপনি বসুন। ক্লান্ত কণ্ঠ তার।

তিনি বসলেন।

বিনোদ বলল, দুদিনই আমি জেগে ছিলাম। আজ ডাকার অপেক্ষায় ছিলাম।

—কেন?

উত্তরে হাসল সে।

—তুমি তাদের চিনতে পেরেছিলে?

সে চুপ করে রইলো।

—তুমি পুলিশকেও কিছু বলতে চাওনি? তুমি···, হঠাৎ তিনি চুপ করে গেলেন।

বিনোদও একটু চুপ করে রইলো। শীর্ণ মানুষটিকে দেখল। ডাকলো, মাষ্টার মশাই।

—পুলিশকে জানানো তোমার উচিত ছিল।

—পুলিশ তো আমার কাছে জানতে চায়নি।

—তুমি বলছো…

—আমি মিথ্যে বলছিনা।

—ইনসপেক্টর আমার সঙ্গেও দেখা করেছিলেন।

—সন্দেহ ভাজনদের নাম জানতে চেয়েছিলেন?

আশ্চর্য হলেন তিনি। বললেন, তুমি কি করে জানলে?

—আমার কাছেও নাম জানতে চেয়েছিলেন। কাকে-কাকে আমার সন্দেহ হয়।

—তুমি বলেছো?

—কি বলবো? ক্লান্ত কণ্ঠে তাঁকেই প্রশ্ন করলো বিনোদ। উত্তর দিল নিজেই, আমার জীবনে এটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিনা আমি। তারা আমাকে মারতে চায়নি। মেরেছে বাধ্য হয়েই। কিন্তু…

চুপ করলো বিনোদ। নিজেকে তার বড় ক্লান্ত বোধ হল। দুচোখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে এল। তার ঘুম পাচ্ছে।

কটা দিনই নিদ্রা আর জাগরণের মাঝে কেটেছে তার। মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ। তাকে ঘিরে অনেক জনের ব্যস্ততা। একটা জীবনের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা। কখনো কখনো জ্ঞান হয়েছে। দিনে রাতে উৎকণ্ঠিত আবছা আবছা মুখ ভেসে উঠেছে। মিলিয়ে গেছে। তারা কারা, চিনতে পারেনি।

একটা সপ্তাহের সাতটা দিন চলে গেছে। আজ সকালে ডাক্তারের মুখে শুনেছে, তিনটে দিন তার জ্ঞান ছিল না। বেঁচেছে নেহাৎ ভাগ্যের জোরে। বিজ্ঞানও ভাগ্য বিশ্বাস করে!

চিন্তা করেছে সেদিনের কথা। দুর্ঘটনার দিনটিকে। সেদিনের সন্ধ্যাটা।

বিকালে স্কুল ছুটির পর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে নিজের বাসায় ফিরছিল সে। ফেরে রোজই। রাস্তার আলোগুলো নেভানো। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে ধর্মঘট চলছে। ঠিক ধর্মঘট নয়, কিছু কর্মী

কাজ করছে, কিছু করছে না। ফলে আলো জ্বলা নেভা অনিয়মিত। তাছাড়া মফঃস্বল শহরটায় স্বাভাবিক অবস্থাতেও সব রাস্তায় আলো ঠিক মত জ্বলে না। একদল আছে, হয় তারা তার কাটে নয়তো ল্যাম্প খুলে নিয়ে যায়।

অন্ধকার রাস্তা। জায়গাটা একরকম নির্জন বলা চলে। দুপাশে বেশ কিছুদূর ফাঁকা জমি। অন্ধকারে দূর থেকে কটা অস্পষ্ট মূর্তিকে দেখতে পেয়েছিল সে। শুনতে পেয়েছিল তাদের কথা। দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে।

একটা করুণ কণ্ঠ তার কানে এসেছিল, তোমরা বিশ্বাস করো, আমি কিছু জানি না।

একটা রূঢ় কণ্ঠ ধমকে উঠেছিল, গোপালদার বাড়িতে তুই বোমা মারিস নি?

—না। আমি সেদিন......

—ফের মিথ্যে কথা! বলার সঙ্গে সঙ্গে মারার আওয়াজ পেয়েছিল।

করুণ আর্তনাদ উঠেছিল, বিশ্বাস করো......

—বিশ্বাস করো! শালা শয়তানের বাচ্চা। যদি না বলিসতো মেরে পুঁতে রেখে যাব এখানে। বল, সেদিন কে-কে ছিল?

—আমি ছিলুম না।

—তুইও ছিলি।

—না-না!

—আবার না। বল বলছি, কে-কে ছিল?

ঘটনাটা বুঝতে একমুহূর্ত দেরি হয়নি তার। দুটো কণ্ঠস্বরই কেমন যেন পরিচিত বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, উপস্থিত সকলকেই সে চেনে। একবার ভেবেছিল, চলে যায় নিজের কাজে। কি হবে মিথ্যে দাঁড়িয়ে থেকে। এতো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। মার ধোর, দুদলে বোমাবাজি, পিছন থেকে ছুরি মারা, এর মধ্যে

নতুনত্ব কিছুই নেই। মিথ্যে সময় নষ্ট করার চেয়ে নিজের কাজে চলে যাওয়াই ভাল। ওদের যা ইচ্ছা করুক গে, মরুগ গে—তার কি এসে যায়? দলীয় ব্যাপার, কিছু করতে গেলে হয়তো…

—বল্—গোপালদার বাড়িতে বোমা মারায় কে কে-ছিল?

—জানিনা।

—বলবি না?

—জানলে তো বলবো?

—বটে। আবার মারের শব্দ। ছেলেটা ককিয়ে উঠেছিল। ধমকে ছিল একজন, এই চেঁচাবি না।

অন্য একটা কণ্ঠস্বর কানে এসেছিল, মিথ্যে কেন মার ধোর শুরু। দাওনা একেবারে…। বিচিত্র শব্দ করেছিল মুখে।

চমকে উঠেছিল বিনোদ। একটা খুন হতে চলেছে। সে দাঁড়িয়ে আছে—শুনছে।

গুরুর গলাটা কানে এসেছিল, পুঁচকে ছোঁড়াটাকে মেরে লাভ কি? ধাড়িগুলোর সন্ধান চাই। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, বুঝলি? গোপালদার বাড়ির বৈঠকখানাটার যা ক্ষতি করেছে না, এটাকে সাবড়ালে উঠবে না।…

শিউরে উঠেছিল বিনোদ। বলছে কি ওরা? একটা জীবনের চেয়েও একজনের বসবার ঘরের কিছুটা দেওয়ালের মূল্য অনেক বেশি। ক্ষতি পূরণের জন্য চাই আরো কটা জীবন।

গোপালদাকে চিনতে পেরেছিল সে। তিনি একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কর্মী। জনপ্রিয়ও তাঁকে বলা চলে। এইতো কিছু-দিন আগে তিনি অফিস কামাই করে দলবল নিয়ে স্কুলে চড়াও হয়েছিলেন। বিনোদের এক সহকর্মী শিক্ষককে বহু ছাত্রের সামনে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল। তার অপরাধ, একটি ছাত্রকে ক্লাস থেকে বার করে দেওয়া। ছেলেটি ছাত্র সংস্থার সম্পাদক।

—কিরে বলবি না ? গর্জে উঠেছিল একটা কণ্ঠস্বর।

—জানি না'। সেই একই উত্তর।

—বলবি না তাহলে ?

—জানি না।

কানে এসেছিল কটা কথা, আমার মুখ বাঁধছো……তারপরেই মারের শব্দ।

কি যেন হয়েছিল তার। সহ্য করতে পারেনি। মনে হয়েছিল, এ অন্যায়। শরীরের প্রতিটি রক্ত কণিকা মুহূর্তে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওদের ওপর। তারপর……

বিনোদ! মাষ্টার মশাইয়ের মৃদু কণ্ঠের আহ্বানে একসময় তাঁর দিকে চোখ মেলে চাইলো সে। দেখতে পেল, তিনি তার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

—কি ভাবছো বিনোদ ?

—ভাবছি…। ম্লান একটু হাসির শীর্ণরেখা তার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটেই মিলিয়ে গেল। হঠাৎ সে ব্যাগ্র কণ্ঠে ডাকলো, মাষ্টার মশাই।

তার ব্যগ্রতায় একটু বিস্মিত হলেন তিনি। জানতে চাইলেন, কি ?

—আচ্ছা……। ইতস্ততঃ করলো সে। বলল, আচ্ছা সেদিন আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো ?

দুর্ঘটনা তুমি কাকে বলছো ?

—আমি আমি……। বিনোদ বলতে পারল না।

একটুক্ষণ নীরব রইলেন মাষ্টার মশাই। বিনোদকে দেখলেন। বললেন, তুমি বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ছো বিনোদ। ডাক্তার বাবু আমাকে বলেছেন, আমি যেন বেশি কথা না বলাই। সেদিনকার ঘটনা নিয়ে চিন্তা করো না। আগে সুস্থ হয়ে ওঠো।

—আচ্ছা—

—বল ?

—আর কেউতো এলো না ?

—এসেছে অনেকেই। আমি শুধু দেখা করার অনুমতি পেয়েছি। সবাই আসবে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, আজ আমি চলি। বাইরে ছেলেরা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। আমরা স্কুল থেকে সোজা এখানে এসেছি।

সংবাদটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ভরে উঠলো তার। ব্যথা অনুভব করলো। আনন্দ… ..

এগিয়ে চলেছেন তিনি। সে ডাকলো,মাষ্টার মশাই।

তিনি দাঁড়ালেন। কাছে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলবে ?

হাসল বিনোদ। বলল, না।

একটু আশ্চর্য হলেন তিনি। হাসলেন। চলে গেলেন।

বাইরে বিকালের আলো। পাখীরা ডাকছে। সে আর কোনদিন স্কুলে যেতে পারবে কিনা জানেনা। তার একটা পা ঝোলানো রয়েছে। মাথাটাও ফেটেছে। পেটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ওদের ছুরি তাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। সে বেঁচে আছে।

বিনোদ তুমি কি চাও ?

বিনোদ তুমি নিশ্চই মরতে চাওনা ?

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে। মানব জীবনের পরম আকুতি। মানুষ বাঁচতে চায়। বাঁচাই তার ধর্ম। ধর্মরক্ষার জন্যেই তার সংগ্রাম। কিন্তু আজ চারিদিকে অধর্মের বেসাতি। হানাহানি। একে অন্যের অনিষ্ট সাধন। কেন ?

তার মনটা যেন দার্শনিক ভাবাপন্ন হয়ে উঠলো। মনে মনে পর্যালোচনা করলো প্রতিটি ঘটনা। কজনে মিলে একজনকে মারতে চেয়েছিল। সেই একজনকে বাঁচাতে গিয়ে সে আহত হল। সে যদি না যেত ছেলেটি কী বাঁচতো? কি জানি! সে চিন্তা করতে পারলো না।

বর্তমান সময়টা একটা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। সদা একটা আতঙ্কগ্রস্থ ভাব। নেই-নেই রব। নেই কেন? কি নেই?

নিজের কথা মনে পড়লো তার। বিনোদের জীবন। তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। এড়িয়ে যেতে সে চায়নি, অস্বীকার করার সাধ্য তার নেই। তাহলে কি চায় সে?

মানুষের চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝে দুস্তর ব্যবধান। কলকাতার পথে খবরের কাগজ ফেরি করা ছেলে জীবনে অনেক কিছুই পেয়েছে। কিন্তু একজন কারখানার শ্রমিক খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মত শ্রম-মূল্য পায় না। কেন পায়না? তার বাঁচার প্রকৃত মূল্য দেওয়া হলে মালিকের লাভের অঙ্ক সঙ্কুচিত হবে। মালিক চায় সম্পদের পাহাড়। সম্পদের লোভে সে অন্ধ। মানুষের প্রকৃত অধিকারকে খর্ব করতে, ঠকাতে সদা প্রস্তুত। জাল-জালিয়াতির চক্রান্তে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের বাঁচার অধিকার লুপ্ত।

একজন বিনোদ বাঁচার পথ পেয়েছে। বাঁচতে চায় অসংখ্য বিনোদ। কিন্তু বিনোদের পথই তো একমাত্র বাঁচার পথ নয়, অসংখ্য পথে লক্ষ লক্ষ বিনোদের ছুটে চলা, মরা-মারা হচ্ছে। হত্যাকারীর দল নির্বিকার। মনুষত্ব তাদের কাছে মূল্যহীন। তারা অন্তের কথা ভাবে না। মেরেই তাদের আনন্দ।

কিন্তু বাঁচতে চায় মানুষ। বাঁচার মন্ত্র তাদের অন্তরে। বাঁচার লড়াইয়ে তাই তারা নির্ভিক দীপ্ত। তারা বাঁচতে চায়। মানুষের মত বাঁচার অধিকার চায় তারা।

আমাদের স্বাধীনতা কি শুধু বিদেশী শাসন মুক্ত হয়ে পশুত্বের জীবন যাপনের জন্মে? বিদেশী শাসকরা কি আমাদের মেরে রেখেছিল? আমরা সেদিনও মরেছি—আজও মরছি। সেদিন পরাধীনতার অসম্মান নিয়ে মরেছি, আজ স্বাধীনতার লজ্জা নিয়ে মরছি। আমরা বাঁচতে চেয়েছিলাম, পারিনি। ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্ষমতালিপ্সা, সংকীর্ণতা, বিশ্বাসঘাতকতা, আমাদের বিশ্বাসের সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকিয়েছে, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের বাঁচার আকাঙ্খাকে শেষ করে দিয়েছে—দিতে চাইছে।

আমরা বাঁচতে চাই—পারছি না। তবু আমরা বাঁচতে চাই।

জানিস বিনু, আজ আমাদের ছাদিনতা। আট বছরের দিদির এক বছরের ছোট ভাইয়ের কাছে বিজ্ঞত্ব প্রমাণের চেষ্টা। যতটা সম্ভব গম্ভীর হয়েই বলেছিল কথাটা।

অবাক ছোট ভাই। দিদির গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে লোভে চক্-চক্ করে উঠেছিল তার বড় বড় দুই ডাগর কালো চোখ। লুকিয়ে নিয়ে আসা আমের আচার চাওয়ার মত করে হাত পেতে বলেছিল, আমাকে একটু দে।

দিদির সেকি হাসি। হেসে কুটি কুটি হয়েছিল প্রথমটায়। পরক্ষণেই অস্বাভাবিক গম্ভীর। একটু চিন্তা করে বলেছিল, না।

ছোট ভাই আঘাত পেয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, দিবি না?

—ছাদিনতা দেওয়া যায়না রে। গম্ভীর ভাবেই কথাটা বলেছিল দিদি।

কথাটা বিশ্বাস হয়নি ছোট ভাইয়ের। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দিদির মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর বলেছিল, বুঝেছি তুই একা খাবি।

দিদি বুঝতে পারেনি, অবুঝকে কি করে বোঝাবে। বলেছিল, ছত্যি বলছিরে, ছাদিনতা খাবার জিনিস নয়।

—তবে ? অবুঝের মত প্রশ্ন করেছিল ছোট ভাই। জানতে চেয়েছিল জিনিসটা কি।

দিদি বলেছিল, দেখাও যায় না।

নতুন করে অবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল ছোট ভাইয়ের মনে। কি এমন জিনিস যা দেখাও যায় না, খাওয়াও যায় না। মিথ্যে কথা, দিদি তাকে ঠকাচ্ছে, ফাঁকি দিতে চাইছে। শিশুমন অভিমানে ভরে উঠেছিল। বলেছিল, চাইনা তোর ছাদিনতা।

বিজ্ঞত্ব প্রমাণের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হতে দেখে আঘাত পেয়েছিল দিদি। ছোট ভাইকে তার, নেহাৎ ছোট ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। শেষ চেষ্টা হিসাবে বলেছিল, ওছব তুই বুঝবি না।

ছোট ভাইও ছাড়ার পাত্র নয়। বলেছিল, তুই বুঝিস ?

—বুঝি-বুঝি। আজ আমাদের ছাদিনতা, বুঝলি বোকা। আমাদের ছকলের আজ ছাদিনতা। আমরা ছবাই ছাদিন—ছবাই।

বোকা বিনু তার বড় বড় চোখে দিদির গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দিদিকে দেখেছিল। বিশ্বাস করার চেষ্টা করেছিল, দিদির কথাটাই সত্যি। সত্যিই সে বোকা। বোকা যদি না হবে ছাদিনতাটাতো সেই আনতে পারতো। তার থেকে একবছরের বড় দিদিকে বলে অবাক করে দিতে পারতো। পারেনি, তার কারণ দিদির চেয়ে সে ছোট, আর ছোট যখন তখন তার দিদির কথাটা মেনে নেওয়াই উচিৎ।

ঝগড়া ভুলে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুই যা বললি সত্যি ?

অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দিদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় জানতে চেয়েছিল, কি ছত্তি ?

—তোর কথা ?

—আমি মিথ্যে বলেছি ?

—তা নয়। দিদিকে তুষ্ট করেছিল সে। বলেছিল, আমি জানিনা তো ?

—কি ? বিরক্ত হয়েছিল দিদি।

—আমিও ছাদিন ?

—বলেছিতো, আমরা ছবাই ছাদিন। কথাটা বলে চলে যাচ্ছিল দিদি।

বিনু ডেকেছিল পেছন থেকে, এই দিদি। দিদি দাঁড়াতে জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ খেলবি না ?

—না। উত্তরটা দিয়েই মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিল দিদি।

বিনু একা। নেড়া ছাদের শূন্য শশ্মানে সেদিন নিজেকে তার বড় একা বলে মনে হয়েছিল। দিদির সঙ্গে যেতে পারেনি। ভাল লাগেনি একা একা খেলতে। সে যেন পৃথক হয়ে গিয়েছিল। বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু কাঁদতে পারেনি, কান্নার অবসর মেলেনি। দিদির দেওয়া সংবাদটার কথাই ভেবেছিল, সেও ছাদিন।

স্বাধীনতা, মুক্তি। মুক্ত ভারতবর্ষ, দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্ত মানুষ। এই মুক্তি-দাসত্ব মোচন কি কাম্য ছিল আমাদের ? আমরা স্বরাজ চেয়েছি—স্বাধীনতা চেয়েছি, কিন্তু অভিশাপ চাইনি। এতো মুক্তি নয় ছলনা, এতো শান্তি নয় জ্বালা, এতে তো সুখের অস্তিত্ব নেই,

আছে দুঃখের তরঙ্গ ভঙ্গ। শত শহীদের রক্তে রাঙা ভোরের আকাশ অশুভ অন্ধকারে ভরে গেছে। দিকভ্রান্ত নাবিকের আর্ত হাহাকারে ককিয়ে কেঁদে উঠেছে ভারতাত্মা। অতি বিশ্বাসীর দল বিশ্বাস-ঘাতকতার ছুরি বসালো ভারত জননীর বক্ষে। রক্তে অশ্রুতে পঙ্কিল হয়ে উঠলো স্বর্ণ-রেণুসম ধূলি। মুক্ত ভারতে সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু ভুলে গেল কাঁদতে।

কেন-কেন-কেন?

একটি প্রশ্ন, কেন? সত্য উত্তরে অজস্র প্রতিবাদ। স্বাধীনতায় ভ্রান্ত বিশ্বাস মনকে অথর্ব পঙ্গু করে দিয়েছে। যা পেয়েছি তাই সই। কেড়ে নিতে যখন পারিনি, মেনে নিই চুপি চুপি। ক্লান্ত মন, অবসন্ন চেতনা, আত্মলজ্জা ঢাকতে উদগ্রিব। আমরা পেয়েছি—লাভ করেছি, ইংরেজ স্বাধীনতা হস্তান্তর করেছে। আমরা স্বাধীন হয়নি, স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে আমাদের।

এই দেওয়ার নীতি গ্রহণের আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিন্তা করছে—ভেবেছে, আমরা স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হয়েছি কিনা, স্বাধীনতা আমাদের দেওয়া যায় কিনা। যখন তারা বুঝেছে, হ্যাঁ দিলেও দেওয়া যেতে পারে, তখন হিসাব নিকাশ সুরু হয়েছে তাদের। চলেছে দিনক্ষণ দেখাদেখি। খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় নিয়ে চলেছে তাদের লাভের অঙ্কের হিসাব কষা। মমতা বোধে মায়ের শূন্যস্থানে বসিয়েছে নিজেদের। ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের জননীর কর্তব্য পালনের অন্তহীন নেকামি সুরু হয়েছে।

অহিংসা, মৈত্রী ও প্রেম—এই তো ভারতের শাশ্বত বাণী। অন্যায় অবিচার অত্যাচারেও এই মহামন্ত্র থেকে বিচ্যুত হয়নি ভারত। হিংসায় নয়, প্রেমেই আসে পরিবর্তন। হৃদয়ের ধর্ম ভালবাসায়।

পরাধীন ভারতের মানুষ বিদেশী শাসক ইংরেজের হাতে দিনের পর দিন নির্যাতীত লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে। ধর্ম মানুষের প্রাণের সম্পদ—ধর্মও হয়েছে কলুষিত। কলঙ্কিত হয়েছে নারীধর্ম।

মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা। তাহা মিথ্যা কথা।

সত্যই মিথ্যা কথা। লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল আর্থার অসবোর্ণ তাঁর 'ইংলণ্ড কি ভারতকে হারাতে বদ্ধ পরিকর ?' গ্রন্থে একজন অফিসার যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করেছিলেন, "আমি আপনাকে কথা দিতেছি যে আমার পিটুনি পুলিশ কয়েকদিন কোন গ্রামে বাস করলেই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়চেতা রাজনৈতিক আন্দোলন কারীদের মনোবলও ভেঙে পড়বে।"

অসবোর্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কেমন করে ?"

উত্তর, "তারা সব কিছুই কেড়ে নেবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রামে কোন অক্ষত যোনি বা সতী স্ত্রীলোক থাকবে না এবং একটি সিকিও কোথাও পড়ে থাকবে না।"

ইংরেজ রাজত্বের সন্ত্রাসের সামান্যতম নমুনা। ১৯৩২ সালে এর চেয়ে অনেক বেশি সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তারা। অনেক বেশি নারকীয়তার পরিচয় দিয়েছিল। তাদের শাসনকালীন সময়ে পশুত্বের চরম প্রকাশ ঘটেছিল। নিশ্চই এর মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশ মাত্র নেই।

তবু এদের উদ্দেশেই মহাত্মার বাণী, "Anger is opposed to satyagraha. We have no quarrel with the British people. We want to be their friends and retain their good will not on their domination."

'ক্রোধ সত্যাগ্রহের বিরোধী ধর্ম। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই। আমরা তাদের মিত্রতাকামী। তাদের শুভেচ্ছা আমরা বজায় রাখতে চাই।'

কাদের শুভেচ্ছা আমরা কামনা করেছি ?

না, যারা সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা নিয়ে বন্ধুত্বের বেসাতি সাজিয়ে আমাদের দেশে এসেছে। ছলে বলে কৌশলে অধিকার করেছে ক্ষমতা। সমগ্র জাতির পায়ে পরিয়েছে দাসত্বের শৃঙ্খল। চালিয়েছে অবাধ শোষণ। অনাহার আর অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে

মানুষকে। কেড়ে নিয়েছে মুখের গ্রাস, হাঁকিয়েছে চাবুক। তৈরি করেছে বেইমানের দল। ভাইয়ে-ভাইয়ে বাধিয়েছে বিবাদ। সেই তাদেরই শুভেচ্ছা আমরা কামনা করেছি। আমরা তাদের কাছে আমাদের স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছি। আমরা স্বাধীনতা চেয়েছি, ছিনিয়ে নিই নি।

কারণ, ছিনিয়ে নিতে গেলে হয়তো হিংসাশ্রয়ী হয়ে পড়তে হতো আমাদের। হয়তো বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। ধর্মচ্যুত, আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়তাম আমরা। সে পথ পরিহার করেছি আমরা। আমরা চেয়েছি, কাঙালের মত ভিক্ষা চেয়েছি।

অহিংসার ধর্মে বিশ্বাসী ইংরেজ। দুনিয়ার প্রতিটি ধর্মেরই মূলমন্ত্র অহিংসা। খ্রীষ্টের বাণী বহন করে সাম্রাজ্যবাদের থাবা বসিয়েছিল তারা। শোষণের শেষে খ্রীষ্টবাণীই মেনে নিয়েছিল তারা। হয়তো, পরম পিতার কাছে বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, হে পরম পিতা করুণাময় যীশু, যা করেছি, ভুল বসেই করে ফেলেছি — ক্ষমা করে দিও।

ভুল সংশোধন করতে ভারতে পাঠানো হয়েছিল লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনকে। কারণ, ব্রিটিশ জনমত এবং পার্লামেন্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ইংরেজের ভারতে থাকা আর উচিত নয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ দিল্লী এলেন মাউন্টব্যাটেন কখন, যখন লীগ আর কংগ্রেসের মধ্যে শুম্ভ নিশুম্ভের দ্বন্দ্ব চলেছে। অন্তর্বর্তী গভর্নমেন্টের অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলি, তাঁর রচিত বাজেটে কংগ্রেসকে ফেলেছে বেকায়দায়। কারণ বড় বড় আয়ের ওপর বেশ জবরদস্ত ট্যাক্স চাপিয়েছেন লিয়াকত। কংগ্রেস এটা মেনে নিতে পারে না, মেনে নেওয়া সম্ভবও নয় কংগ্রেসের পক্ষে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা কংগ্রেসের স্তম্ভ বিশেষ। কংগ্রেসের সমর্থক তাঁরা। কংগ্রেস তাঁদের আত্মার আত্মীয়। সেই আত্মীয়দের জন্যে প্রাণ করেছেন উৎসর্গ। দুহাতে করেছেন দেদার অর্থ সাহায্য। আশা ভবিষ্যৎ। অতএব কংগ্রেস-

কেও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থের দিকে না চাইলে চলবে কেন? মুনাফার টাকা যদি ট্যাক্সে বেরিয়ে যায়, কংগ্রেসকে কে দেখবে তখন? নিশ্চই দেখবে না। তাই কংগ্রেস ডোবে ডুবুক, বাঁচাতে হবে ব্যবসায়ী গেষ্ঠীকে, এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যখন দেশীয়।

এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কারা?

ব্রিটিশ আমলে ভারতের বৃহৎ শিল্প-বাণিজ্যের ওপর ইংরেজ বণিকদের একাধিপত্য। এদেশের মূল্যবান সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের দেশের সমৃদ্ধিসাধন করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু যে সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্যে তারা ঢুকতে চায়নি বা পারেনি সেখানে তারা তাদের জুনিয়ার পার্টনার হিসাবে দেশী বণিকদের দিয়েছিল লুণ্ঠনের সুযোগ। আসলে ইংরেজ বণিকদের দালালে পরিণত হয়েছিল দেশী বণিকরা। কালে দেশীয় নৃপতি জমিদারদের মত বণিক সম্প্রদায়ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে উঠলো।

লাভ লোকসান নিয়ে ব্যবসা চলে। লোকসান হলে ব্যবসা যায় উঠে। লাভের অংশ বাড়লে ব্যবসা বাড়ে। কিন্তু ইংরেজ বণিকরা থাকতে ব্যবসা বাড়াবার সুযোগ কোথায়? সুযোগ আসবে তখনই যখন ইংরেজ থাকবে না। ইংরেজ যখন থাকবে না তখন থাকবে তারা। ইংরেজকে না তাড়ালেই নয়।

কিন্তু ইংরেজকে তাড়াবে কে?

বণিক সম্প্রদায়? ছিঃ ছিঃ। একথা ভাবাই যায় না। চক্ষু-লজ্জা বলে একটা জিনিষ আছে। তাছাড়া অন্য ভয় আছে। সে ভয় ব্যবসার পাঠ চুকে যাওয়া।

চলেছে পথ সন্ধান। দেরি হয়নি সে সন্ধানের হদিশ মিলতে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বড় ফ্রন্ট কংগ্রেস। ভারত থেকে ইংরেজ তাড়াবে কংগ্রেস। কংগ্রেস হবে ভারতের আগামী দিনের কাণ্ডারী।

রাতারাতি ভণ্ড লোভী মুনাফাখোর বণিকের দল দেশপ্রেমিকে পরিণত হয়ে গেল। আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্ভব নয় তাদের পক্ষে কিন্তু সাহায্য করবে তারা। কংগ্রেস তাদের হৃদয়ের ধন। সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিল তারা।

কংগ্রেসও অকৃতজ্ঞ নয়। ব্যবসাদারদের প্রতি অর্থমন্ত্রীর অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণে দৃঢ়সঙ্কল্প. করের বোঝা থেকে বণিকগোষ্ঠীকে বাঁচাবার প্রতিজ্ঞা কংগ্রেসের।

বনিক গোষ্ঠী দেশের ভবিষ্যৎ।

বিনোদবাবু, বিনোদবাবু। নার্স ডাকছে। বিনোদ চোখ চাইলো।

হাসল নার্স। বলল, একটু বিরক্ত করছি। একটা ইন্‌জেকশন দেব।

আড়ষ্ট বাঁ-হাতটা নীরবে এগিয়ে দিল সে।

ইনজেকশন দেওয়ার সময় চোখটা বুজে ফেলল বিনোদ। ইনজেকশন দেওয়া হয়ে যেতে নার্স জানাতে চাইলো, লাগলো খুব?

চোখ মেলে চাইলো বিনোদ। বলল, সত্যিই লেগেছে। জীবনে এই প্রথম ইনজেকশন .কেমন জিনিস বুঝতে পারছি।

অবাক হল নার্স। বিনোদের দিকে চাইলো। জিজ্ঞেস করলো, এতদিন তাহলে......

হাসল সে। বলল, না, অসুখ করেছে—চিকিৎসা করার সাধ্য ছিল না। ওষুধ যা খেয়েছিলাম তাও হোমিওপ্যাথিক। এখন তো রাজার খরচ চলেছে।

—রাজার খরচ ?

—নয়তো কি ? অজ্ঞান অবস্থায় কি হয়েছে না হয়েছে জানি না। অজ্ঞান হবার পর ওষুধ আর ইনজেকশনের ঠ্যালায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছি। আর কদিন চলবে এমন ?

বিনোদের কথা বলার ধরণে নার্সও হেসে ফেলল। বলল, কদিন চলবে ডাক্তারবাবুই বলতে পারেন। তবে আমার যতদূর মনে হয় আরো কদিন চলবে। কেসটা সিরিয়াস তবে……

—তবে কি ? উৎসুক হল বিনোদ।

—আপনার যে সমস্ত ওষুধ লাগছে তার অধিকাংশই কিনে দেওয়া হচ্ছে বলেই চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে।

—মাষ্টারমশাই কিনে দিচ্ছেন ?

—কে কিনে দিচ্ছেন জানি না। তবে হাসপাতাল থেকে যে দেওয়া হচ্ছে না, এটা ঠিক।

—কেন ?

—থাকলে তো দেওয়া হবে।

—নেই কেন ?

হেসে ফেলল নার্স। বলল, আপনি বড় ছেলেমানুষ তো ?

সত্যই ছেলেমানুষ! নার্সের মুখের দিকে চাইলো বিনোদ। মাথার চুলে ইষৎ রূপালী রেখা। ভদ্রমহিলার ব্যবহারটি বড় সুন্দর। বলল, সব রকম ওষুধ কি দেওয়া হয়না ?

একটু ইতস্ততঃ করল নার্স। বলল, আমার তো মনে হয়।

কথাটা শুনে চুপ করে গেল বিনোদ। আর কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করলো না। তার নিজের কথাটা মনে পড়লো। তাকে বাঁচাতে যে সমস্ত ওষুধের প্রয়োজন হয়েছিল তার অধিকাংশই বাইরে থেকে কিনে দেওয়া হয়েছে। তার কিনে দেওয়ার মত লোক ছিল বলেই সে বেঁচেছে। কিন্তু যাদের কিনে দেওয়ার লোক থাকলেও কিনে দেওয়ার মত সামর্থ নেই, তাদের ?

তারা মরবে। মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন গতি নেই।

সত্যই কি নেই ?

বিনোদ ভাবতে পারল না। তার মনে হল, নার্স যা বলল তা বুঝি সত্যি নয়।

স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষের নিশ্চই বাঁচবার অধিকার আছে। মানুষের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই তো স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেদিন মানুষ বাঁচতে চেয়েছিল। আজও বাঁচতে চায়।

বাঁচার অধিকার হস্তান্তর করতে ভারতে এসেছিলেন মাউণ্ট-ব্যাটেন। ভারতে শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয়।

আইন সভায় বাজেট নিয়ে লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের চলেছে মতান্তর। দেশ জুড়ে স্থানে স্থানে চলেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কংগ্রেসের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী ঘোষণা, মুসলিম লীগের এই দাবী প্রতিরোধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, রাজন্যরা স্বার্থচিন্তায় অস্থির, গান্ধীর অনুতাপ পরিক্রমা—সব মিলিয়ে হট্টমেলার অবস্থা। অভাব, সুষ্ঠ চিন্তাধারার। অভাব নেতার—বলিষ্ট চিন্তাশীল নেতৃত্বের। যা আছে তা অসম্পূর্ণ—অবাস্তব হঠকারীর দলের হৈ চৈ চিৎকার চেঁচামেচি। ক্ষমতা লাভের নির্লজ্জ বেহায়াপনা।

মাউণ্টব্যাটেন ভারতে এসেছেন শুধুমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে নয়, গ্রেটবৃটেনের স্বার্থসিদ্ধির পথকে ভবিষ্যতের জন্যে উন্মুক্ত রাখার জন্যেও। ইংরেজের সৃষ্ট আমলাতন্ত্র যাতে ভারতের বুক থেকে মুছে না যায় তার চেষ্টা করা।

সে চেষ্টা তাঁর সফল হয়েছিল। একরকম বিনা চেষ্টাতেই সফল হয়েছিলেন তিনি। পণ্ডিত নেহেরু তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। যে দেশী বিদেশী আমলার দল ভারতীয় জনগণের দুঃখ দুর্দশা অন্যায় অত্যাচারের কারণ, যাদের স্বেচ্ছাচার দাম্ভিকতা হৃদয়হীন ব্যবহার মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে নিয়ে যেতে ব্রিটিশকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করেছে—সেই তারা, আজ স্বাধীনতা

প্রাপ্তির দীর্ঘ তেইশ বছর পরেও বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। আজও তারা তেমনি হৃদয়হীন, অবিবেচক, সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি বোধশূন্য।

ভাল কি কেউ নেই?

আছেন। কিন্তু কজন তাঁরা? তাঁদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে মন্দের ভীড়ে তাঁদের অস্তিত্ব অতি ক্ষীণ। আত্মসুখের জোয়ারে ন্যায় নিষ্ঠানীতি তাঁদের ক্ষণস্থায়ী। মানুষের ভাল করতে গিয়ে তাঁরা দুর্নামের ভাগী।

পরাধীন ভারতে যেমন, স্বাধীন ভারতেও তেমনি এই আমলার দল স্বজন পোষণ, দুর্নীতি, চুরি জোচ্চরি জালিয়াতিতে সিদ্ধ হস্ত। স্বেচ্ছাচারি এই আমলার দল। আমলা নির্ভর ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী নয়—আমলাতন্ত্রের ধ্বজাবাহী। মন্ত্রীত্বের মেয়াদ মাত্র পাঁচ বছর, যেন পদ্মপাতার জল—সদা টলমল। কখন যায় কখন থাকে ভাব। থাকে আমলারা—তারা আছে, থাকবে। চাকুরী তাদের কে খায়? বরং তারা ইচ্ছা করলে যে কোন সময় মন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব লোপাট করে দিতে পারে। মন্ত্রীর হুকুমের চাকর তারা নয়—মন্ত্রী মহোদয় চলে তাদের ইচ্ছায়। তারা স্বাধীন। স্বাধীম ভারতের স্বাধীনতার উপসত্ব একমাত্র আমলাদের ওপরই বর্তায়। আর এই সত্ব ভোগের দানপত্রের স্বাক্ষরকারী পণ্ডিত নেহেরু।

মাউণ্টব্যাটেন এসেছেন। ব্রিটিশ প্রতিনিধি হয়ে তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন ক্ষমতা অর্পণ করতে। যাদের দেশ তাদের হাতে তুলে দিতে। ইংরেজের বদান্যতা প্রমাণ করতে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে লাভ করলেন অবিভাবকত্ব। লীগ এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব লাভ করলেন। স্বয়ং গান্ধীজীও তাঁকে সমর্থন করলেন। উপদেশ দিলেন, দৃঢ় হবার। সেদিন ভারতবর্ষে এমন কেউ একজন ছিলেন না, যিনি বলেন, দেশ আমাদের। দেশের মানুষ, আমরা যতই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করিনা কেন,

আমরা পরস্পরের ভাই। সংসারের ঝগড়া সংসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক। আমরা আমাদের ঝগড়া বিবাদ ঠিক মিটিয়ে নেব।

ঝগড়াটা অধিকার সংরক্ষণের। বিশাল ভারতবর্ষের কিছু মানুষ চান আলাদা রাষ্ট্র। নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা। পাঞ্জাব প্রদেশকে ঘিরে নেহেরু-প্রস্তাব ও খণ্ডিতকরণকেই সমর্থন জানিয়েছে। সর্দার প্যাটেলের সুস্পষ্ট অভিমত, মুসলিম লীগের স্পর্শ থেকে ভারতকে মুক্ত করতে হবে। একমাত্র গান্ধীর বিস্ময়কর প্রস্তাব। দেশ ভাগ তিনি সমর্থন করেন না। ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় আসুক মুসলমান সদস্যরা। জিন্নার শাসন পরিষদ শাসন করুক দেশকে।

কিন্তু কেউ বললেন, না বিবাদ আমরাই মিটিয়ে নেব। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ আমরা পরস্পরের আলোচনায় নিশ্চই খুঁজে পাব।

পাওয়া হয়তো সম্ভবও ছিলনা সেদিন। হয়তো তার একমাত্র কারণ, ইংরেজ সৃষ্ট 'ডিভাইন এণ্ড রুল'—ভেদনীতি। বিভেদ সৃষ্টি করে ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করেছে। এই ভেদনীতি শুধুমাত্র হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেনি, করেছে সর্বত্র। যেখানে স্বার্থের গন্ধ সেখানেই ইংরেজের বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে ইংরেজ তার ভেদনীতির বিষাক্ত বাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছে। দেশ জুড়ে সৃষ্টি করেছে বিশ্বাসঘাতকের দল। স্বজন পোষণের মত এই বিশ্বাসঘাতকের দলকে ইংরেজ তার ছত্র ছায়ায় লালিত পালিত করেছে। এদের রক্তে মিশিয়ে দিয়েছে ক্ষমতা লিপ্সা, যথেচ্ছাচার, হিংসা আর শোষণের ক্ষুধা। এদের কাছে দেশ এবং মানুষের কোন মূল্য নেই, এরা আত্মসর্বস্ব।

গান্ধীজী বলেছিলেন, হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনকেই অবাধে চলতে দেওয়া নয়তো ভারতীয়দের রক্ত-স্নানের মধ্যে দিয়ে নতুন পথ করে নেওয়া।

কিন্তু ইংরেজের স্বাধীনতা হস্তান্তরের অন্তরালে দেশটাকে দু

টুকরো করে দেওয়ার অভিসন্ধিও লুকিয়ে ছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি ঘোষিত হবার পর কমন্স সভায় ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন বিরোধী পক্ষের নেতা চার্চিল। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতকে দুইভাগে ভাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন গভর্নমেন্ট। শুধু দুই ভাগ নয়, এলোমেলো ভাবে ভারতকে টুকরো টুকরো করবার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সময় সীমা ঘোষণা করায় কোন সুফল দেখা দেবে না। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাণ্ডজ্ঞান জাগিয়ে তুলতে সাহায্য না করে নির্দিষ্ট সময় সীমার এই ঘোষণা বরং তাদের দিক থেকে বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ দাবী উপস্থিত করার প্ররোচনা হয়ে উঠবে। ভারতের এইসব 'পার্টি' বলে থাকে যে, তারা হল ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি। এ দাবী একেবারে ভুয়া ও ভিত্তিহীন। ভারতের এইসব পার্টির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করার অর্থ কতগুলি খড়ের তৈরি মানুষের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে এইসব পার্টির অস্তিত্বের লেশও খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

চার্চিলের ভবিষ্যৎবানীর প্রতিটি কথা সত্য নয়, কিন্তু সব কিছুই মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। খণ্ডিত ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু মানুষ কি পেল?

স্বাধীন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কি পূর্ণ হয়েছে?

হয়নি।

কেন? কেন হল না? কাদের জন্যে হল না?

"The world is weary of hate, we see the fatigue is over coming the nations We see that this song of

hate has not benifited humanity. Let it be the privilege of India to turn a new leaf and set a lesson to the world"—M. K. Gandhi

—জগৎবাসী ঘৃণায় জর্জর। আমরা লক্ষ্য করছি, পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। আমরা উপলব্ধি করছি, দ্বেষ-বিদ্বেষে মানবসমাজ উপকৃত হয়নি। পৃথিবীতে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করবে, আর দৃষ্টান্ত স্থাপনের সৌভাগ্য ভারতবর্ষেরই হোক।

অহিংসার বাণী বহন করে ভারতবর্ষে এলেন গান্ধীজী। নতুন পথের সন্ধান দিলেন তিনি পরাধীন ভারতের মানুষকে। সে পথ অহিংসার—সত্যাগ্রহের। হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা নয়, অহিংসা। অহিংসার দ্বারাই দেশ মুক্ত হবে, জাতি হবে মহান। মহত্ব লাভের সুযোগ ছাড়লো না মানুষ। তাঁর ডাকে সাড়া দিল। তাঁকে নেতা বলে স্বীকার করে নিল।

নিজের লক্ষ্যপথে এগিয়ে চললেন তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রের বীর সেনাপতি।

বছরটা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ। স্থান বিহারের চম্পারণ।

নীলকর সাহেবদের অসহনীয় অত্যাচার অনাচার। কৃষক-কুল অসহায় আজ্ঞাবাহীমাত্র। অন্যায় আদেশ না মেনে কোন উপায় নেই। অত্যাচার সহ্য করা ভিন্ন গতি নেই। চম্পারণের কৃষকরা আপন ভাগ্যকে শুধু দোষারোপ করে। অত্যাচার সহ্য করে চোখের জলে বুক ভাসায়। প্রতিবাদ করার ভাষা তারা ভুলে গেছে।

মূক মুখে ভাষা ফোটালেন গান্ধীজী। বুকে এনে দিলেন বল। সকলের মাঝে থেকে সঙ্ঘবদ্ধ করলেন মানুষকে। সুরু হল আন্দোলন। এলো সাফল্য। নতি স্বীকার করলো ইংরেজ প্রভুর দল।

উল্লসিত গান্ধীজী। এ তাঁর জীবনে দ্বিতীয়বারের জয়। প্রথমবার জয়ী হয়েছিলেন বিদেশের মাটিতে, সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায়। দেশের মাটিতে সত্যাগ্রহ নীতির প্রথম সাফল্য।

দ্বিতীয় সাফল্য গুজরাটের খেরায়, কৃষক সত্যাগ্রহ। তৃতীয়, আমেদাবাদে কাপড় কলের ধর্মঘট। প্রতি ক্ষেত্রেই জয়, জয় আর জয়। সত্যাগ্রহের মূল্যবোধ স্বীকৃত।

সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট দ্বেষ হীনতা। প্রতিপক্ষের আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত নয়, আত্ম-নিগ্রহ দ্বারা তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা; প্রেম প্রীতি ও মৈত্রী রসে সিক্ত করে তার অন্তর জয় করা।

গান্ধীজীর নীতি—আপোষ আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখা। সালিশী মধ্যস্থতার মারফৎ মীমাংসা করা। অন্যায় সমর্থন অথবা অন্যায়ের সঙ্গে সহযোগিতা নয়, অন্যায়ের সঙ্গে সত্যাগ্রহীর ভূমিকা অসহযোগিতা।

তবু ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হল। আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন গান্ধীজী। কারণ তাঁর নির্দেশিত অহিংস পথে দেশবাসী চলেনি। আত্মশুদ্ধি হয়নি জাতির। ভুলতে পারেনি হিংসা। অহিংসার পথে হিংসা কলঙ্ক। হিংসা ভুলতে হবে জাতিকে।

হিংসার প্রকাশ ঘটেছিল বিশাল ভারতবর্ষের মাত্র দু-চারটি জায়গায়। উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের নিকটবর্তী চৌরী চৌরায় কিষাণরা একটি থানা জ্বালিয়ে দিয়ে একুশজন পুলিশকে হত্যা করে। এছাড়া বম্বে এবং আরো দু-এক জায়গায় সংহার মূর্তি ধারণ করে জনতা।

জনতার এ রোষ বহ্নির প্রকাশ সেদিন খুব একটা অসঙ্গত কারণে প্রকাশ পায়নি। অহিংস পথেই চলতে চেয়েছিল দেশবাসী। সফল হতে চেয়েছিল। আন্দোলনকে সফল করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল মনে প্রাণে।

তবু ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা বেদনার্ত হৃদয়কে মথিত করেছিল। ভাইয়ের বুকের রক্ত মাখা হাত আগুন জ্বালিয়েছিল মনে। হিংসা

নয়, হাহাকার। আপনজনের নিষ্ঠুর মৃত্যু অসহ্য বোধ হয়েছিল। প্রশ্ন জেগেছিল মনে। কাদের বিরুদ্ধে অহিংসা আন্দোলন তাদের? কাদের চরিত্রের পরিবর্তন মানসে তাদের এই আন্দোলন? তারা কারা?

মানুষ?

মানুষের হৃদয় আছে, মন আছে। মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু যারা নিরস্ত্র মানুষের ওপর পশুর ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের রক্তে অট্টহাসির তুফান তোলে, প্রাণ নিয়ে ছিনি-মিনি খেলাতেই যাদের আনন্দ—তারা কি মানুষ? না মানুষ নয়, মানুষের অবয়বে হিংস্র বর্বর পশু। পশুর চরিত্রের পরিবর্তন কি সম্ভব?

সুদীর্ঘকালের শোষণ পীড়ন ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে মানুষের। অসার নীতি বলে মনে হয়েছে গান্ধীবাদ। মেরে মরার নীতি গ্রহণ করেছে তারা। আঘাতের প্রত্যাঘাত হেনেছে তাদের সবল বাহুতে।

ক্ষোভে দুঃখে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন গান্ধীজী।

সামান্য কিছু মানুষের ধৈর্য্যচ্যুতিতে ব্যপক জনজাগরণকে স্তব্ধ করে দিলেন গান্ধীজী। ফলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। মদত দিল বৃটিশ গভর্নমেণ্ট। সুরু হল শিখেদের আলাদা অস্তিত্বের দাবী। সুরু হল উচ্চ-নীচের আন্দোলন। দেশের নানা স্থানে বহে গেল রক্তগঙ্গা।

অথচ সে সময় ব্যাপক জনজাগরণে সাম্রাজ্যবাদীর দল ভীতসন্ত্রস্ত। পালাবার পথ খুঁজছে তারা। বিদেশী শাসন যন্ত্র ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। কিন্তু গান্ধীনীতি তাদের দেশ ছাড়া করার পরিবর্তে গুছিয়ে বসার সুযোগ করে দিল। কারণ যে কোন উপায়ে সিদ্ধিলাভই তাঁর কাছে বড় কথা নয়, লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায়ও নির্মল এবং নিষ্পাপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাম্রাজ্যবাদীর দল যত অন্যায় বর্বরতার চূড়ান্ত করুক না কেন, দেশবাসীকে হতে হবে সাচ্চা অহিংস। কিছু

মানুষের হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা প্রকাশ সমগ্রজাতির পাপ। বিদেশীর বর্বরতাকে ক্ষমা করা যায়, দেশবাসীর সামান্যতম হিংসা প্রকাশ ক্ষমার অযোগ্য। দেশের মানুষ শোষণ পীড়ন সহ্য করে করুক, তিনি নীতি-ভ্রষ্ট হতে পারবেন না। তাই জনজাগরণের মাথায় আঘাত করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নি তিনি।

তারপরের দৃশ্য যেমন মর্মান্তিক তেমনি হৃদয় বিদারক। পাঁচ সালের দাঙ্গার ক্ষেত্র সীমিত। ২৪—২৬ সালের দাঙ্গা ভয়াবহ, ভারতময় বিস্তৃত। এরই মধ্যে খিলাফৎ সমর্থন করলেন তিনি। আত্মশুদ্ধি ও ভ্রাতৃ বিরোধের প্রায়শ্চিত্ত করলেন অনশন করে। অনুষ্ঠিত হল ঐক্য সম্মেলন। কিন্তু দেশের প্রতিটি মানুষকে তাঁর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী করে তোলা সম্ভব হয় নি।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। ছলা কলার অন্ত নেই তার। সে জানে দেশকে শাসন এবং শোষণ করতে গেলে সোহাগের পথ কিছু কিছু উন্মুক্ত রাখতে হবে বৈকি। সে সোহাগ-যন্ত্র হল আইন সভা। সেখানে দেশের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। তাঁরা শুধু আছেন, আর কিছু নয়। একমাত্র ক্ষমতা বড়লাটের। দেশীয় প্রতিনিধিরা কোন বিষয়ে বাধা দিলে সে বাধা অপসারিত করতে খুব বেশি দেরি হয় না। অচলায়তনকে সচল করে বড়লাটের সার্টিফিকেট। দেশের প্রভু ইংরেজ। তাদের ইচ্ছাই ইচ্ছা। বাধা দেওয়া না দেওয়া দুইই সমান।

তবু কংগ্রেসকে খুশি করার চেষ্টা করেছিল ইংরেজ। রফা করতে চেয়েছিল কংগ্রেসের সঙ্গে। কারণ, কংগ্রেসের লক্ষ্য আইন সভায় মর্যাদা লাভ।

চির অসন্তুষ্ট বাংলা। বাংলাকে খুশি করা বড় সহজ নয়। বাংলা সহজে ভোলেনা, সন্তুষ্ট হয় না অল্পে। বাংলা চায় স্বাধীনতা-সম্মান। অসম্মানের বোঝা মাথায় বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

ব্যর্থ কংগ্রেস। বিপ্লববাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বাংলায়। অন্যায়

অত্যাচারের প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বিপ্লবী দল। মেরে মরার নীতি গ্রহণ করে বাংলার তরুণরা।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। সর্বদল সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব গৃহীত হল। উদ্দেশ্য, ভারতের ভাবী সংবিধান রচনা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার সূত্র উদ্ভাবন। সম্মেলনের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। তৈরি হল 'নেহেরু রিপোর্ট'। কলকাতা কংগ্রেস প্রথমে ওই রিপোর্ট মানতে চাইলো না। পরে সর্তসাপেক্ষ মেনে নিল রিপোর্ট। অনুরোধ, বিভিন্ন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ানে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের অনুরূপ সংবিধান একবছরের মধ্যে চালু করতে হবে; অন্যদিকে হুঁশিয়ারী, এতদনুযায়ী কাজ না হলে মাদ্রাজে গৃহীত স্বাধীনতা প্রস্তাবই কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য হবে।

এযাবৎকাল কংগ্রেসের নীতি, কংগ্রেসের মধ্যেকার প্রগতিপন্থী ও তরুণদলকে খুশি করতে পারেনি। তাঁদের মধ্যে কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কে অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য বেশি মাত্রায় প্রকাশ পেতে থাকে। তাই তাঁদের মনোভাবের প্রতিই লক্ষ্য রেখে মাদ্রাজ অধিবেশনে, স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়।

কিন্তু যাদের খুশি করার জন্য এই চেষ্টা, তাঁরা খুশি হন নি। কারণ কংগ্রেসের গৌহাটী অধিবেশনের (১৯২৬) সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, অন্যতম সাধারণ সম্পাদকদ্বয় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীজওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে মাদ্রাজ সহরেই স্বাধীনতা লীগের (Independence League) জন্ম। একবছর পরে সেই লক্ষ্যেই থেমে থাকে কংগ্রেস। ইংরেজদের ভয় দেখায়। খুশি করতে চায় প্রগতিপন্থী তরুণ দলকে।

খুশি হন না তরুণ দল। অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। বিস্ফোরণ ঘটে একদিন। সুবিধাবাদী প্রবীন কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান নবীনরা। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে নবীন প্রবীনের মতান্তর পথান্তরে এসে দাঁড়ায়। কংগ্রেসের দুই তরুণ

সম্পাদক জওহর সুভাষ 'নেহেরু রিপোর্ট' সমর্থন করলেন না। 'ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস' ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রস্তাবের প্রধান বিরোধী দুই তরুণ।

প্রমাদ গনলেন গান্ধীজী। অগ্রণী হয়ে দুই তরুণকে বোঝাবার দায়িত্ব নিলেন। বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বমতে আনলেন জওহরলালকে। 'নেহেরু রিপোর্ট' সমর্থন করলেন জওহরলাল।

কিন্তু সুভাষ বুঝলেন না। ব্যর্থ হলেন গান্ধীজী। প্রকাশ্য অধিবেশনে সরকারী 'ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করলেন তিনি।

গান্ধীবাদের সঙ্গে সুভাষবাদের প্রথম সংঘর্ষ।

করুণা নয়, দাবী। দেশ আমাদের, একমাত্র অধিকারী আমরা। স্বাধীনতা চাই—চাই সম্মান। পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়।

সেই পথেই এগিয়ে যেতে চাইলো ভারতবাসী। 'কুইট ইণ্ডিয়া' : ইংরেজ ভারত ছাড়ো। ইংরেজ তুমি চলে যাও। সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।

তরুণের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। ২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে প্রবীনের দল নতিস্বীকার করলো। সুবিধাবাদ নয়, স্বাধীনতা। শান্তি নয়, সংগ্রামের পথে যাত্রা সুরু। তবু·········

চোখ মেলে চাইলো বিনোদ। আলতো ভাবে হাতখানা নামিয়ে রাখতে গিয়েও রাখা হলনা। তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়েই কথা বললেন ডাঃ সান্যাল। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো হে?

বিনোদ হাসল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, মরিনি।

—ইয়ার্কি হচ্ছে ? সস্নেহ ধমক দিলেন ডাক্তার। হাতখানা নামিয়ে রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমার হাতে বড় একটা রোগী মরেনা, বুঝলে ছোকরা। এখন বল কেমন আছো ? কষ্ট-টষ্ট কি হচ্ছে ?

বড় ভাল লোক ডাক্তার সান্যাল। মফঃস্বলের এই হসপিটালের সিনিয়র সার্জেন। সুনাম দুর্নামে মেশামিশি তাঁর নাম। তাঁর সম্বন্ধে লোকের মুখে মুখে অনেক কথাই ফেরে। হাসি খুশি হলে কি হবে, মানুষটা বড় কড়া কড়া কথা বলেন। প্রৌঢ়ত্বের সীমা ছাড়িয়েছেন কিন্তু অতি বৃদ্ধদের সঙ্গেও তাঁর একই ব্যবহার। যা মুখে আসে তাই বলেন। কিন্তু রোগীর চিকিৎসায় তিনি অক্লান্ত। এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করেন না কখনো।

বিনোদকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তখন মধ্যরাত্রি। আঘাতে রক্তক্ষরণে মুমূর্ষু মৃতপ্রায়। রাতের কর্তব্যরত ডাক্তাররা কি করবেন ভেবে পান নি। অবশেষে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল ডাক্তার সান্যালকে।

সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে হাজির হয়েছিলেন ডাক্তার। রোগীকে একনজর দেখেই অপারেশন টেবিলে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। হাতে তুলে নিয়েছিলেন ছুরি কাঁচি। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করে অপারেশন রুম থেকে বেরিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে গিয়েছিলেন। গায়ে জড়ানো রাতের গাউন। পরদিন ঠিক সময়েই হাজির হয়েছিলেন হাসপাতালে।

অবাক হন জুনিয়ার ডাক্তারের দল। কিন্তু অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটার ভয়ে সাহস করে কেউ কোনদিন কিছু বলেন না। জানেন, বলতে গেলে তাড়া খাবেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার সান্যাল কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। কিন্তু অযাচিতভাবে কোন কথা কাউকে বলেন না তিনি। তিনি নিজের কাজ করে

যান নীরবে। কারো প্রশংসা অথবা নিন্দা তাঁকে লেশমাত্র স্পর্শ করে না।

বিনোদকে চুপ করে থাকতে দেখে যেন গর্জে উঠলেন ডাক্তার সান্যাল, কিহে চুপ করে কেন?

ভাল ভাবে জ্ঞান হবার পর দুটো দিনে ডাক্তারকে বেশ ভাল ভাবেই চিনে গেছে বিনোদ। ডাক্তারের গর্জনের উত্তরে জিজ্ঞাসা করল, কি বলবো বলুন?

অবাক হলেন যেন ডাক্তার। একমুহূর্ত বিনোদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, কি জিজ্ঞেস করলাম তোমায়?

বিনোদ বলল, কষ্ট একটাই।

—সেই একটার কথাই শুনতে চাইছি। জলদি বল আমাকে, বাড়ি ফিরতে হবে।

—শুয়ে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে।

—শুয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার সান্যালের ফরসা মুখখানা মুহূর্তে টকটকে লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু সংযত কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, খুব কষ্ট হচ্ছে?

—সত্যি।

—মারামারি করার সময় একথাটা মনে ছিলনা? যেন ফুঁসে উঠলেন ডাক্তার। গুণ্ডামী করতে লজ্জা করেনা। এখন বলছো শুয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। কি করবে, ফাঁসা ভুঁড়ি, ভাঙা পা নিয়ে আবার মারামারি করতে যাবে? যারা তোমাকে মেরেছে তাদের একহাত দেখে নেবে?

ডাক্তারের কথা শুনে বিনোদ বিস্মিত বিহ্বল। ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল, একি বলছেন আপনি?

—কেন, কথাটা কি খুব অন্যায় বললাম?

—আপনি বিশ্বাস করুন……।

তাকে থামিয়ে দিলেন ডাক্তার। বললেন, থাক হে ছোকরা,

আমাকে আর বিশ্বাস করাতে এসো না। বিশ্বাস করতে করতে আমার মাথার চুল পেকে গেল। আমাকে আমার অবিশ্বাস নিয়েই থাকতে দাও।

—আমি গুণ্ডা নই। আমি……। বলতে চাইল বিনোদ।

—তুমি রাজনৈতিক কর্মী। গুণ্ডা বদমাস সবাই আজ সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক কর্মী হয়েছে। দলে ভিড়ে গুণ্ডামী করছে। বলতে পারো, এতে লাভ কি হচ্ছে?

—আমি জানি না।

—না জেনেই রাজনীতি করছো? দলে দলে ছয়লাপ আজ দেশ। বিভিন্ন নীতি, বিভিন্ন পথ—লক্ষ্য নাকি একটাই, মানুষের অধিকার অর্জন। তাহলে নিজেদের মধ্যে মারামারি কেন? কেন পরস্পরের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা?

—আমি জানি না।

—তাহলে তুমি মার খেলে কেন? কেন তোমার ঠ্যাং ভাঙলো, ভুঁড়ি ফাঁসলো?

—একজনকে বাঁচাতে গিয়ে।

—বল কি?

—হ্যাঁ।

একটু গম্ভীর হলেন ডাক্তার সান্যাল। একটু যেন স্থির মনে হল তাঁকে। বেডের পাশের টুলটায় একটু নড়ে চড়ে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো মাষ্টারী করো?

—করি।

— রাজনীতি করো না?

—না।

—কেন?

অবান্তর প্রশ্ন। শক্ত একটা উত্তর দেওয়া যায়। চুপ করে রইলো বিনোদ।

ডাক্তার সান্ন্যালও একটু চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, দেখ, এটা আমার কৌতূহল। বাঙ্গালী রাজনীতি করে না, এটা ভাবা যায় না আর। কিন্তু তুমি সেদিন আহত হলে কি করে? বলছো একজনকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি আহত হয়েছো। সেই একজন কে? তাকে কারা মারছিল?

বলল বিনোদ, অহেতুক একটা হানাহানি বন্ধ করতে চেয়েছিল সে।

ডাক্তারের মুখে ম্লান একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, দেখ বিনোদ, তুমি যাকে অহেতুক ভেবেছো, যারা একটা ছেলেকে সন্দেহের বশে তার জীবনটাকে শেষ করতে চেয়েছিল তারা কর্তব্যবোধেই তা করেছিল।

—একি বলছেন আপনি? চমকে উঠলো বিনোদ।

—বলছি অনেক দুঃখে। হাসলেন ডাক্তার। আজ হানাহানির রাজনীতি। আসল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে অনেকেই। শুধু ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার খেলা যতদিন চলবে, হানাহানি ততদিন বন্ধ হবে না, হতে পারে না

—আপনি বলছেন······

বাধা দিলেন ডাক্তার। তাঁর ক্লান্তকণ্ঠ, আমার মনে হয়, আশঙ্কা। একদিকে মুনাফার পাহাড় আর একদিকে দারিদ্র্য। বিনোদ, আমি নিজে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম একদিন। সদ্য বিলেত ফেরৎ ডাক্তার তখন। পেশার দিকে নজর না দিয়ে লক্ষ্য হল দেশোদ্ধার। জেলে গেলাম। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর আমার বাবা। অনেক চেষ্টা করে আমাকে জেলছাড়া করে আনলেন। নিজস্ব চেম্বার খুলে দিলেন শ্বশুরের পয়সায়, আমার বিয়ের যৌতুক। দেখতে দেখতে পসার জমলো। দেশ স্বাধীন হল। মনের মধ্যে অতৃপ্ত ভাবটা দিনের পর দিন যন্ত্রণা বাড়াতে লাগলো। নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে

হয়। স্ত্রীকে বললাম। তিনি আমাকে সমর্থন করলেন। অনেক আগু-পিছু করে চেম্বার তুলে দিলাম। চাকরী নিলাম হাসপাতালে। প্রথম কলকাতায়। শেষে এই মফঃস্বলে চলে এলাম। কিন্তু···

বিনোদ তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

একটু চুপ করে রইলেন ডাক্তার সান্যাল। ধীরে ধীরে বললেন, চাকুরী না নিলেই বুঝি ভাল করতাম বিনোদ। শুধু ডাক্তার কি করতে পারে? অথচ চিকিৎসা খাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তার পরিমাণ নাকি নেহাৎ কম নয়। এর চেয়ে কলকাতার চেম্বারে বসে ডাক্তারীর ব্যবসা করলে ভাল করতাম। নিজেকে নিজের জবাবদিহি করার রাস্তা থাকতো। এখানে······

চুপ করলেন ডাক্তার সান্যাল। বিনোদ বলল, এখানে কি?

—আমি ডাক্তার। রোগীর সেবা আমার জীবনের ব্রত। কোন বিষয়ে সমালোচনা করা বোধ হয় আমার উচিৎ নয়। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বিনোদকে কোন প্রশ্ন অথবা কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন।

চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখল শুধু সে।

অথচ অনেক কথা জানার ছিল তার।

জানেনা মানুষ। জানানো হয়নি ভারতবর্ষের মানুষকে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্তের অনেক কথা, অনেক গোপন কাহিনী লুকিয়ে আছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে। মুক্তির কথাই ঘোষিত

হয়েছে বার বার। নেপথ্যের কলঙ্ক অঘোষিত। মুক্তিপণের অসম্মান মুক্তি-আনন্দে চাপা পড়ে গিয়েছিল সেদিন। পরে উপলব্ধি হয়েছে। যন্ত্রণায় আর্তনাদে হাহাকারে ককিয়ে উঠেছে মানুষ, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফেরবার পথ রুদ্ধ চলেছে প্রায়শ্চিত্ত।

এ প্রায়শ্চিত্তের শেষ কবে জানিনা। কোথায় চলেছি আমরা?

অহিংসার পূজারী গান্ধীজী ভারতীয়দের রক্তস্নানের পথ নির্দেশ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের মানুষ রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে পথ করে নিক ভবিষ্যতের। অখণ্ড ভারতের মানুষ হিন্দু মুসলমান নিজেদের মধ্যে হানাহানী করুক। কারণ তিনি ব্যর্থ, হিন্দু মুসলমান মৈত্রী বন্ধন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সম্ভব হয়েছিল একজনের পক্ষে। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজীর আদর্শ, তাঁর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী সব রকমের সাম্প্রদায়িকতা, ভেদনীতি, সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন, ভারত-মুক্তি। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন। ভারত জননীর ধর্মরক্ষা। সেখানে সর্বজাতি এক, সকলেই ভারত মাতার সন্তান।

নেতাজীর স্বপ্ন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও ব্যর্থ হয়েছিল। ইংরেজের হাতে বন্দী হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধার দল। বিনা বিচারে বন্দী হয়ে রইলেন তাঁরা।

ভাইসরয় ওয়েভেল তাঁর বিশেষ ক্ষমতার নির্দেশ জারি করে আইন সভায় বন্দী প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু দেশব্যাপী আন্দোলনে তা আর সম্ভব হল না। জনমতের চাপে লীগ এবং কংগ্রেস এক হল। নেহেরুও বন্দীদের মুক্তি প্রশ্ন হেস্ত-নেস্ত করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আইন সভায় মাউন্টব্যাটেনের উপস্থিতিতে সুরু হল বিতর্ক। লীগ সদস্য-বন্দীদের মুক্তি দাবী করে বক্তৃতা দিলেন। মুক্তিযোদ্ধার সম্মান দিলেন বন্দীদের। বিনাসর্তে সমস্ত বন্দীমুক্তি দাবী করলেন তিনি।

অথচ আইন সভার অধিবেশনের আগে লিয়াক আলী, নেহেরু, বলদেব সিং এবং ব্রিটিশ-ভারতের প্রধান সেনাপতি অকিন লেকের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনের উপস্থিতিতে আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেক বন্দীর মুক্তির প্রশ্ন স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করে বন্দীর মুক্তির দাবীর যৌক্তিকতা নির্ণয় করা হবে। পরামর্শ আহ্বান করা হবে ফেডারেল আদালতের। তাতে দোষী নির্দোষীর বিচারে শাস্তি অথবা মুক্তি পাবে বন্দীরা।

আইন সভার প্রায় সকল সদস্যই অকিন লেকের প্রস্তাবের বিরোধী। ব্রিটিশ সেনাপতি আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর বন্দীদের মুক্তি-যোদ্ধার সম্মান দিতে চান না। সম্মান দিলেন না পণ্ডিত নেহেরুও। অকিল লেককেই সমর্থন করলেন তিনি। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর বীরেরা মুক্তি যোদ্ধা নয়, যেন সাধারণ অপরাধী। ইংরেজ যে চোখে বন্দীদের দেখেছে, তিনিও তাদের সে চোখেই দেখলেন। প্রমাণ করলেন, ব্রিটিশের প্রতি তাঁর আনুগত্য।

বললেন, আজাদ হিন্দ্ সম্পর্কে বিচার করতে হলে নানা দিক ভেবে দেখবার আছে। সৈন্য বাহিনীর প্রতি সৈনিকের ব্যক্তিগত আনুগত্যের দিক। তার ওপর আবার আছে দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের প্রতি আনুগত্য দেখাবার জন্য ব্যক্তি মনের স্বাভাবিক আগ্রহের দিক। এই দুই আনুগত্যের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার প্রশ্ন যখন কোন ব্যক্তির সম্মুখে দেখা দেয়, তখন সে ব্যক্তিকে স্বভাবতই একটা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই পড়তে হয়।

নেহেরু বললেন, এই অবস্থা যখন দেখা দেয়, তখন সবচেয়ে সৎ ও ভাল লোকের মনের দুঃখই সবচেয়ে বেশি দুঃসহ হয়ে ওঠে, বাজে লোকের মনে কোন দুঃখ বোধের বালাই থাকে না। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রত্যেক ব্যক্তিই দেশপ্রেমিক ছিলেন না। যেমন জনসমাজের সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় তেমনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের

মধ্যেও কিছু ভাল লোক, কিছু খারাপ লোক এবং কিছু ভাল-মন্দ মেশানো মাঝারি চরিত্রের লোকও ছিল।

পণ্ডিত নেহেরুর মতে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর বন্দীরা মুক্তি-যোদ্ধা নন, অপরাধী। বিদেশী শাসনের অবসান চেয়েছিলেন তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থে। অথচ তিনি সুভাষচন্দ্রকে জানতেন, চিনতেন, পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁর বলিষ্ঠ চরিত্র ও নির্ভীকতার, যিনি অন্যায়কে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন, লোভ লালসাকে পদদলিত করতে দ্বিধা করতেন না। আপোষ নীতি ছিল তাঁর কাছে জাতির মেরুদণ্ডহীনতার পরিচায়ক। তিনি মনে প্রাণে জানতেন, বিশ্বাস করতেন, অন্যায়কে সমর্থন এবং অন্যায়কারীর সঙ্গে সহবস্থান দুইই জীবনের কলঙ্ক। দৃপ্তকণ্ঠে তাই তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, স্বায়ত্ব শাসন নয়, স্বাধীনতা। দাসত্বের জীবনযাপন নয়, মুক্তি।

মুক্তির উপায় অন্বেষণে তাই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন দেশ থেকে দেশান্তরে। বুঝেছিলেন সুবিধাবাদের মাধ্যমে দেশ কোনদিন মুক্ত হলেও মুক্ত হবে না মানবাত্মা। ভারতাত্মার পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল চিরদিন অদৃশ্যভাবে চেপে থাকবে। ব্যর্থ হবে মানুষের অনেক আশা আকাঙ্খা, স্বপ্নের ভবিষ্যৎ; দূর হবে না দারিদ্র অনাহার। অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলোক শিখা আলেয়ার রূপ নিয়ে ফিরে ফিরে যাবে।

ভিক্ষা নয় দাবী। স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। মূল্য তার যাই হোক না কেন। ধমনীর উষ্ণ রক্ত মাতৃবন্দনার শান্তিবারি। অশান্ত বুভুক্ষু হৃদয়ের পরম প্রাপ্তি।

স্বপ্ন তাঁর সফল হয়নি। ব্যর্থতা এসেছে। মুক্তিযোদ্ধা বীরের দল ধরা পড়েছেন। জীবনের শেষ পরিণতির অপেক্ষায় কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অবিচলিতভাবে প্রতীক্ষা করেছেন তাঁরা। মুক্তি যদি নাই আসে, মৃত্যুও গৌরবের। কিন্তু তাঁরা দেশপ্রেমিক

নন, এ যে জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ক লেপন। দেশোদ্ধারের ব্রতে উৎসর্গকৃত জীবন-বীর যোদ্ধার দল দেশপ্রেমিক নন?

বলেছিলেন পণ্ডিত নেহেরু। ইংরেজ চরিত্রের মহত্ব বজায় রাখতে এমন কথা তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল। প্রকৃত দেশ-প্রেমিকের আচরণই প্রকাশ করেছিলেন সেদিন তিনি!

কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দীদের সঙ্গে দেখা করার পরদিন (১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৬) প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলেছিলেন, কাল থেকে যে চিন্তা আমার মনে ভিড় করে আছে সেগুলি আপনাদের সঙ্গে আমাকে ভাগ করে নিতে দিন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্ত লোকেদের ভারতবর্ষ যথার্থ রাজকীয় অভ্যর্থনা জানিয়েছে। তাদের জাতীয় বীর বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই জনপ্রিয় অনুভূতির উত্তাল তরঙ্গে, মনে হচ্ছে সকলেই যেন অবগাহন করেছে। আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টাস্পষ্টি স্বীকার করব যে, এই রকম অনির্বিশেষ বীরপূজায় আমি অংশ গ্রহণ করতে পারি না। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এবং নেতাজী বসুর কর্মদক্ষতা, আত্মত্যাগ এবং স্বদেশপ্রেমের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু যে পদ্ধতি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তা আমি সমর্থন করতে পারি না। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কংগ্রেস যে পদ্ধতি গত পঁচিশ বছর ধরে অনুসরণ করে এসেছেন তার সঙ্গে এই পদ্ধতির কোন মিল নেই।

তিনি বললেন, যদিও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তাঁদের আশু লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছেন তবু তাঁদের কৃতিত্বে অনেক কিছু আছে যার জন্য তাঁরা গর্ব বোধ করতে পারেন। তার মধ্যে তাঁদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মের ও জাতির লোককে একটি পতাকার তলে একত্র করা এবং তাঁদের মধ্যে সব দেশের সাম্প্রদায়িকতা অথবা সঙ্কীর্ণতার মনোভাব ত্যাগ করে সংহতি ও একত্বের চেতনা অনুপ্রবিষ্ট করা। এটি এমন এক দৃষ্টান্ত যা সকলের অনুসরণ করা উচিৎ।

অথচ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একতাবদ্ধ হয়ে যাঁরা দেশের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন, ব্রিটিশের তুষ্টির জন্যে তাঁদের সম্পর্কে হীন মন্তব্য করতে সেদিন এতটুকু বিবেকে বাধেনি পণ্ডিত নেহেরুর। অথচ তিনিই গান্ধী-চিন্তার ধারক এবং বাহক। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তিনি হয়েছিলেন গান্ধীজীর উত্তরাধিকারী। ঘোষণা করেছিলেন গান্ধীজী নিজে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র দাবীদার কংগ্রেস। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি ছিনিয়ে এনেছে কংগ্রেস। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতের ইংরেজ শাসকদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অহিংসার ব্রতধারী হয়ে দেশে ফিরে গেছে তারা। যাদের দেশ তাদেরই হাতে তুলে দিয়ে গেছে!

কিন্তু সত্যই কি তাই?

কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনই কি দেশকে বিদেশী শাসন মুক্ত করেছে? না।

বিদেশী শাসন যন্ত্রকে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা বার বার আঘাত হেনেছেন, বেতনভুক্ত কর্মচারী হয়েও যাঁরা ব্রিটিশের আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়ে অশেষ নির্যাতন লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের সেই অবদান কি কিছু নয়? বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে, ব্যর্থ হবে জেনেও সেই যে বিদ্রোহ, সে কি পরাধীনতার গ্লানি-মুক্ত হবার আকাঙ্খার জন্য নয়?

ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ—প্রথম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুতীব্র

প্রতিবাদ। সিপাহী বিদ্রোহ স্বাধীনতার মুক্তিবাণী। বিদ্রোহ অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে।

দেশকে বিদেশী শাসকের হাত থেকে মুক্ত করার দুরন্ত প্রতিজ্ঞায় যেমন সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন আন্দোলন করেছে, তেমনি শাসনযন্ত্রকে আঘাত হানতে বিদেশীর গোলামীর খাতায় যারা নাম লিখিয়ে ছিলেন তাঁরাও কম আঘাত হানেন নি। সে আঘাতের পরিনাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও শাসকের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়েছে, অনাগত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে তাদের মনে। তারা বুঝেছে, এ আঘাত সাময়িক বিদ্রোহ হলেও পরিনাম সুখের হবেনা। আজ যা সীমাবদ্ধ পরিসরে ঘটছে, একদিন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত ভারতময়। ভারতের জনগণের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে বিদ্রোহীরা। অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে আসমুদ্র হিমাচল। অন্যায়ের, পাপের, অত্যাচারের শাস্তি দেবে ইংরেজকে। শেষ হবে ভারতের বুক থেকে বিদেশী শাসন, সেই সঙ্গে প্রতিটি বিদেশী।

উনিশশো পনের খ্রীষ্টাব্দ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। দিশাহারা ইংরেজ। টলে উঠেছে তার দুনিয়া জোড়া সাম্রাজ্যবাদ। ঠিক এমনি সময় ইংরেজের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে সিঙ্গাপুরস্থিত পঞ্চম নেটিভ লাইট ইনফ্যান্ট্রী বিদ্রোহ করল।

এ বিদ্রোহ মিত্রশক্তি কর্তৃক বন্দী জার্মান সেনাদের জন্যে। গদর-আন্দোলনের নেতা মোহনলালের নির্দেশ মেনে নিল ভারতীয় সেনারা। জার্মান ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাহায্যকারী। প্রতিদান দিতে হবে। মুক্ত করে দিতে হবে বন্দী সেনাদের।

ইংরেজ সমর নায়করা ভারতীয় বাহিনীর মনোভাব যেন বুঝতে পারল। সরিয়ে দিতে চাইলো পঞ্চম নেটিভ বাহিনীকে। পাঠিয়ে দিতে চাইলো হংকং-এ। কারণ জার্মান বন্দী আর ভারতীয় সেনারা

একত্রে থাকা নিরাপদ নয়। যে কোন মুহূর্তে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে খুব বেশি দেরি হলনা। ইংরেজ সমর নায়কদের অনুমান প্রামাণিত হল সত্য কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই।

কিন্তু কেন করলো ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহ ?

কেন মানল না ইংরেজ সমর নায়কদের আদেশ ?

সৈনিকের ধর্ম যুদ্ধ করা। সৈনিক আদেশ পালন করবে।

কিন্তু ভারতীয় সেনারা আদেশ পালনে অস্বীকৃত হল। মানল না আদেশ। কিন্তু কেন ?

পনেরোই ফেব্রুয়ারী উনিশো পনেরো খ্রীষ্টাব্দ। চীনা নববর্ষ।

সিঙ্গাপুরের চীনারা তাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে গেল জার্মান বন্দী নিবাসের কাছে। বন্দী নিবাস প্রথমে রক্ষার দায়িত্ব ভার ছিল ভারতীয় সেনাদের ওপর। কিন্তু চতুর ইংরেজ ভারতীয় সেনাদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই পাহারা দিচ্ছিল। ফলে চীনারা জার্মান বন্দীদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে বাধা পেল। বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি জানানো অপরাধ। সে অপরাধের শাস্তিও পেল তারা। উদ্ধত দাম্ভিক ইংরেজ সেনারা গুলি চালালো চীনাদের ওপর। পরিণতি, চীনা সাধারণ মানুষের দল আঘাতের প্রত্যাঘাত দিল আঘাতে। ইংরেজ পল্টনের ওপর যে যা পারলো তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের জীবনের নববর্ষ হল রক্তে রাঙা।

ডাক পড়লো ভারতীয় সেনাদের। আদেশ এগিয়ে যাওয়া। কেন, কিসের জন্যে তারা যাচ্ছে কিছুই জানানো হল না। জানল তখন যখন দেখল রক্ত স্রোত। আহত নিহতের রক্তাক্ত দেহ।

—আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা ? ভারতীয় সেনাদের প্রশ্ন।

—প্রশ্ন কোর না। ইংরেজ মেজরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

—আমরা জানতে চাই।

—এগিয়ে চল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ।

—না জানালে আমরা যাব না।

—আদেশ মানবে না?

—কেন যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি না জানালে নিশ্চই আদেশ মানবো না।

—এতো সাহস?

—নিশ্চই।

—এই শেষবার তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা আদেশ মানবে কিনা?

—নিশ্চই মানবো,যখন জানতে পারবো কি উদ্দেশে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদি তুমি মনে করে থাক, তোমার আদেশে নির্বিচারে আমরা চীনাদের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা করবো তাহলে তুমি খুব ভুল করেছো মেজর। আমরা সৈনিক, খুনী নই। অন্যায় খুনের আদেশ আমরা মানবো না।

একটা নেটিভ সেনার এত স্পর্দ্ধা! রাগে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয় মেজর। কঠিন কণ্ঠে আদেশ করে পার্শ্ববর্তী সৈনিককে, বন্দুক কেড়ে নাও ওর।

কিন্তু কে কার বন্দুক কাড়ে, সকলেরই এককথা। অন্যায় আদেশ তারা মানবে না। তারা খুনী নয়, সৈনিক।

ভারতীয় সেনাদের হাতের বন্দুক কে কাড়বে? কার এত সাহস? ফিরে গেল ইংরেজ মেজর। ফিরে গেল ফৌজের আরো কজন ইংরেজ অফিসার।

বিদ্রোহী নেটিভ লাইট ইনফ্যান্ট্রি। মুক্ত ভারতীয় সেনার দল। এবার? কি করবে তারা? কোথায় যাবে? কি তাদের পরিণতি?

পরিণতির কথা চিন্তা করেনা সৈনিক। সৈনিক জানে তার কর্তব্য। যুদ্ধ করবে তারা! যুদ্ধ করবে ইংরেজের সঙ্গে। যে ইংরেজ

তাদের দেশকে অন্যায়ের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ করে রেখেছে জাতিকে।

কঠিন প্রতিজ্ঞায় জ্বলে উঠলো তাদের চোখের দৃষ্টি। বাহু হল দৃঢ়। যুদ্ধ করবে তারা। আঘাত হানবে ইংরেজকে। বুঝিয়ে দেবে অন্যায়ের শাস্তি কি ভীষণ।

প্রথমে মুক্ত করে দিল তারা জার্মান বন্দীদের। সন্ধান চলল ইংরেজ অফিসারদের। কিন্তু কোথায় তারা? বীর পুরুষের দল তখন আশ্রয় নিয়েছে যুদ্ধ জাহাজে।

সতেরো থেকে কুড়ি ফেব্রুয়ারী। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল সিঙ্গাপুরের পথে পথে। যুদ্ধ শুধু ইংরেজ সৈনিকদের সঙ্গে নয়, যুদ্ধ চলল সিঙ্গাপুর বন্দরের রুশ, ফরাসী, জাপানী যতগুলি যুদ্ধ জাহাজ ছিল তাদের সৈনিকদের সঙ্গেও। ইংরেজের রক্ষার্থে সকলে এসে অস্ত্র ধরলো, বিদ্রোহী ন'শো ভারতীয় সেন আর জার্মান বন্দী সৈনিকদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিদ্রোহীরা পরাজিত হল ছত্রিশ নম্বর শিখ বাহিনীর হাতেই। শিখ বাহিনী অগ্রগামীদের পথানুসরণ করলো না, তারা ইংরেজ প্রভু:দর তুষ্টির জন্যে আক্রমণ করলো বিদ্রোহীদের। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চেয়ে আপন উজ্জ্বল ভবিষ্যতই কাম্য ছিল সেদিন তাদের।

কোর্ট মার্শালে বিচারের পর যখন বিদ্রোহীদের গুলি করে মারা হল তখন ছত্রিশ নম্বর শিখবাহিনীর একজন সৈনিকের প্রাণেও বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে উঠেছিল কিনা কে বলতে পারে!

কিন্তু প্রতিবাদে কেউ এগিয়ে আসেনি সেদিন।

এগিয়ে আসেনি সেদিনও, যেদিন নৌ বিদ্রোহীরা ভারতীয় নেতাদের দরোজায় দরোজায় ঘুরেছেন, আবেদন নিবেদন জানিয়েছেন। কারণ……।

সমস্ত কিছুর পিছনে একটা না একটা কারণ থাকে। প্রশ্ন ওঠে গ্রহণ বর্জনের। কিন্তু কি কারণে সেদিন ভারতীয় নেতারা, মুসলীম লীগ অথবা কংগ্রেস নৌ-বিদ্রোহীদের কাজের সমর্থন করলেন না তা অজ্ঞাত।

কারণটা কি বিদেশী প্রভুদের অসন্তুষ্টির ভয় ?

ইংরেজ যদি অসন্তুষ্ট হয় তাহলে হয়তো……

হয়তো সেদিন…এই হয়তোর প্রশ্নই দেখা দিয়েছিল অখণ্ড ভারতের জননেতাদের মনে। হয়তো সেদিন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তাঁদের মনে, স্বাধীনতা নামক সুপক্ক আম্র ফলটির মাধ্যাকর্ষণের বিলম্ব ঘটবে নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনের ফলে। হয়তো সেদিন তাঁরা কলহের মধ্যে নাক গলানো প্রয়োজনবোধ করেন নি এই কারণে, ভবিষ্যৎ সুখের হোক এই আশায়।

বিদ্রোহীরা ভুল করেছেন, পাপ করেছেন, অন্যায় করেছেন।

না, বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ করেছেন।

বিদ্রোহীরা অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিদ্রোহীরা মুক্তির সংগ্রাম করেছেন। জয়ী হয়েছেন। কিন্তু সেই জয়কে গ্রহণ করবার মত মনোবল সেদিন ভারতীয় নেতাদের ছিল না। মুখ আর মুখোশের অন্তরালে যে মন, সে মন ছিল তাঁদের অপ্রস্তুত, ভীত, করুণাপ্রার্থী। সত্যের নামে মিথ্যার বেসাতি করেছেন তাঁরা, ফিয়েছেন, ধোঁকা দিয়েছেন। ভেঙে দিয়েছেন জাতির মেরুদণ্ড। একশো আশি বছরের ইংরেজ শাসন নয়, তেইশ বছরের স্বরাজ, জাতির নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করেছে। নেতাদের মিথ্যাচার আজ জাতির অবনতির অসংখ্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণ। নেতাদের নেতৃত্ব আজ জাতিকে পতনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। লোভি স্বার্থপর হিংস্র করে তুলছে।

সেদিন নৌ-বিদ্রোহীরা কোন্ স্বার্থে বিদ্রোহ করেছিলেন ?

কি চেয়ে ছিলেন তাঁরা ?

মুক্তি কি তাঁদের কাম্য ছিলনা ?

বিদ্রোহের অন্তরালে ছিল দীর্ঘদিনের অন্যায় অবিচার ও অসৎ ব্যবহার। নাবিকদের একমাত্র অপরাধ, তারা ভারতীয়। ভারতীয় অপরাধে, যোগ্যতার কোন সম্মান ছিলনা নৌ-বাহিনীতে। ছিলনা নিরাপত্তার আশ্বাস ; ছিলনা খাদ্যের সুবন্দোবস্ত। একমাত্র কারণ ভারতীয়। ইংরেজের সঙ্গে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক। প্রভু এবং ভৃত্য কখনো সমান হতে পারে না। হোকনা প্রভুর চেয়ে যোগ্য। দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ যে জাতি, তাদের অধিকারের কোন মূল্য থাকতে পারেনা।

দিনের পর দিন অশেষ দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা অবিচারের মধ্যে পার হয়ে একদিন সহ্যের শেষ সীমায় উপনীত হল। আবেদন নিবেদন অথবা প্রত্যাশায় দিন কাটালে চলবে না, দাবী জানাতে হবে, অর্জন করতে হবে অধিকার, প্রয়োজন হলে ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করলে চলবে না।

একমাত্র পথ বিদ্রোহ !

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ।

বোম্বাইয়ের নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'তলোয়ার' জাহাজের একহাজার পাঁচশো নাবিক বিদ্রোহের সূত্রপাত করলেন। কর্তৃপক্ষের দেওয়া প্রতিদিনের খাবার খেতে অস্বীকার করলেন। কারণ খাবার অখাদ্য। অখাদ্য তাঁরা মুখে দেবেন না।

কর্তৃপক্ষও কঠোর। ওই খাবারই নাবিকদের খেতে হবে। ওই রকম খাবারই নাবিকরা এতদিন খেয়ে এসেছে। ও খাবার খেতে তারা বাধ্য।

বুকের মধ্যে জ্বলে উঠলো আগুন। প্রতিবাদে গর্জে উঠলো কণ্ঠ। ওপরওয়ালাদের অভদ্রতায় প্রতিটি নাবিকের মনই বিষিয়ে উঠলো। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো তাদের মন।

সে দিনটা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হৈচৈ চেঁচামেচিতে কেটে গেল।

পরদিন উউয়িন জ্যাক নামিয়ে ফেললেন নাবিকরা। রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভির নাম বদল করে নাম রাখলেন 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল নেভি'।

শুধু 'তলোয়ার' নয়, সেই সঙ্গে ক্যানাল ব্যারাকে বোম্বাইয়ের সমস্ত রণতরীর নাবিকরাও উউয়িন জ্যাক নামিয়ে ফেললেন। বিদ্রোহে যোগ দিলেন আরো উনিশটি বন্দর কেন্দ্রের নাবিকরা।

স্থরু হল ভারতবর্ষে নৌ-বিদ্রোহ। বিদ্রোহের ঢেউ বহে গেল বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ-করাচী-কলকাতা। বিদ্রোহের কথা ছড়িয়ে পড়লো ভারতবর্ষের দিকে।

নাবিক নেতারা ঘোষণা করলেন, ইংরেজের কোন আদেশ আমরা মানবো না, এখন থেকে আমরা কেবল ভারতের জাতীয় নেতাদের আদেশই পালন করবো।

কিন্তু বিদ্রোহী নাবিকদের আদেশ দেওয়ার মত কোন নেতা কি সেদিন ভারতবর্ষে ছিলেন না? না ছিলেন, কিন্তু নাবিকদের বিদ্রোহকে মেনে নেবার মত মনোবলের অভাব ছিল সেদিন। নীতির প্রশ্ন? নাবিকরা কি অন্যায় নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন?

না, কোন অন্যায় নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেননি নাবিকরা। শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস পদ্ধতিতেই তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। গান্ধীজী প্রদর্শিত পথেই তাঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বিদ্রোহী নাবিকদের। দুর্ভাগ্য ভারতের মুক্তিকামী জনগণের। বিদেশী শাসনের অবসানকল্পে যে বিদ্রোহ, অহিংসার ব্রত নিয়ে যে যাত্রা, সে যাত্রা সাফল্য লাভ করেনি। ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের নৌ-বাহিনী ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্বহীন। শাসকগোষ্ঠী দিশাহারা। ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ দমন করতে গিয়েও ফিরে গেছে। বিদ্রোহীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শাসকের আদেশ অমান্য করেছে তারা। ব্রিটিশ সৈন্যরাও ব্যর্থ হয়েছে বিদ্রোহ দমনে। শ্রমিক, সাধারণ মানুষ এগিয়ে দিয়েছে তাদের সহযোগিতার হাত। নৌ-বিদ্রোহের সাফল্য কামনা সকলের

মনে। বিদ্রোহীদের আশা, জাতীয় নেতারা নিশ্চই এগিয়ে আসবেন, শক্ত করবেন তাঁদের হাত।

কিন্তু ভারতীয় নেতারা ভিন্ন ধাতুতে গড়া। অদ্ভুত তাঁদের চরিত্র। কথায় তাঁরা কর্মবীর। তাঁদের আদর্শ, দেশপ্রেম, মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের মহিমামণ্ডিত। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্দেশে বারবার তাঁরা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, আমরা আছি। ভারতের আপামর জনগণের সেবায় আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। ভারতীয় জনগণই আমাদের আত্মা। আত্মার আত্মীয়।

ভারতীয় নাবিকদের আহ্বানে তাঁরা সাড়া দিলেন না। কংগ্রেস নেত্রী অরুণা আসফআলি পূর্বাহ্ণেই জানতেন বিদ্রোহের কথা। নাবিকদের বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিদ্রোহী নাবিকরা যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন তখন তিনি তাঁদের প্রশংসা করার পরিবর্তে করলেন তিরস্কার।

কারণ, ধর্মঘটীরা তাঁদের অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে রাজনৈতিক দাবীকে একাকার করেছেন। তাঁদের প্রতি কর্তৃপক্ষের অন্যায় অবিচার অসৌজন্যের প্রতিবাদ তাঁরা জানতে পারেন, ধর্মঘট করে তাঁদের দাবী পূরণ করতেও পারেন কিন্তু কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো মোটেই উচিত নয়। হলেই বা ব্রিটিশ পরদেশী, অন্যায়ভাবে পরাধীনতার শাসন শৃঙ্খলে দেশকে, জাতিকে বেঁধে রেখেছে, চরম অত্যাচার, অনাচার করছে মানুষের ওপর—তাই বলে এভাবে ছিনিয়ে নেওয়া কি উচিত নাকি? ছি: ছিঃ, ভারী অন্যায়, ভীষণ অন্যায়, রাজার জাতকে এভাবে বেইজ্জত অপমান করার কোন অধিকার নেই ভারতবাসীর। বিশেষ করে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত যখন ভারত। ভারতের নীতি শুধুমাত্র রাজনীতির জন্যে রাজনীতি নয়, অহিংসা এবং অসহযোগের মধ্যে ধর্মও মিশে আছে ওতপ্রোত-ভাবে। অহিংসার মূলমন্ত্র পরিবর্তন সাধন। বিদেশী শাসকের

চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করে সাফল্য লাভ করতে হবে. সার্থকতায় পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে অহিংসা এবং সত্যের মহামন্ত্রকে।

শ্রীমতী আলি তিরস্কারের পর বিদ্রোহীদের কিছু উপদেশও দিলেন। লৌহমানব সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করতে বললেন বিদ্রোহীদের। সেই সঙ্গে জরুরী টেলিগ্রাম করে পণ্ডিত নেহেরুকে বম্বে আসবার সংবাদ পাঠালেন।

নানা জনের নানা কথা, উপদেশ। ছোট মেজ মাঝারী নেতারা সব জ্ঞানানন্দ সরস্বতী। নানা জনে নানাভাবে জ্ঞান দিয়ে তাঁদের দায়িত্ব শেষ করলেন। মুসলিম লীগকে ধরার কথাও কেউ কেউ বললেন। কয়েদে আজম জিন্না মুসলিম নাবিকদের বাধ্য ছেলের মত কাজে যোগ দিতে বললেন। দিল্লীতে ইংরেজ সমর স'চিবের সঙ্গে মওলনা আজাদ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন নৌ-বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে।

পুণায় প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী বললেন, নাবিকেরা অসুখী হলে পদত্যাগ করতে পারে।

কেন বললেন, না, বিদ্রোহ হল হিংসার প্রকাশ। নৌ-বিদ্রোহের মধ্যে হিংসার গন্ধ তিনি পুণায় বসেই পেয়েছিলেন। তাই তিনি নাবিকদের পদত্যাগের কথা বললেন।

অথচ বিদ্রোহের সূত্রপাত পদত্যাগকে কেন্দ্র করেই। একজন নাবিক কর্তৃপক্ষের কাছে নৌ-বাহিনী থেকে বিদায় নেবার জন্যে পদত্যাগ পত্র পাঠালেন। অন্য আর একজন নাবিক নৌ-দিবসে 'ভারত ছাড়' শ্লোগান লিখলেন। ফলে প্রথম জনের তিন মাসের জেল, দ্বিতীয় জনের গ্রেপ্তারী। কারণ নৌ-বাহিনীতে পদত্যাগ করার কোন আইন ছিল না। কিন্তু জাতির জনক সে সংবাদ রাখতেন না। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, না পোষায় ছেড়ে দাও। কিন্তু ছাড়লে তো ছাড়া পাবেন নৌ-বিদ্রোহীরা!

২২শে ফেব্রুয়ারী লৌহ মানব সর্দার প্যাটেল নাবিকদের ধৈর্য ধরতে

এবং শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে অনুরোধ করলেন। নির্দেশ দিলেন, অস্ত্র ও আত্মসমর্পণের।

ভারতীয় নেতার দল নৌ-বিদ্রোহের বিপক্ষে। অতএব ব্রিটিশ সরকার আর কাল বিলম্ব করলো না। সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিদ্রোহীদের ওপর। শেষ হয়ে গেল নৌ-বাহিনীর নাবিকদের মুক্তি সংগ্রাম। বন্দী নিবাসের অন্ধকারে স্থান হল তাঁদের। কিন্তু কয়েক মাস পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হল। ভারতীয় নাবিকদের উদ্দেশে গান্ধীজী যে কথা বলেছিলেন, ইংরেজ তাই করলো। বিদ্রোহীরা বঞ্চিত হলেন তাঁদের জীবনের ভবিষ্যতের প্রাপ্য অর্থ থেকে। আর এ ব্যাপারেও কোন নেতা এগিয়ে এলেন না। অবশ্য কমিউনিষ্ট নেতারা ২২শে ফেব্রুয়ারী নৌ-বিদ্রোহের নিন্দাকারী জাতীয় নেতাদের কাছে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছিলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিবৃতিতে নৌ-বিদ্রোহের নিন্দা করেন গান্ধীজী।

আর পণ্ডিত নেহেরু ?

ধর্মঘট চলাকালীন তিনি ভীষণ ভাবে ব্যস্ত। একটি মুহূর্ত তাঁর সময় নেই। কিন্তু যেই ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল, হঠাৎ তিনি সময় পেলেন। ধর্মঘট প্রত্যাহারের দুদিন পরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সভার আয়োজন হল চৌপাট্টিতে। গলায় ফুলের মালা পরে মঞ্চে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন,…

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী :
ঢেকেছে তোমারে নিবিড় তিমির
যুগযুগ ব্যাপী অমা-রজনীর ;
মিলেছে তোমার সুপ্তির তীর
লুপ্তির কাছাকাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

জীবনের যত বিচিত্র গান
ঝিল্লি মন্ত্রে হল অবসান
কবে আলোকের শুভ আহ্বান
নাড়ীতে উঠিবে নাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

সঁপিবে তোমারে নবীন বাণী কে?
নব প্রভাতের পরশমাণিকে
সোনা করি দিবে ভুবনখানিকে
তারি লাগি বসি আছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

জরার জড়িমা আবরণ টুটে
নবীন রবির জ্যোতির মুকুটে
নব রূপ তব উঠুক-না-ফুটে—
করপুটে এই যাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

'খোল খোল দ্বার ঘুচুক আঁধার'
নবযুগ আসি ডাকে বার বার—
দুঃখ আঘাতে দীপ্ত তোমার
সহসা উঠুক বাঁচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

ভৈরব রাগে উঠিয়াছে তান,
ঈশানের বুঝি বাজিল বিষাণ;
নবীনের হাতে লহো তব দান
জ্বালাময় মালা গাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

কবি কণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বান। ঘুম ভাঙ্গার ডাক দিয়েছেন তিনি সে ডাক তাঁর ব্যর্থ হয় নি। নিস্ফল হয়নি তাঁর দুরন্ত আহ্বান। ঘুম ঘোর টুটে জেগে উঠেছে মানুষ। শত সহস্র কণ্ঠ কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে ধরা। সত্যের লক্ষ্যপথে সুরু হয়েছে দৃঢ় পদক্ষেপ। নবীনের যাত্রাপথে উচ্চারিত হয়েছে প্রাণের আশীর্ব্বাণী '

যাত্রী দলের কাণ্ডারী মহাত্মা গান্ধী। তিনি নেতা। তাঁর নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে শান্তি সেনার দল ' এগিয়ে চলেছে লক্ষ্য-পথে। মুক্তি মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার সময় আসন্ন, নবীন রবির সোনালী কিরণধারা দেবতার আশীর্ব্বাদের মত ঝরে পড়তে সুরু করেছে আকাশের গা বেয়ে। মন্দিরে বাজছে কাঁসর ঘণ্টা, আজানধ্বনি ভাসছে বাতাসে, মায়ের বুকের কাছে সদ্য ঘুমভাঙ্গা শিশু নির্ভরতার আশ্বাসে প্রদীপ্ত উজ্জ্বল, প্রকৃতির দুরন্ত আহ্বান—কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া আর হলনা শিশুর. আতঙ্ক বিস্ফারিত নেত্রে আবার সে জড়িয়ে ধরলো মায়ের কণ্ঠ। ভয়ে মুখ ঢাকলো বুকে।

বিদেশী শাসকের স্তব্ধ ভয়ার্ত কণ্ঠ রণহুঙ্কারে গর্জে উঠলো তৎক্ষণাত।

একবার দুবার নয়, বারবার। রহস্যময় গান্ধীনীতি। দুর্বোধ্য বিস্ময়কর। অহিংসা মূল মন্ত্র। তিনি শত্রুকে বিব্রত না করে চান শত্রুর হৃদয়ের পরিবর্তন। যখন দেখেছেন দুর্বার আন্দোলনে ব্যতিব্যস্ত ইংরেজ, অসহায় করুণ তাদের অবস্থা। একমাত্র পথ শাসনের অবসান। তখনই তিনি আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন। অবশ্য আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার পিছনে যুক্তির অভাব কখনো হয় নি। সে যুক্তি অন্যে মানুক অথবা না মানুক, নেতা তিনি, তাঁর আদেশ অবশ্য মান্য।

সর্বত্যাগী দেশবন্ধু তাই বলেছেন,"মহাত্মা (গান্ধী) চমৎকার ভাবে অভিযান আরম্ভ করেন, তিনি অভ্রান্ত দক্ষতার সহিত ইহা পরিচালনা করেন, তিনি একটির পর একটি সাফল্য অর্জন করেন কিন্তু যেই

আন্দোলন চরম পর্য্যায়ে পৌঁছায় অমনি তাঁহার মনোবল ভাঙিয়া যায় ও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়েন।"

গান্ধী সম্পর্কে মিথ্যা তিনি বলেন নি। ১৯২০ ও ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দের গান্ধী নেতৃত্বের আন্দোলন তাঁর নিষেধাজ্ঞার ফলেই বন্ধ হতে বাধ্য হয়েছিল। যে মুক্তি, বন্ধনদশা থেকে পরিত্রাণ, চেয়েছিল মানুষ তা পাওয়া যায়নি।

এবং শেষ পর্যন্ত ভারত-মুক্তির বিরুদ্ধাচারণে অবতীর্ণ হলেন গান্ধীজী।

অভিযোগ?

হয়তো অভিযোগ, কিন্তু মিথ্যা নয়। ভারত-মুক্তি আন্দোলনে গান্ধী জীবনের শেষ অধ্যায়ের ব্যবহারই তাঁর প্রতি অভিযোগের প্রমাণ।

বিদেশী শাসকের অকথ্য অত্যাচার। আন্দোলনের প্রায় সকল নেতা ও নব্বই হাজার কর্মী কারারুদ্ধ। তবু আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হল না। মানুষের জাগরণে ইংরেজ ভীতসন্ত্রস্ত। কিন্তু মহাত্মা অকস্মাৎ একটা আনুসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করলেন। ভারত-মুক্তি তখন তাঁর কাছে গৌণ। মুখ্য বিষয়টির সন্তোষজনক মিমাংসার জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করে আন্দোলনকে মুলতুবী করে দিলেন।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে গান্ধী হরিজনদের জন্যে আলাদা নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাবের পূর্ণ শক্তিতে বিরোধীতা করেছিলেন। এমনকি ডঃ আহম্মদ করের, সকল হিন্দুর এক নির্বাচক মণ্ডলীর ভিত্তিতেও তাদের জন্যে আইন সভায় কয়েকটি আসন সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ঐ বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, 'এই প্রস্তাবের বিরোধী যদি আমি মাত্র একাও হই, তাহলেও আমি জীবন পণ করে বাধা দেব।'

১৭ই আগস্ট ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ র‍্যামাস ম্যাকডোনাল্ডের কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষিত হয়েছিল। বাঁটোয়ার ব্যবস্থায় বলা

হয়েছিল, মুসলমান, ইউরোপীয় ও শিখ ভোটদাতারা পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী ব্যবস্থা অনুযায়ী নিজেদের প্রার্থী নির্বাচন করবেন, তবে এই নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হবার দশ বছর পরে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির সম্মতি নিয়ে পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংবিধানে দেওয়া হবে।

হরিজন শ্রেণী সম্পর্কে ঘোষণায় বলা হয়েছিল, "হরিজন শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা ভোটাধিকার পাবেন, তাঁরা সাধারণ কেন্দ্রগুলিতেই ভোট দেবেন। তবে এই শ্রেণী অল্প কালের মধ্যে শুধুমাত্র এই ব্যবস্থার দ্বারা আইন সভাগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব সংগ্রহ করতে পারবে বলে মনে হয়না, তাই তাদের জন্যে নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী কতকগুলি বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হবে। এই আসনগুলি কয়েকটি বিশেষ নির্বাচন কেন্দ্রের মাধ্যমে পূর্ণ করা হবে এবং ঐ কেন্দ্রগুলিতে শুধু মাত্র ভোটাধিকার প্রাপ্ত হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরাই ভোট দিতে পারবেন। উপরে বিবৃত নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিতে যাঁরা ভোট দেবেন তাঁরা সাধারণ কেন্দ্রগুলিতেও ভোট দেবার অধিকারী থাকবেন। যে সকল অঞ্চলে বহুসংখ্যক হরিজনের বাস সেই সকল অঞ্চলেই বিশেষ নির্বাচনী কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং একমাত্র মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই এই ধরণের বিশেষ নির্বাচনী কেন্দ্র (মুসলমান, ইউরোপীয় ও শিখেদের জন্যে যেমন হবে) সারা প্রদেশ জুড়ে গঠিত হবে না।

তবে মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, হিন্দু ও হরিজন উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক সমর্থিত অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা উপস্থিত করলে তিনি তা অনুমোদন করবেন।

১৮ই আগষ্ট গান্ধীজী পত্রযোগে প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন, যে তিনি ২০শে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্ন থেকে আমরণ অনশন আরম্ভ করবেন এবং শুধুমাত্র এই নির্ব্বাচন ব্যবস্থা পরিবর্তিত করে হিন্দু ও হরিজনদের একই নির্ব্বাচক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করবার ব্যবস্থা করলে এই অনশন ভঙ্গ করবেন।

গান্ধীজীর আমরণ অনশন প্রস্তাবে সারাদেশ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। সুরু হয়েছিল আবেদন নিবেদন, কাকুতি মিনতি। গান্ধীজী অটল। তিনি অনশন আরম্ভ করলেন। ভারতে পালিত হল উপবাস ও প্রার্থনা দিবস। তারপরই সুরু হল দর কষাকষি। ডঃ আম্বেদকর সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। দুটি সর্তে সমগ্র হিন্দুদের জন্যে একই নির্ব্বাচক মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব স্বীকৃতি পেল। প্রথম সর্ত: সমগ্র দেশের আইন সভাগুলোতে হরিজনদের জন্যে ৭১টির পরিবর্তে ১৪৮টি আসন সংরক্ষিত করতে হবে। ব্রিটিশ-ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভার সাধারণ কেন্দ্রগুলোর মোট যতগুলো আসন থাকবে তার ১৮ শতাংশও অনুরূপ ভাবে হরিজনদের সংরক্ষিত করতে হবে।

দ্বিতীয় সর্ত: সংরক্ষিত আসনগুলোর প্রত্যেকটার জন্যে শুধুমাত্র হরিজনদের ভোটের দ্বারা চারজন করে প্রার্থী প্রথমে নির্ব্বাচন করতে হবে এবং শুধুমাত্র এইভাবে নির্ব্বাচিত প্রার্থীরাই সাধারণ নির্ব্বাচনে কেন্দ্রগুলিতে সংরক্ষিত আসনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারবেন। এই চুক্তির নাম হল 'পুণাপ্যাক্ট।' হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশ সরকারের চুক্তি অনুমোদন করলেন। সংবিধানও প্রয়োজনীয় ভাবে সংশোধন করা হয়েছিল। হরিজন শ্রেণী একই সঙ্গে লাভ করেছিল দুরকম সুবিধা। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় তারা যতগুলি আসন পেয়েছিল, এই চুক্তির ফলে তার দ্বিগুন আসন লাভ করেছিল। এবং কিছুটা পরিবর্তিত আকারের হলেও পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় নি।

সেদিন গান্ধীজীর জীবন রক্ষাই ছিল মানুষের কামনা, হিসাবের চিন্তা ছিল না। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে ২৬শে সেপ্টেম্বর অনশন ভঙ্গ করেছিলেন গান্ধীজী।

কিন্তু কিসের জন্যে গান্ধীজীর অনশন ? না, বিশাল ভারতের অসংখ্য মানুষের মুক্তির পরিবর্তে একটা সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্য।

গান্ধীজী তাঁর এই আচরণে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য এই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় তিনি ইতিপূর্বে আরো দুবার দিয়েছিলেন। ১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন স্থগিতিকরণ এবং ১৯৩১ সালে গান্ধী আরউইন চুক্তি।

এরপর থেকে তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ব্যাপারেই মনোযোগ ও কর্মশক্তি নিযুক্ত করেছিলেন। আন্দোলনের চরম পর্যায়ে অন্দোলনকে সাময়িক ভাবে ভরাডুবি করে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অভাবে আন্দোলন থেমে থাকেনি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী সারা ভারতে স্বাধীনতা দিবস প্রচণ্ড উৎসাহে পালিত হল। ইংরেজের পীড়ন, গুলিবর্ষণ, গ্রেপ্তারী কোন কিছুতেই রুদ্ধ হলনা আন্দোলন। গান্ধীহীন আন্দোলনের অগ্রগতি। স্বাধীনতাই চরম লক্ষ্য তখন কংগ্রেসের।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য। কিন্তু অধিবেশনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। পথে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। নির্দিষ্ট দিনে পুলিশের লাঠির আঘাতে মাথা ফাটিয়েও অনুষ্ঠান করেছিলেন অনুষ্ঠানকারীরা। নেত্রী ছিলেন মিসেস জে, এম, সেনগুপ্তা। মিসেস সেনগুপ্তাকে ছ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মুক্তি লাভের পর কলকাতায় এসেছিলেন পণ্ডিত মালব্য। পুলিশের পীড়নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে গত ১৫ মাসে কয়েক সহস্র নারী ও বহুসংখ্যক শিশুসমেত প্রায় ১,২০,০০০ ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। এ তথ্য আজ সর্বজনবিদিত যে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ নিপীড়ন আরম্ভ করার সময় আশা করেছিলেন যে ছ' সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেসকে ধ্বংস করা যাবে। পনের মাস সময়ের মধ্যে তাঁরা তাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারেন নি। এর দ্বিগুণ সময় পেলেও তাঁরা তা করতে সমর্থ হবেন না।"

এ সম্পর্কে সুভাষ বসু মন্তব্য করেছিলেন, "ইহা একজন উত্তপ্ত

মস্তিষ্ক তরুণের নয়—কংগ্রেসের প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা নরমপন্থী একজন নেতার ভাষ্য। সুতরাং প্রস্তুতির অভাব, ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমেই দলীয় নেতা ও অর্থসাহায্যকারীদের অকস্মাৎ গ্রেপ্তার এবং ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে মহাত্মার উপবাস ও তারপর অস্পৃশ্যতা নিবারণী আন্দালনের দ্বারা সৃষ্ট ভিন্ন দিকে আকর্ষণ সত্বেও ১৯৩২-৩৩ সালের কংগ্রেসের আবেদনে সমগ্রদেশ যেভাবে সাড়া দিয়াছিল তাহাকে কোনমতেই অসন্তোষজনক বলিয়া মনে করা যায় না।"

এমনকি গান্ধী সম্পর্কে জওহরলালের মনোভাব—"চরম আত্মোৎসর্গের জন্য একটি গৌণ বিষয়কে বাছিয়া লইবার জন্য আমি তাঁহার (গান্ধীজীর) প্রতি বিরক্তি অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের পরিনাম কি দাঁড়াইবে? অন্তত সাময়িক ভাবেও কি মুখ্য বিষয়কে উপেক্ষা করা হইল না? যদি তিনি তাঁহার তৎকালীন লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিতেন ও হরিজন শ্রেণীর জন্য যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থা গ্রহণ করাইতে পারিতেন তাহা হইলেও কি অনেক কিছু পাওয়া গিয়াছে ও বর্তমানে কিছুকাল আর কিছু করিবার নাই এই প্রতিক্রিয়া ও ভাবধারার সৃষ্টি হইত না? তাঁহার এই আচরণ কি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যাপক পরিকল্পনা ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রস্তাবে স্বীকৃতি ও তাহাকে আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না? ইহার কি অসহযোগ ও আইন অমান্যের সহিত সামঞ্জস্য ছিল? এতদূর আত্মোৎসর্গ ও সাহসিক প্রচেষ্টার পর আমাদের আন্দোলন কি তুচ্ছ একটা বিষয়ের মত ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া যাইবে?

ধর্মের অনুশাসন ও ভাবাবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রাজনৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হইবার জন্য ও এই সম্পর্কে সদাসর্বদা ভগবানের নামোল্লেখ করিবার জন্য আমি তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম। এমন কি তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন যে ভগবান নাকি তাঁহার

উপবাস আরম্ভের দিনটি পর্যন্ত নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। কি সাংঘাতিক দৃষ্টান্তই না সৃষ্টি করা হইল।"

এর চেয়ে আরো সাংঘাতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইলেন গান্ধীজী। শেষ করে দিতে চাইলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন।

কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সংবাদে জনচিত্ত আলোড়িত। ঠিক এই সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, "হরিজনদের উন্নয়নের ব্যাপারে জাগ্রত থাকবার ও অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি রাখবার উদ্দেশে" তিনি তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের চিত্ত নির্মলীকরণের জন্যে একুশ দিন্ উপবাস করবেন।

সুযোগ সন্ধানী ইংরেজ সরকার মুক্তি দিল গান্ধীকে। কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলন নয়, হরিজনদের জন্যে উপবাস। খুব ভাল, এই তো চাই। এই না হলে মহাত্মা!

মুক্ত গান্ধী কংগ্রেস সভাপতিকে একমাস বা ছয় সপ্তাহের জন্যে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখবার পরামর্শ দিলেন। প্রকাশ করলেন সুদীর্ঘ বিবৃতি। এই গুরুত্ব বিশিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের স্বপক্ষে যুক্তি দেখালেন—

(১) কোন অবান্তর বিষয় অর্থাৎ হরিজনদের উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ দিলে আমার এই উপবাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

(২) এই আন্দোলন যেভাবে গোপনীয়তার আশ্রয় লইয়াছে তাহা তাহার সার্থকতার পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৩) সাধারণ মানুষ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। অর্ডিনান্সগুলি তাহাদের ভীত করিয়া তুলিয়াছে এবং আমার মনে হয় যে আন্দোলন চালাইবার গোপন পন্থাই তাহাদের এইভাবে নীতিভ্রষ্ট করিবার জন্য দায়ী। আইন অমান্য আন্দোলন, আন্দোলন-

কারীদের সংখ্যার ওপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নরনারীর নৈতিক চরিত্রের উপর।

(৪) উপবাসের তিন সপ্তাহ কাল সকল প্রতিরোধীরাই নিদারুণ আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া থাকিবে।

গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধের পক্ষে যে যুক্তিগুলি দেখিয়েছিলেন সেগুলি কি গ্রহণযোগ্য ?

না। একজন সাধারণ মানুষও এই বিবৃতিকে একজন যোগী অথবা সাধুর উচ্ছ্বাস ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করতে পারেনা। কারণ, তাঁর প্রথম যুক্তি সম্পূর্ণ অবান্তর এবং মিথ্যা ভাষণ। যা তাঁর প্রাপ্য নয় তাই তিনি দাবী করেছিলেন। গান্ধীহীন আন্দোলন থেমে থাকেনি। তিনি তখন কারারুদ্ধ। তাঁকে বাদ দিয়েই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। তবু তিনি সে সময়ের আন্দোলনের পরিচালক বলে দাবী তুলেছিলেন। উপবাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার আশঙ্কা করেছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় যুক্তিটি শুধু অদ্ভুত নয় আশ্চর্যজনকও। যে কোন বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর নিন্দাকে মেনে নিতে পারেন না। তাঁর নিন্দা সম্পর্কে কে, এফ, নরিম্যান মন্তব্য করেছিলেন—"যুদ্ধ অথবা ক্রীড়ার কোন বিধি অনুযায়ী আমরা শত্রুপক্ষের নিকট আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যপন্থা প্রকাশ করিতে বাধ্য ?...স্বীয় পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ কার্য প্রণালী সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষাই আধুনিক যুগের আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনার মুখ্য বিষয় বস্তু।"

শুধুমাত্র আধুনিক যুগ কেন, সর্ব যুগের সর্ব কালের, গোপনীয়তা রক্ষা করাই যুদ্ধ বিধি। রামায়ণ, মহাভারতে এই গোপনীয়তা রক্ষার প্রমাণ বহুভাবে আমরা পেয়েছি। শিক্ষালাভ করেছি। গান্ধী চিন্তার উদ্ভব কোন্ যুগের শিক্ষায় তা ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় লেখা নেই। তাঁর কথায় এবং কাজের মধ্যে বার বার সামঞ্জস্যহীনতার পরিচয় পাওয়া গেছে। তার চাওয়া পাওয়ার মাঝে দুস্তর ব্যবধান। নিজের

অপূর্ণ অবাস্তব চিন্তা তিনি বার বার সমগ্র মানুষের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। বহু অন্যায় আদেশে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন।

তাঁর তৃতীয় যুক্তিটি অনাবশ্যক পদবাহুল্যে ভর্তি ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি যা কোন মহান নেতার পক্ষে কোন দিক দিয়েই গৌরব জনক নয়। তাছাড়া মতামতের ব্যপারও যথেষ্ট রয়েছে, তাঁর অভিমতকে কোনমতেই ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করা যায়না।

শেষ যুক্তি সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে, আইন অমান্য আন্দোলন যদি গান্ধীর যুগান্তকারী আমরণ অনশনের সময়ও চলে থাকতে পারে তাহলে তাঁর তিন সপ্তার উপবাসের সময়ও চলা কঠিন হত না।

অবশ্য তিনি সরকারকে অর্ডিনান্সগুলো প্রত্যাহার করতে এবং আইন অমান্য আন্দোলনে বন্দীদের মুক্তির জন্যে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু লর্ড ওয়েলিংডন গান্ধী নন, তিনি তাঁর আবেদনে কর্ণপাত করলেন না, উপরন্তু তাঁকে কড়া ধমক দিলেন।

কারণ ইংরেজ, আন্দোলন স্থগিত নয়, বন্ধ করতে চায়। এবং সে পথ আলোচনার মাধ্যমে নয় লাঠি-গুলি দিয়ে। শাসন এবং শোষণ যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, মিথ্যা সময় নষ্ট করার সময় কোথায় তাদের? মিথ্যা সময় নষ্ট করেছিলেন আরুইন, গান্ধীর সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। সরেও যেতে হয়েছিল সেজন্যে। লর্ড ওয়েলিংডন শাসক, শাসন ক্ষমতার প্রতি যথেষ্ট আস্থা ছিল তাঁর, সেইজন্যে গান্ধীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, ছেলেখেলার দিন শেষ হয়ে গেছে। আবেদন নিবেদনে কিছু হয় না, নিজের প্রাপ্য আদায় করে নিতে হয়।

ওয়েলিংডনের স্পষ্ট জবাবে, আদায়ের পথে গেলেন না গান্ধী। মাথায় চেপেছে তাঁর হরিজনের ভূত। জাতির মুক্তি আসুক বা না

আসুক। মুক্তি লগ্ন পিছিয়ে যাকগে, কি এসে যায় তাতে তাঁর? তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হলেই হল। বৃহত্তর স্বার্থের চেয়ে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ তাঁর কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। তিনি অমর হতে চান।

তৎকালীন কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি অ্যানে গান্ধীজীর পরামর্শে প্রথমে ছ সপ্তাহ, পরে আরো ছ সপ্তাহের জন্যে আন্দোলন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেন।

অনশন আরম্ভ করলেন গান্ধীজী, শেষও করলেন। দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার পর পুণায় ১২ই জুলাই (১৯৩৩) কংগ্রেসীদের বেসরকারী সম্মেলন বসলো। প্রথম দিন সাধারণভাবে আলোচনা হল। দ্বিতীয় দিন সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন গান্ধীজী। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেছিলেন।

(১) বিনাসর্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার

(২) ব্যক্তিগত আইন অমান্য।

কিন্তু গান্ধীজীর দুর্ভাগ্য, তাঁর দুটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তবে এই সিদ্ধান্ত সে সভায় গৃহীত হয়েছিল, গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছাবার জন্যে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আবেদন জানাবেন।

ভাবতে লজ্জা করে, ৯ই মে (১৯৩৩) ঘোষণাপত্রে আলাপ আলোচনার পথ বন্ধ করে দিয়েছে ইংরেজ সরকার, সেখানে গান্ধীর সাক্ষাৎকারের সিদ্ধান্ত কি করে গৃহীত হতে পারে? আত্মমর্যাদা মানুষের বড় সম্পদ। ভিক্ষুকেরও আত্মমর্যাদা আছে। আত্মমর্যাদা জ্ঞানহীন বলতে একমাত্র জীব পশুকেই বোঝায়। ভারতবর্ষের মানুষ কি সেদিন পশুর চেয়ে অধম স্তরে পৌঁছেছিল। জাতীর জনকের মর্য্যাদাহানি কি সমগ্র জাতির মর্যাদা হানি নয়। ভারতের জনগণের মর্যাদাহানির জন্যে একমাত্র দায়ী কংগ্রেস।

ভাইসরয় সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ইংরেজের

অপমানকর উপেক্ষার পর, সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত জাতীয় মর্যাদা রক্ষার অতি হীন পদ্ধতি। গণ-আইন অমান্য প্রত্যাহার করা হয়েছিল, শুধুমাত্র যাঁরা সক্ষম এবং ইচ্ছুক শুধু তাঁদেরই ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র তাই নয়, গণ-আন্দোলন স্থগিত করা হেতু কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতির আদেশে কংগ্রেস সংগঠন ও সংগ্রাম পরিষদগুলোর কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

আঠারো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত সবরমতী আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে আন্দোলন প্রবর্তিত করলেন গান্ধীজী। আশ্রমের জমি বাড়ি ঘর, সংগৃহীত শস্যভাণ্ডার নিতে সরকারকে অনুরোধ জানাল হল। অবশ্য সরকার তা নিল না। কিন্তু গান্ধীজী পার্থিব সম্পত্তির মমতা মুক্ত হলেন। ডাণ্ডি অভিযানের প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন। ডাণ্ডি যাত্রার আগে তিনি বলেছিলেন, স্বরাজ লাভ না করা পর্যন্ত তিনি আশ্রমে ফিরে আসবেন না। স্বরাজ দূর অস্ত, অতএব আশ্রম ভেঙে দেওয়াই শ্রেয়।

সুরু হবে ব্যক্তিগত আইন অমান্য। দিনক্ষণ সব ঠিক। ১লা আগষ্ট 'রাস' নামক গ্রাম অভিমুখে পদযাত্রা আরম্ভ করে আন্দোলনের সূচনা করবেন গান্ধীজী। কিন্তু সূচনার আগেই শেষ হয়ে গেল তা। আগের রাত্রে গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন ৪ঠা আগষ্ট। তাঁর ওপর পুণা-বাসের আদেশ জারি হল। সে আদেশ অমান্য করে আবার তিনি কারাবরণ করলেন। এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু সমস্ত দেশে শত শত লোক গান্ধীজীর দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে কারারুদ্ধ হল।

কারাভ্যন্তরে অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত নিলেন গান্ধীজী। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সুযোগ সুবিধা দিতে অস্বীকার করলেন। প্রতিবাদে ১৬ই আগষ্ট অনশন সুরু করলেন তিনি।

অনশনের ফলে শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠলো। ২৩শে আগষ্ট কর্তৃপক্ষ মুক্তি দিলেন তাঁকে। কারামুক্ত গান্ধীজী তারপর হরিজন আন্দোলনের অগ্রগতির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সময় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি বল্লভ ভাই প্যাটেল, তাঁর গ্রেপ্তারের পর, যাঁরা ক্রমান্বয়ে একজন গ্রেপ্তার হলে অপর জন অস্থায়ী সভাপতি হবেন, এমন ব্যক্তিদের নামের একটা তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আইন অমান্য স্থগিত করার সময় অস্থায়ী সভাপতি ছিলেন অ্যানে কিন্তু তিনিও ১৪ই আগষ্ট ব্যক্তিগত ভাবে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর পর অস্থায়ী সভাপতি হলেন শার্দ্দুল সি কবিশের। তিনিও আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হলেন আর সেই সঙ্গে পরবর্তী জন যাতে অস্থায়ী সভাপতি না হতে পারেন তার ব্যবস্থাও করে গেলেন। অস্থায়ী সভাপতির পদ বিলুপ্ত করার নির্দেশ দিয়ে, আইন অমান্য আন্দোলন যাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশে কংগ্রেস সংগঠনের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত লোপ করা হল।

কিন্তু ব্যক্তিগত আইন অমান্য কেন?

১২ই জুলাই পুণা সম্মেলনে ব্যক্তিগত আইন অমান্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পরেও কিভাবে তা পুনরুজ্জীবিত হল? কোন্ মহৎ প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে?

"শুধুমাত্র গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে ভাইসরয়ের অসম্মতির প্রতিবাদ!"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য কে, এফ্, নরিম্যান সমগ্র ব্যাপার ও গান্ধীর আদর্শ সম্পর্কে তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বর্তমান জাতীয় যুদ্ধনাদ হচ্ছে সাক্ষাৎকার অথবা মৃত্যু!......আগষ্ট মাসে সংগ্রামের পুনরারম্ভের লক্ষ্য স্বরাজ অথবা

রাজনৈতিক সংবিধানীয় অগ্রগতির প্রচেষ্টা নয়, এটি ছিল শুধুমাত্র নিঃসর্ত সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা।"

ব্যক্তিগত আইন অমান্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ—"কোন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোন ব্যক্তিবিশেষকে নিজ দায়িত্বে আইন ভঙ্গ করিয়া তাহার প্রতিফল গ্রহণ করিবার উপদেশ দিবার কোন আবশ্যকতা আছে কি ?"

সকল কংগ্রেস সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়া, তাদের কাজ বন্ধ করে দেবার প্রস্তাবে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, "জনগণের ভোটে গঠিত জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই।"

কিন্তু জনগণের ওপরে গান্ধীজী। তিনি জাতির জনক। তাঁর ইচ্ছাই ইচ্ছা! ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেরি হয়নি। কারণ তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করে তোলার ভক্তের অভাব তাঁর ছিল না। জাতির আশা আকাঙ্খা, স্বপ্নের মাথায় তিনি পদাঘাত করতে দ্বিধা করেন নি। মুক্তধারাকে রুদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁর ছিলনা কিন্তু সে ধারাকে বিপথগামী করার চাতুর্যের অভাব তাঁর হয়নি। ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের পরাধীন জীবন যাপনের গ্লানির বিনিময়ে সিদ্ধ হয়েছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

একটা অস্পষ্ট গোঙানীর শব্দ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ডিউটিরতা নার্স। বারো চোদ্দটা মানুষের মধ্যে কে গোঙাচ্ছে ঠিক বুঝতে পারল না।

খাণিকক্ষণ আগে একটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মৃত দেহটা জীবন্ত মানুষগুলোর মধ্যেই কম্বল চাপা অবস্থায় পড়ে আছে।

সকালে ডোমেরা এসে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা এখানকার। বছর দেড়েক সে এই ভাবেই দেখছে। দেখতে দেখতে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো, ভয়-ভয় করতো। মনে হতো এটা ঠিক নয়। কোন মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু কে শোনে কার কথা। মৃতদেহ সরাবে কে? রাত্রিবেলা ডাক্তারদেরই প্রয়োজনে পাওয়া যায়না তো মৃতদেহ সরানো! যদিও রাতে রোগীদের দেখার জন্যে, যেমন নার্স, তেমনি ডাক্তারও আছেন, কিন্তু ওই আছেন তিনি। ডিউটি চার্ট নামটাই শোভা পায় তাঁদের, তাঁরা এসে রাতের ডিউটি দু-একঘণ্টায় শেষ করে শোবার জন্যে বাড়ি চলে যান। না গিয়েও তাঁদের উপায় নেই। কারণ সকালে প্রাইভেট চেম্বারে রোগীর ভিড় বাড়বে। নগদ পয়সার ব্যাপার। সেখানে অনিদ্রা জনিত ভুলের বশে বদনাম হবে। রোগীর ভিড় কমবে।

অবশ্য এমন ডাক্তারও আছেন, তাঁরা রাতের ডিউটিতে বাড়ি ফেরার কথা ভাবেন না। রোগীদের দেখেন। খোঁজ খবর নেন। রোগীদের সেবায় এতটুকু ক্লান্তি বোধ করেন না।

কিন্তু শুধুমাত্র ডাক্তার এবং নার্স হলেই রোগীর চিকিৎসা হয়না, চাই ওষুধ। হাসপাতালে ওষুধ নেই। এক্স রে করার প্রয়োজন থাকলেও হয়না। কারণ এক্স-রে মেসিনটা বছরের বেশির ভাগ সময়টাতে খারাপ হয়ে থাকে। তবে প্রয়োজন মেটাতে হাসপাতালের কাছেই সার সার ওষুধের দোকান আছে। বছর দেড়েক আগে সে যখন প্রথম এখানে এসেছিল, দোকানগুলো দেখে অবাক হয়েছিল। ভেবে পায়নি একই জায়গায় পাশাপাশি অতগুলো ওষুধের দোকান চলে কি করে। এক্স-রে মেসিনগুলোর খদ্দের জোটে কি? অবশ্য সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই চলার রহস্য বুঝে উঠতে কষ্ট হয়নি। দোকানগুলো শুধু চলে নয়, বেশ ভালভাবেই চলে। হাসপাতালের ওষুধের প্রয়োজন মেটায়, এক্স-রে করে দেয়।

তার জীবনের এই যে সেবাব্রত, কতকটা নিরুপায় হয়েই। বাবার অর্থ এবং তার রূপ, দুটোর কোনটাই নেই। লেখা পড়া শিখে চাকুরী করবে ভেবেছিল। চাকুরী জোঠেনি। একরকম বাধ্য হয়েই নার্সিং ট্রেনিং নিয়েছিল। চব্বিশ পরগণা জেলার এক অজ পাড়া গাঁয়ে হেল্‌থ সেণ্টারে একটা বছর কাটিয়ে এসেছে। এখানকার চেয়ে সেখানকার অবস্থা আরো শোচনীয়। শুধু নাম আছে, গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার একরকম কোন ব্যবস্থাই নেই। ওষুধ যা সেখানে যেত তা পেতনা গ্রামের মানুষ। প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল হবার উপায় ছিলনা। প্রতিকার করবে কে?

তার নিজেরও মাঝে মাঝে প্রতিবাদ জানবার ইচ্ছা হোত। রোগীদের বঞ্চিত করে সেই ওষুধ নিজেদের কাজে লাগায় যারা, তাদের ওপর ঘেন্না হোত তার। কিন্তু প্রতিবাদ করে কোন লাভ তো হবেই না বরং ক্ষতিই হবে তার, হয়তো আরো দূরে কোন অজ পাড়া গাঁয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নয়তো চাকুরীই চলে যাবে তার। চাকুরী গেলে ক্ষতিটা শুধুমাত্র তার একার নয়, বাবার মৃত্যুর পর সংসারের অনেকগুলি প্রাণীই তার ওপর নির্ভরশীল। সেই জন্যেই নীরব থাকতে বাধ্য হোত সে। নীরবে ঘেন্না করতো, যারা রোগীর সেবার জন্যে যে ওষুধ, তা দিয়ে নিজেদের উপায় বাড়ায়, তাদের।

চেষ্টা করতে লাগলো বদলী হওয়ার। অনেক ধরাধরি, চেষ্টার পর অসম্ভব সম্ভব হল। হেল্‌থ সেণ্টার থেকে মফঃস্বলের এই হাসপাতালটায় চলে এল। কেমন করে এল, একমাত্র যাঁর জন্যে এসেছে তিনিই জানেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেক ক্ষমতা, তাঁরা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। তিনি তার উপকার করেছেন। কিন্তু এখানে না এলেই বুঝি ভাল করতো সে। তার ব্যক্তিগত লাভ বড় কম নয় কিন্তু যে জন্যে তার চলে আসা তা ব্যর্থ হয়েছে। অজ পাড়াগাঁয়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রটায় চলতো চুরি, এখানে চলে সমুদ্র শোষণ। সে নার্স, তার কর্তব্য সেবা করা। তাই করে

সে। চোখের সামনে দিনের পর দিন বিনা চিকিৎসা, ভুল চিকিৎসা আর অবহেলায় মরতে দেখে মানুষকে। আর এমনি আশ্চর্য কাণ্ড, মরবে জেনেও মানুষ এখানে আসে।

একটা মানুষ গোঙাচ্ছে। বিচিত্র শব্দ। ছমছমে ভয় নিয়ে মাঝারী হল ঘরটার আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে একের পর এক নিদ্রিত রোগীদের মুখের দিকে দেখতে লাগলো সে। কার মৃত্যুর সময় এগিয়ে এল, খুঁজতে লাগলো।

খুঁজে পেল এক সময়। হলের ডানদিকের বেডের রোগীটি গোঙাচ্ছে। কদিন আগে মারামারি করে জখম হয়ে ভর্তি হয়েছে এখানে। সেদিন তারও নাইট ডিউটি ছিল। নজরে পড়েছিল মানুষটাকে নিয়ে ব্যস্ততা। ডাঃ সান্যাল সেই রাতেই কোয়ার্টার থেকে ছুটে এসেছিলেন। অপারেশন হয়েছিল। ওষুধ এবং রক্ত দুটোর কোনটারই অভাব হয়নি।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মৃত্যুর ছায়া খুঁজলো। কিন্তু না, তেমন কোন চিহ্নই খুঁজে পেল না।

তাহলে? চিন্তা করলো সে। অথচ মানুষটার মুখ দিয়ে তখনও সেই বিচিত্র শব্দের গোঙানীটা বেরুচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ডাকল। ঘুম ভাঙাতে চাইলো। ডেকে সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত দিল।

জেগে উঠলো বিনোদ। চেয়ে রইলো পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নার্সের দিকে।

—কি হয়েছে আপনার? জানতে চাইলো সে।

সদ্য ঘুম ভাঙা বিনোদ বুঝতে পারল না নার্সের প্রশ্নটা। চুপ করে নার্সের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

—কষ্ট হচ্ছে?

—কষ্ট! ভাবতে চাইলো বিনোদ। তাও তার মনে পড়ল না।

—কি হয়েছে বলুন।

—জল। সত্যিই কষ্ট করে কথাটা বলতে হল তাকে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা তার বুকে।

নার্স জল দিল। জল খেল বিনোদ। একটু সুস্থবোধ করলো জল খেয়ে।

জল খাইয়ে নার্স চলে যাচ্ছে। বিনোদ ডাকল, সিষ্টার।

দাঁড়াল সে। কাছে এসে বলল, বলুন।

— কষ্টের কথা কি যেন আপনি……

—আমার তাই মনে হয়েছিল।

—কেন?

— আপনি গোঙাচ্ছিলেন।

—গোঙাচ্ছিলাম? আশ্চর্য হল বিনোদ।

—হ্যাঁ। নার্স বলল, আপনার গোঙানীর শব্দ, ধরতে গেলে ঘরের ও মাথা থেকে শোনা যাচ্ছিল। এটা হস্‌পিটাল না হলে মনে হোত কেউ গুমরে কাঁদছে।

কথাটা শুনে চুপ করে গেল বিনোদ।

—আপনার কোন কষ্ট হচ্ছিল না? জানতে চাইলো নার্স।

মাথা নাড়ার চেষ্টা করলো বিনোদ। জানাতে চাইলো, না।

—এমন হয়কি আপনার?

চুপ করে রইলো সে।

—মাত্র রাত পৌনে দুটো, ঘুমিয়ে পড়ুন।

কথাটা বলে চলে গেল নার্স। চোখ বুজলো বিনোদ।

—বিনু, এ্যাই বিনু, কাঁদস ক্যান্?

বহুদিন মাঝরাতে নিজের ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বিনোদের ঘুম

ভাঙ্গিয়েছেন ঠাকুরদা মাধব চৌধুরী। বেলেঘাটা বস্তির চুণ বালি খসা ছোট্ট ঘরখানায় তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরটা গম গম করে উঠেছে।

—এই-এই পোলা, কাঁদস ক্যান্‌?

ঘুম ভেঙ্গে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বালক বিনোদ তেলচিটচিটে ছেঁড়া মাদুরের বিছানাটায় উঠে বসেছে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছে বুড়ো মুখ খানার দিকে।

—আরে গুয়েটা কাঁদস ক্যান্‌?

কি বলবে বিনু! কে কাঁদলো? কখন কাঁদলো? কিছুই বুঝতে পারেনি। জ্বলন্ত কুপিটার দিকে চেয়েছিল।

মাধব চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেছেন, খিদা পাইছে?

মাথা নেড়েছে বিনোদ।

—তবে কাঁদস ক্যান্‌?

সত্যই তো, খিদে না পেলে কাঁদবে কেন? বুঝতে পারেননি মাধব চৌধুরী। নাতিকে শুইয়ে নিজে শুয়েছেন। নিভিয়ে দিয়েছেন জ্বলন্ত কুপি। অন্ধকার ঘরটায় তাঁর দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

ডেকেছেন, বিনু!

—উঁ! সাড়া দিয়েছে বিনোদ।

—সত্য কথাডা বল্‌।

—কি?

—মাঝে মাঝে কাঁদস ক্যান? তর দুঃখুডা কি?

দাদুর কথাটা বুঝতে পারেনি বিনোদ। দুঃখ বোঝবার মত বয়েসও সেটা নয়। নিতান্ত বালক সে তখন। একা। যারা ছিল তারা কেউ নেই। মা ছিল, মা নেই। খেলার সাথী দিদিও। দাদু তাকে আগলে থাকে। আগলে নিয়ে বেড়ায়। একটি বৃদ্ধ—একটি বালকের জীবন।

মায়ের জন্যে বুকের মধ্যেটা গুমরে কেঁদে ওঠে তার। মায়ের

মুখখানা দিনরাত্রি চোখের সামনে ভাসে। মনে পড়ে মাকে, শেষ দেখার দিনটা। কি ঘটেছিল জানেনা। দেখেছিল মশাল-জ্বলা সে রাতটাকে। হৈ চৈ চিৎকার। তাদের বাড়িটাকে ঘিরে বহু মানুষের প্রচণ্ড কোলাহল। দুরন্ত ভয়ে দু ভাই বোন জড়িয়ে ধরেছিল মাকে। মা কিন্তু স্থির গম্ভীর। দুজনকে দুহাতে শক্ত করে ধরে বসেছিল।

বাইরে চিৎকার গণ্ডগোল বেড়েছিল। আগুন জ্বলে উঠেছিল গোয়াল বাড়ির দিকে। তাদের বন্ধ দরোজায় করাঘাত শোনা গিয়েছিল। মার নাম ধরে ডেকেছিল বাবা। দরোজা খুলেছিল মা। সামনে দাঁড়িয়ে সফিচাচা। বাবার বন্ধু। তাদের বাড়ির অন্দর মহলে সেই তাঁর প্রথম আসা।

বাবা যেন মাকে একধারে নিয়ে গিয়ে কি সব বুঝিয়েছিল। বার বার মাথা নেড়েছিল মা। কিছুতেই রাজি হয়নি বাবার কথায়।

সফিচাচা বলেছিল, অমত করবান না ভাবী। আপনাগো কোন ডর নাই।

মা হেসেছিল। হাসলে বড় সুন্দর দেখাত মাকে। হাসি মুখে মা বলেছিল, আমি যামু না। অদের দুজনকে লইয়া যাও।

সবাইকেই নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল সেদিন সফিউল্লা চৌধুরী। সঙ্গে লোক এসেছিল। নৌকা বাঁধা ছিল ঘাটে। কিন্তু সে নৌকায় শুধু একাই উঠতে পেরেছিল বিনোদ। সফিচাচার সঙ্গে তার বোনের বাড়ি এসেছিল। সেখানেই দাদুর সঙ্গে প্রায় মাসখানেক পরে মিলেছিল। চলে এসেছিল এখানে।

কিন্তু মাকে ভুলতে পারেনি। মায়ের কথা মনে পড়ে। মায়ের বিষণ্ণ সুন্দর মুখখানা বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে সেদিনগুলোকে, যে দিনগুলোয় ইংরেজের সঙ্গে লীগ আর কংগ্রেসের চলছিল গোপন কেনা বেচার খেলা।

মানুষ দেখছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। লীগ আর কংগ্রেসের হোমরা

চোমরার দলও দেখছিল তাদের সার্থকতার স্বপ্ন। সৌভাগ্যের দ্বারদেশে এসে তাদের লালসা-উন্মত্ত মন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধিমান, বিবেকবানের দল নির্বুদ্ধিতা নয়, শয়তানীর খেলায় মেতে উঠেছিল। স্বাধীনতা নয়, অভিশাপ এনে দিয়েছে তারা জাতীয় জীবনে।

মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। কংগ্রেস এনে দিয়েছে গ্লানি। অভিশাপ চাপিয়ে দিয়েছে সমগ্র জাতির মাথায়।

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় নেতাদেরই সৃষ্টি। মদত দিয়েছে ইংরেজ। লীগ পুষ্ট হয়েছে ব্রিটিশের সমর্থনে ও উৎসাহে। লীগের জন্মের পর তাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সে যেন রাস্তার ছেলে। কিন্তু যেদিন থেকে কংগ্রেস সংগ্রামের পথ গ্রহণ করলো সেদিন থেকেই তার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন কেউ-কেউ। কারণ কংগ্রেসের আন্দোলনে সহযোগীতার হস্ত প্রসারিত নয়, বিরোধীতার ভূমিকা গ্রহণ করেছে লীগ। সার্থক হয়েছে ব্রিটিশের আশা। ভবিষ্যৎ চিন্তা তার বিফল হয়নি। জন্ম-হিন্দু জিন্না হয়েছেন কট্টর হিন্দুদ্বেষী।

সুরু হয়েছে পাকিস্থানের দাবী। হিন্দু মুসলমানের আলাদা রাষ্ট্র। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একজাতি একপ্রাণ নয়, বিভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ। বেঁধেছে স্বার্থের সংঘাত। সমস্ত দেশ জুড়ে জ্বলে উঠেছে হানাহানির আগুন। সে আগুন নেভাতে গান্ধী-জিন্না স্বাক্ষরিত শান্তি আবেদন প্রচার হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে শান্তি আবেদন। কারা শান্ত হবে? রক্ত তৃষায় যাদের একবার মাতিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যাদের উৎসাহিত করা হয়েছে একসময়, তারা কি শুধু কথায় ভোলে? কারণ তারা জানে, নেতার দল শুধু গর্জাতে পারে, বর্ষণের ক্ষমতা তাদের নেই। সে গর্জন শান্তির আবেদনে, নিন্দা করার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা বলতে পারে না, মানুষে মানুষে হানাহানি শুধু অন্যায় নয়—পাপ। পাপের পথ থেকে তোমরা সরে

এসো। বন্ধ করো তোমাদের হিংসাবিত্তি। আমাদের মত অহিংস হও। সৎ হও। অসৎ পথ পরিত্যাগ করো।

পারে না তারা। কারণ সে সাধ্য তাদের নেই। বিষবৃক্ষ তারাই রোপন করেছে। নেতৃত্ব বজায় রাখতে প্রয়োজন বৃষবৃক্ষের। নেতৃত্বের পথকে কণ্টক মুক্ত করতে বড় প্রয়োজন যে সমাজবিরোধী গুণ্ডা বদমাস লুঠেরার দলকে। গুণ্ডা হয়ে কেউ পৃথিবীতে আসেনা, গুণ্ডা তৈরি করা হয়। বিপথগামীদের ঠেলে দেওয়া হয় হিংসার পথে।

স্বাধীনতা কেনা বেচার আসরে গান্ধী-জিন্না যুক্ত শান্তি আবেদন প্রচারিত হয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের দল তৈরি করেছেন ভারত ভাগের খসড়া। শুধু স্বাধীনতা হস্তান্তরের জন্যই তিনি ভারতে আসেন নি, ঘর গুছিয়ে দেওয়ার দায়িত্বভারও নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন স্বেচ্ছায়।

তাঁর পরিকল্পনা খসড়া :—

১। যদি দেশ খণ্ডন করতেই হয়, তবে দেশ খণ্ডনের দাবীর দায়িত্ব এবং দেশ খণ্ডনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পালনের দায়িত্ব মোটামুটিভাবে ভারতীয় জনসাধারণেরই দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা হবে।

২। সাধারণত, প্রদেশগুলিকে তাদের নিজের ইচ্ছানুযায়ী ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের অধিকার দেওয়া হবে।

৩। ভোট গ্রহণের উদ্দেশে বর্তমান বাংলা ও পাঞ্জাবকে, তাদের অধিবাসীদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় অনুসারে আপাতত হিন্দু প্রধান এবং মুসলমান প্রধান দুই অঞ্চলে একটা আনুমানিক সীমা রেখার দ্বারা ভাগ করে নিতে হবে।

৪। বাংলা প্রদেশ খণ্ডিত হলে আসামের মুসলিম প্রধান শ্রীহট্ট জেলাকে তার ইচ্ছানুযায়ী মুসলিম প্রদেশাঞ্চলে যোগদান করবার অথবা না করবার অধিকার এবং সুযোগ দিতে হবে।

৫। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নতুন করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা কার্যকরী করে তুলতে হলে অনেক কিছু নতুন করে ভাবতে হয় নেতাদের। কিন্তু নেতারা অধীর। দেশ খণ্ডন হলেও, অধিকার চাই। দেশ খণ্ডনের বিরোধী একমাত্র গান্ধীজী। জিন্নার দাবীর বহর দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। পণ্ডিত নেহেরু চান একটা মীমাংসা। শুধু নেহেরু নন, নেহেরু প্যাটেল অধৈর্য্য। যা পাওয়া যায় তাতেই লাভ তাঁদের। জিন্না শুধু তাঁর দাবীর বহর বাড়িয়ে চলেছেন। তাঁর নীতি, যা নেব তা বেশ ভালভাবেই আদায় করে নেব।

মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব ভারত-খণ্ডন ও ক্ষমতা হস্তান্তর। কংগ্রেসের আপত্তি ভারত খণ্ডনে। জিন্না চান ভারত খণ্ডন, প্রদেশ খণ্ডনে তাঁর আপত্তি। প্রদেশ খণ্ডনে কোন আপত্তি নেই কংগ্রেসের। কংগ্রেসের বক্তব্য, কোন প্রদেশের হিন্দু প্রধান বা মুসলমান প্রধান অংশ বিশেষকে স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করবার ব্যবস্থা পরিহার করার জন্যই কংগ্রেস প্রদেশ খণ্ডনে রাজি হয়েছেন।

অদ্ভুত সুন্দর নীতি গ্রহণ করেছিল সেদিন কংগ্রেস। জয়ী হয়েছিল কংগ্রেসের সে ইচ্ছা। ভারত ভাগ নয়, দেশ ভাগ করা হয়েছিল। যদিও দেশটা ভারত রাষ্ট্রেরই অন্তর্গত। এবং ব্রিটেনের গভর্ণমেন্ট বিরোধী রাজনৈতিক দল, দেশ খণ্ডনের প্রস্তাবের পক্ষেই সমর্থন জানিয়েছিল।

দেশ খণ্ডনের ফলে পাঞ্জাব এবং বাংলার হল অঙ্গচ্ছেদ। উদ্বাস্তু আগমণ সুরু হল দুই প্রদেশ থেকে। আজ পাঞ্জাব থেকে উদ্বাস্তু আসা বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে লোক বিনিময় হয়েছে, সম্পত্তি বিনিময় হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দিয়েছে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের। কিন্তু বাংলার উদ্বাস্তুরা পেয়েছে ঋণ। সুষ্ঠ পুনর্বাসনের

কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি কংগ্রেস সরকার। আজও বন্ধ হয়নি উদ্বাস্তু আগমণ। পাকিস্তানের জঙ্গী শাসনের অত্যাচারে বাঙ্গালী আজও সর্বস্ব খুইয়ে চলে আসছে। আসছে অধিকার হারা হয়ে। যেখানে আসছে সেখানেও পাচ্ছে না অধিকার। স্বাধীনতার তেইশ বছর পরেও উদ্বাস্তু শিবিরের বাঙ্গালীদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত নয়। যে ভারতীয় সংবিধানে নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি, ভোটদানের অধিকার ঘোষিত, সেখানে বঞ্চিত বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা।

কিন্তু কেন? কেন বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের অধিকার হারা করে রাখা হয়েছে? কোন উদ্দেশে?

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস।

স্বাধীনতা আসন্ন। দেশ বিভাগের করাল ছায়া নেমে আসছে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে। ভ্রাতৃহত্যার রক্তে মানুষের হাত রাঙা। দুর্গতদের আর্তনাদে বাংলার আকাশ বাতাস মথিত। নোয়াখালিতে দাঙ্গা বন্ধ করতে ছুটে গেছেন গান্ধীজী।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেদিন, বাংলাদেশকে কি রাজনীতির দাবা খেলায় বোড়-রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে না?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, না, বাংলাদেশ আজ পুরোভাগে, কেননা বাংলা যে বাংলাই। এ হল সেই বাংলা, যা রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের জন্ম দিয়েছে। এখানেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীরেরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আমার চোখে তাঁদের কাজ যতই ভুল পথে পরিচালিত মনে হোক না কেন, আপনাদের এটি বুঝে নিতে হবে। বাংলাদেশ যদি ঠিক পথে চলে তবে সারা ভারতের সমস্যার সমাধান সে করে দেবে। আর তাই আমি নিজেকে একজন বাঙ্গালী করে দিয়েছি।

বাঙ্গালী সম্বন্ধে গান্ধীজীর চিন্তা তাঁর উত্তরসাধকদের মনে কি এতটুকু রেখাপাত করেছে কোনদিন?

বাংলা শোষণ কি আজও বন্ধ হয়েছে?

ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস। ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন মর্যাদা লাভ করবে। সেদিন কংগ্রেসী নেতাদের বুঝিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। অবশ্য তিনি সেদিন নেতা কংগ্রেসীদের বোঝাতে পেরেছিলেন, বৃটেনের কোন মন্দ মতলব নেই, শুধুমাত্র রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আছেন, সেই দায়িত্ব ভার সাফল্যের সঙ্গে উপযুক্ত হাতে অর্পণ করার জন্যেই যথাযোগ্য ব্যবস্থা হিসাবে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। শুধুমাত্র বন্ধুত্বের মালা-বন্ধন বজায় রাখা।

৩রা জুন (১৯৪৭) দেশ খণ্ডনের দলিল দেখতে পেলেন নেতারা। সে দলিলের সৃষ্টিকর্তা মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু দেশ খণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিনামকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন তাঁরা। দায়িত্ব বোধের ইঙ্গিত পেয়েই বেসামাল হয়ে পড়লেন। অথচ স্বাধীনতা তাঁদের চাই, সে স্বাধীনতা পেতে দেশ খণ্ডনেও তাঁরা বিনা দ্বিধায় প্রস্তুত কিন্তু পরিনামের কথা কেউ স্মরণ করিয়ে দিতেই আঁতকে উঠেছিলেন।

তবু সেদিন জিন্না বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন, পাকিস্থানে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোন পার্থক্য না করাই তাঁর ইচ্ছা। পাকিস্থানে যারা বাস করবে, ধর্ম বিশ্বাস নির্বিশেষে তারা সকলেই পাকিস্থানে পূর্ণ নাগরিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত অধিবাসীর মর্যাদা লাভ করবে।

কিন্তু সেদিন নেতার দল নিজেদের মর্যাদা রাখতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। যদিও লীগ নেতারা কোন ব্যাপারে আলোচনায় সম্মত হওয়ার আগে মুসলিম জনগণের দোহাই পেড়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতাদের মুখে জনগণের নামোল্লেখ খুব কমই শোনা গেছে। কোন বিষয়ে ভাওতা দেওয়ার আগেও তাঁরা জনগণের নাম নেননি।

তাঁরা দেশভাগ, স্বাধীনতা হস্তান্তর সবই নিজেদের ইচ্ছায় এবং দায়িত্বে গ্রহণ করেছিলেন।

দায়িত্ব পালন করেছেন কি?

দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা?

কেনা বেচার হাটে চোদ্দ আনায় রাজি হয়েছেন। দু আনার ইচ্ছা যে জনগণ, সেটুকু মনে হয়নি তাঁদের। পাঞ্জাবের ব্যবস্থা পরিষদ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদেশ খণ্ডনের ইচ্ছা ঘোষণা করেছিলেন ২৩শে জুন ১৯৪৭।

কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেস চল্লিশ বছর আগে তীব্র প্রতিরোধের আন্দোলন সৃষ্টি করে 'বঙ্গভঙ্গ' রোধ করেছিল। আবার চল্লিশ বছর পরে কার্জন নীতিতেই 'বঙ্গভঙ্গে'র ব্যবস্থা পুরো করলো। স্বতন্ত্রভাবে অখণ্ড বঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন সুরাবর্দী কিন্তু লীগ আর কংগ্রেসের বিমুখতায় সে চেষ্টা তাঁর সফল হল না।

সুরাবর্দীর সে চেষ্টা যদি সফল হোত। যদি লীগ, কংগ্রেস এবং ইংরেজের বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিত বাংলার মানুষ! তাহলে হয়তো আজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠতো না পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গকে বেঁচে থাকতে হোত না দিন যাপনের গ্লানি বহন করে।

সেদিনের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছে আজ দুই বাংলা। কবে যে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে কেউ জানে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ না হলে বাঁচার অধিকার পাবে না বাঙ্গালী।

দেশ বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন নেতারা। কিন্তু দায়িত্ব বোধ সম্পর্কে সচেতনতার কোন পরিচয়ই সেদিন পরিলক্ষিত হয়নি তাঁদের মধ্যে।

এরই মধ্যে লণ্ডন থেকে রয়টার সংবাদ প্রচার করলো, "আগামী মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মাত্র ত্রিশ মিনিটের এক উদাত্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষকে ডোমিনিয়ন

ষ্টেটাস দান করবেন। দু'টি নতুন নেশনের স্রষ্টা এই বিল অক্ষরে অক্ষরে দীর্ঘ পার্চমেন্টের উপর উৎকীর্ণ করবেন। রঙিন রাজকীয় প্রতীকে এবং স্বর্ণসূত্রে শোভিত অতি সুদৃশ্য এক পেটিকা হাতে তুলে নিয়ে এই পার্চমেন্টপত্র পার্লামেন্টের দুই সভার সদস্যদের সম্মুখে পাঠ করা হবে।"

সংবাদটা বেরিয়েছিল ২৩ শে জুন সোমবারের সংবাদ পত্রে। বৃটিশ স্বাধীনতা দান করছে ভারতবাসীকে। দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ সব মিথ্যা। মিথ্যা গান্ধীজীর অনশন, আইন অমান্য।

সেদিনই সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভার ভাষণে গান্ধীজী বললেন, "আজকের সংবাদপত্রগুলিতে দেখলাম, লণ্ডনে এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সেদিনও যে ভারতবাসী এক নেশন ছিল, তাদের দুই নেশনে ভাগ করার ঘটনায় লণ্ডন খুশি কিন্তু এতবড় একটা দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে আহ্লাদে মত্ত হবার মত কিছু আছে কি? আমরা এই বিশ্বাসই আমাদের মনের মধ্যে ধরে রেখেছি যে, পরস্পরের শত্রু হবার জন্য নয়, বন্ধু হবার জন্যই আমরা পৃথক হতে চলেছি, এক পরিবারের দুই ভ্রাতা যেমন করে পৃথক হয়। সংবাদ পত্রের কথা যদি সত্য হয় তবে বুঝতে হবে যে ব্রিটিশ আমাদের ভাগ করে দুটি নেশন করতে চলেছেন এবং সে কাজটা বেশ ঘটা করে ঢাক ঢোল বাজিয়েই করবার ব্যবস্থা করেছেন। চলে যাবার আগে ব্রিটিশ এই ভাবেই কি তার শেষ আঘাত হেনে যাবেন?

অদ্ভুত সুন্দর ছিল সেদিন প্রার্থনা সভার গান্ধী ভাষণ। তিনি কি সেদিন দুঃখ পেয়েছিলেন? মর্মাহত হয়েছিলেন ব্রিটিশের আঘাতে? তাঁর নীতি, চরিত্র পরিবর্তন কি তবে ব্যর্থ হয়েছিল? নিষ্ফল

হয়েছিল তাঁর আজীবনের সাধনা? মিথ্যা প্রমাণীত হয়েছিল তাঁর অহিংসাবাদ?

ব্রিটিশের উৎসব ঘোষণায়, তাঁর আক্ষেপোক্তিতে কি প্রমাণীত হয়?

তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

তিনি ভুল করেছেন।

তাঁর অন্ধত্ব, অহংবোধ, গোঁড়ামী, জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছে সাম্রজ্যবাদের রক্ত লোলুপতার কাছে গান্ধী নীতি শুধু মাত্র অচল নয়, অসার মৃত প্রায়—মৃত সন্তান কোলে ক্রন্দন রতা জনীনর মত।

কোনটা ঠিক? গান্ধী নীতির মূল সত্য কোনটা?

গান্ধী নীতি শান্তিবাদ অহিংসা ও নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নীতিহীনতার পরিচয় কি তিনি নিজেই শুধু মাত্র আপন খেয়াল চরিতার্থতার জন্য বার বার দেন নি? জাতির মুক্তির সংগ্রামকে বিপথে চালিত করেন নি?

ইংরেজ ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেয় নি, স্বায়ত্ব শাসন দান করে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের থাবা সরিয়ে নিয়েছে আপন মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে। সমগ্র জাতির 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' দাবীকে লীগ আর কংগ্রেস শুধুমাত্র গোষ্টী স্বার্থের যুপকাষ্ঠে বলি দিতে দ্বিধা করে নি সেদিন।

লীগের অন্তরালে ছিল উগ্রধর্মীয় গোঁড়ামী। সমাজ সংসার ভাগ্যের হাতে বার বার মার খাওয়া একটা মানুষের প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থতার দুর্বার আকাঙ্খা। রাজনীতির মূল মন্ত্র ছিল ধর্মান্ধতা। শয়তান ইংরেজের তল্পীবাহকের ভূমিকা নিতে এতটুকু বাধেনি সেদিন লীগের। লীগের স্বপ্ন ছিল আলাদা রাষ্ট্র। যদিও সে দাবীর দাবীদারের দল উগ্র মস্তিষ্কের কিছু তরুণ। খেয়ালের খেলায় মেতেছিলেন তাঁরা। পরিনামের কথা চিন্তা করেন নি। ভাবেন নি সাধারণ মানুষের কথা, যে মানুষের দল বিত্ত নয়, নিম্বতার প্রতিমূর্তি। ক্ষুদ্র আশা, ছোট্ট

স্বপ্ন। যারা বাঁচতে চায়। ছোট্ট শান্ত সুখী একটা সংসার যাদের কামনার ধন, অন্তরের প্রার্থনা। তারা অতি সরল সহজ বঞ্চিত মানুষের দল। কঠিন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে যারা প্রতিদিন ক্ষত বিক্ষত।

শাসন করেছে শাসক। শাসন করেছে সমাজ। ছিনিয়ে নিয়েছে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল। পরিশ্রমের ফসলে হয়েছে অধিকার হারা। প্রতিবাদ জানায় নি। মেনে নিয়েছে ভাগ্যকে। ফিরে চেয়েছে অতীতের দিকে। একই চিত্র। ভরসা খোদা। তাঁর কাছে গুণাহের শাস্তিভোগ। তাঁর দোয়া কামনা ভিন্ন মুক্তির পথ নেই।

কে বললে নেই, আছে।

কোথায় সে পথ? চমকে উঠেছে তারা। শুনে ভয় পেয়েছে। এ সত্যি নয়—এ সত্যি হতে পারে না। হলেই বা ওরা হিন্দু, আমরা মুসলমান, আমরা তো একই অবস্থার মধ্যে রয়েছি। একই পথে চলছি। একই আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বঞ্চিত হবো জেনেও ফসল ফলাচ্ছি। না খেতে পেয়ে কুঁকড়ে মরছি। মৃত্যু-শোকে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছি দোষী ওরা নয়, দোষী ভাগ্য-বানের দল, আর যত অনিষ্টের মূলে ওই বিদেশী দস্যুরা। ওরাই তো আমাদের সোনার সংসার ছারখার করেছে। আমাদের চিরকালের অভাবকে রিক্ততার চরম সীমায় নামিয়ে নিয়ে গেছে।

আমাদের দুর্গতির মূলে হিন্দু নয়, ওই বিদেশী বেনিয়া ইংরেজ।

ছিঃ ছিঃ, একি বলছো তোমরা। এ সত্যি নয়, মিথ্যে। বিলকুল ঝুট। তোরা সব মুখ্যু হাঁদার দল। কোন জ্ঞান নেই তোদের, তাই একথা বলছিস। ইংরেজ আমাদের শত্রু নয়, বন্ধু। দুশমন ওই কাফের হিন্দুর দল। এ কথা কুরানে লেখা আছে, বুঝলি? পড়লে তো বুঝতে পারবি। যা বলছি শোন্। হিন্দু কোনদিন মুসলমানের বন্ধু ছিলনা, বন্ধু হবেও না। কারণ ওরা ভাবে হিন্দু-স্থানের একমাত্র অধিকারী আমরা। হিন্দুস্থানের মালিক হিন্দুরা।

সাম্প্রদায়িকতার বিষ সঞ্চারিত হয় সরল নিষ্পাপ মানুষের মনে। তবু দ্বিধা যায় না। মন্দ ভাবতে বুক কাঁপে। মুখ ঘুরিয়ে নেয় মুখোমুখি হতে। সূত্রপাত হয় ভুল বোঝাবুঝির। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শকুনের ক্ষুধা নিয়ে ওৎ পেতে থাকে। ইন্ধন যোগায়। সূত্রপাত করে গুণ্ডারা। নেতাদের আজ্ঞাবাহী যারা। যাদের ধর্ম আদেশ পালন। ন্যায় অন্যায়ের ধার ধারে না। বুঝে নেয় পরিশ্রমের মূল্য।

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে জন্ম, লীগ পায় তার পায়ের তলায় মাটি। অন্তরালে ইংরেজ শাসকের দল বাহবা দেয়, বাঃ, বহুৎ আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই—আমরা আছি।

নিশ্চই আছে ইংরেজ। থাকবে বলেই তার সমুদ্র পার হয়ে আসা। চলে যাবার জন্যে সে আসেনি। সে চায় থাকতে। সে থাকবে।

তবু লীগের মধ্যে কিছু মানুষ যে মানুষের অধিকারবোধ ফিরে পেতে চাননি তা নয়—চেয়েছেন। কিন্তু সে চাওয়া তাঁদের সফল হয়নি। একক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের।

আর কংগ্রেস?

জন্মের পর থেকেই কংগ্রেসের একলা চলার নীতি। অন্যকে উপেক্ষার মনোভাব তার মজ্জায় মজ্জায়। হিন্দুত্বের দম্ভ অহঙ্কারও বড় কম নয়। তার পরিচয় উদারতায়। যে আসবে এসো, মান-ভঞ্জনের কারবার আমাদের দিয়ে হবে না।

কিন্তু উদার নৈতিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরও অভাব ছিলনা কংগ্রেসে। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামী অনেক মানুষই ধর্মের মোহমুক্ত ছিলেন। ধর্ম নয়, কর্ম এবং মানুষই ছিল তাঁদের আত্মার আত্মীয়। অহং বোধকে তাঁরা মুছে ফেলেছিলেন আপন জীবন থেকে। কারণ তাঁরা ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করেন নি। আত্মপ্রত্যয় ও শক্তি-হীনতা, আত্মকলহ, ভেদাভেদ জ্ঞান, বিভেদ প্রবণতা, সঙ্ঘহীনতাই

ভারতবাসীর পতনের মুখ্য হেতু। তাঁরা মানুষের উদ্দেশে ডাক দিয়েছিলেন। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। মানব সত্বার মহত্বের প্রদীপ্ত সেই ঘোষণা :

"শুনহ মানুষ ভাই :
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

নিপীড়িত অবহেলিত মানবাত্মা জেগে উঠেছিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিল অত্যাচারীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বুকের উষ্ণ শোণিতে সিক্ত করতে দ্বিধা বোধ করেনি, মাটির বুক, তার পরিচয় তো মিথ্যা নয়।

তাদের একলা পথের চলার গতি অত্যাচারীর আঘাতে হয়তো কিছুদিনের জন্যে স্তব্ধ হয়েছিল কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। আপোষহীন সংগ্রাম তাদের ব্যর্থ হয়নি। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আবার তা জেগে উঠেছিল। 'কুইট ইণ্ডিয়ার' ডাকে আবার গর্জে উঠেছিল তাদেরই কণ্ঠস্বর। ইংরেজকে ভারত ছাড়া করতে চেয়েছিল তারা।

ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেছে কিন্তু ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে পারানির কড়ি সে কম নিয়ে যায় নি। অর্থ মূল্যে নয়, প্রাণের মূল্যে। সে মূল্য তাদের হাতে তুলে দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নি জাতীয় নেতার দল। মানুষের সেবা যাদের ধর্ম।

কিন্তু ইংরেজ কি সত্য সত্যই ভারত ছেড়ে গেছে ?

তার স্মৃতি চিহ্ন কি মুছে গেছে চিরতরে ?

যায়নি। যাবেও না কোন দিন।

ইংরেজ গেছে। কিন্তু কোথায় গেল সে ? কি করে গেল ?

ইংরেজ যায়নি। গেছে ইংরেজ নামের মানুষগুলো। কিন্তু তার শাসন, সংস্কার, শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থা সবই তো রয়েছে। রয়েছে তার আদর্শ। ইংরেজের আদর্শকে মোছা যায়নি, মুছে ফেলার কোন চেষ্টাও করা হয়নি। পরিবর্তন হয়নি দৃষ্টিভঙ্গির। ভারতীয়

সমাজকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, ভারতীয় ধারায় পরিবর্তনের কোন চেষ্টাই হয়নি আজ পর্যন্ত। কারণ ইংরেজ যে আমাদের প্রভু ছিল। প্রভুর মহিমাকে লুপ্ত করা মহাপাপ।

আজও সেই ইংরেজের দম্ভ অহঙ্কারের প্রকাশ। প্রভুত্বের সম্পর্ক। মালিক শ্রমিককে ভাবে ক্রিতদাস। উর্দ্ধতন কর্মচারী তার উচ্চপদের অহঙ্কারে নিম্নপদস্থ কর্মচারীর ওপর জানায় অন্যায় আদেশ। আপন দুর্নীতির কথা চিন্তা না করে নিম্নপদস্থের সামান্য ত্রুটির কৈফিয়ৎ চায়। ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়। চিন্তা করে না, যোগ্যতাবলে উচ্চপদের অধিকারী হলেও নিজেও একজন কর্মচারী।

ব্যাপক হারে চলেছে স্বজন পোষণ। সেখানে যোগ্য অযোগ্যের প্রশ্ন নেই। শুধুমাত্র আত্মজনের রক্ষাকবচই যথেষ্ট।

কিন্তু কেন? কেন এমন হল? এর জন্যে দায়ী কে?

দায়ী আমরা। আমাদের অন্ধত্ব চরম পতনের কারণ। আমাদের বিশ্বাস ভুলের চোরাবালিতে ঠেলে দিয়েছে। আমরা তলিয়ে যাচ্ছি। চিৎকার করছি। হাত পা ছুঁড়ছি। কিন্তু সত্যকারের বাঁচার চেষ্টা আমরা করছি না। সে চেষ্টার পথ রুদ্ধ। আমরা বিভেদ প্রবণতার ব্যাধিতে ভুগছি। আত্মকলহে পথ ভুল করছি। বাঁচার পথকে মুক্ত করতে পারছি না।

আমাদের সঙ্গে, ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেদিনকার নেতারা—কংগ্রেস।

মুক্তি সে ছিনিয়ে আনেনি, লাভ করেনি—দান হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

কংগ্রেসের নীতি সেদিন গান্ধীবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। গান্ধী নীতির ধারক বাহক সেদিন কংগ্রেসী নেতারা। যে নীতি রাজনীতির জন্যে, রাজনীতি নয়—ধর্ম সহায়। ধর্ম ভিত্তিক গান্ধীনীতি অনুসরণে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন সেদিন নেতারা। লীগের উগ্র ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, লালসা চরিতার্থতার জন্য দেশখণ্ডন মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু কাদের স্বার্থে ?

ভারতবর্ষের মুক্তিকামী মানুষের কথা কি সেদিন ভেবেছিলেন তাঁরা ? মানুষের চাওয়া-পাওয়ার খোঁজ নিয়েছিলেন ?

না নেননি। নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কারণ…

সুভাষচন্দ্র বসুর বিতাড়ন পর্ব শেষ হবার লগ্ন ভালভাবে উদযাপীত হওয়ার পর থেকে কংগ্রেসের লক্ষ্য পরিবর্তিত হতে খুব বেশি দেরি হয়নি। জাতীয় স্বাধীনতার মঞ্চ থেকে কংগ্রেস ধনিক শ্রেণীর পার্টিতে পরিণত হয়েছিল পুরোপুরি। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে তাড়াবার কম চেষ্টা করেনি বণিক সম্প্রদায়। সদা ভয়ে ভয়ে দিন কেটেছে তাদের। কংগ্রেসের মত শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্ব যদি উদার বামপন্থীদের হাতে চলে যায় তাহলে বণিক সম্প্রদায়ের দুর্গতির শেষ থাকবে না। কংগ্রেসের ভারত ত্যাগের অনিবার্য মুহূর্তে আহার নিদ্রা ভুলে গিয়েছিল তারা। ইংরেজ বণিকদের স্থলাভিসিক্ত হওয়ার আকাঙ্খা তাদের মনে মরিচিকার সৃষ্টি করেছিল। প্রাণ যাবে— তৃষ্ণা মিটবে না।

স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়েছিল বিভিষণের জন্যে। কংগ্রেসের মধ্যে সে সময় বিভিষণের অভাব ছিলনা। কংগ্রেসকে রক্ষণশীল প্রতিক্রীয়াশীল নেতৃত্বের হাতে বেঁধে রাখবার জন্যে কংগ্রেস সেবী হয়ে দেদার টাকা ঢালতে লাগলো তারা। কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্বের একটা শক্তিশালী গোষ্ঠী দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের বেতনভুক গোলামে পরিণত হয়েছিল। তাদেরই চক্রান্তে চরমপন্থী বলে পরিচিত সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত।

অপরাধ ?

অপরাধ বৈকি, আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের আহ্বান জানানো অপরাধ নয় ? মহা অপরাধে অপরাধী সুভাষচন্দ্রের দল। অতএব কংগ্রেসে থাকার অধিকার হারিয়েছেন তাঁরা।

কারণ আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হলে যে জঙ্গী পরিস্থিতির উদ্ভব হোত তাতে প্রতিক্রীয়াশীল নেতৃত্বের উচ্ছেদ হোত। বণিক সম্প্রদায় চায় আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তর। বামপন্থীদের বিতাড়ন পর্ব শেষ হতে কংগ্রেস হল বণিক সম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ। সর্দার প্যাটেল এবং সদবা পাতিল হলেন বণিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্র।

ভারতবর্ষে প্রথম অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল। অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ। সুরু হল আসল খেলা। কংগ্রেস ভারতের জাতীয়তাবাদী দল নয়, কংগ্রেস (বিশেষত হিন্দু) বণিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য বাজেট তৈরি করলেন তিনি। বজ্রাহত হল বণিক সম্প্রদায়। রে-রে করে উঠলো কংগ্রেস। বিরোধের চরম মুহূর্তে বণিক সম্প্রদায়ের পরামর্শে দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত নিল নেতারা। সর্দার প্যাটেলের সাফ জবাব, মুসলিম লীগের সঙ্গে আর একদিনও নয়।

কিন্তু কেন?

ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায়। গান্ধীজীর তীব্র বিরোধীতা কোথায় তলিয়ে গেল। তলিয়ে গেল মানুষের মুক্তির স্বপ্ন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হল কলঙ্কিত।

ভারত বিভাগের প্রাক্কালে লণ্ডনের ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা তাঁদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন: "ভারতে দুটি ডোমিনিয়ন স্থাপন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। যদি দুটি ডোমিনিয়ন স্থাপন সম্ভবপর হয়, তবে একটি ডোমিনিয়ন স্থাপন সম্ভবপর হবেনা কেন? সোজা কথায় বলা যায়, যাঁরা এই উদ্যোগে নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের যদি যথোপযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিভার অভাব না হতো, তবে ভারতকে সহজেই ব্রিটিশ-নৃপতির প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের সম্পর্কে আবদ্ধ একটি ডোমিনিয়নে পরিণত করা সম্ভবপর হতো।"

ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্যে মাউন্টব্যাটেনের সমগ্র প্রচেষ্টার নিন্দা করে বলা হয়েছিল, এটা একটা 'রাজনৈতিক নীলাম' মাত্র।

ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডএর সম্পাদক সেদিন এতটুকু মিথ্যা বলেননি। সত্য সত্যই নীলাম হয়েছিল সেদিন। নীলামদারের ভূমিকা নিয়েছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। নীলামে সওদা করেছিল মুসলিম লীগ আর ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের হয়ে কংগ্রেস। রয়টারের সংবাদের প্রতিবাদে অথবা অভিমানে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীর ভাষণ ছিল সেদিন ধোঁকায় ভরা।

কংগ্রেস অথবা মুসলিম লীগ সেদিন কি দেশ খণ্ডনের অভিশাপ এড়াতে পারতো না? হিন্দু মুসলমানের একত্র বাস কি অসম্ভব ছিল? যদি সত্য সত্যই অসম্ভব ছিল তাহলে ভারতীয় মুসলমানরা আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির তেইশ বছর পরেও কি করে ভারতবর্ষে বাস করছেন?

তাকি হিন্দুদের দয়ায়, না আপন অধিকার বোধের ভিত্তিতে?

সেদিন বণিক সম্প্রদায় চেয়েছিল দেশ খণ্ডন, নেতারা দেশ খণ্ডন করেছেন। মানুষ স্বাধীনতা প্রত্যাশী হলেও কংগ্রেস চেয়েছিল ভিক্ষা, আশা পূরণ হয়েছে তার।

আর সেই ভিক্ষানুষ্ঠান?

১৫ ই আগষ্ট শুক্রবার ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ।

দামামা ধ্বনি বেজে উঠলো সকাল সাড়ে আটটায়। লাল সোনালী মখমলের উর্দিতে ভূষিত বাডি গার্ডের দল স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনকে নিয়ে এল দরবার কক্ষে। সুরু হল শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান। বর্ণ বহুল শোভায় ঝলসে উঠল

দরবার কক্ষ। শেষ হল শপথ গ্রহণ। মাউন্টব্যাটেন হলেন শাসন মুক্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। বিপুল তাঁর দায়ভার। গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্য ব্যক্তিকেই কংগ্রেস দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিল। সে দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে ইংরেজ চরিত্রের মহত্বের পরিচয় স্থাপন করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি মাউন্টব্যাটেন। নাবালক নেতাদের পূর্ণ সাবালকত্বের আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। পালন করেছিলেন তাঁর দায়িত্ব।

সুরু হয়েছিল কাউন্সিল হাউসের অনুষ্ঠান। বাইরে লক্ষ লোকের উল্লাস ধ্বনি। বিভিন্ন দেশের অভিনন্দন বাণী। জনতার চিৎকার —জয়হিন্দ। উঠলো জাতীয় পতাকা। তোপধ্বনি হল একত্রিশ বার। জনতা চিৎকার করে উঠলো, 'পণ্ডিত মাউন্টব্যাটেন কি জয়।'

কাউন্সিল হাউসের পর রোশেনারা বাগ। প্রখর রোদে অপেক্ষমান কয়েক হাজার ছোট ছোট স্কুলের ছেলেমেয়ে। তাদের হাতে-হাতে মিঠাই বিতরণ করলেন স্বাধীন ভারতের গভর্ণর জেনারেল। বেজে উঠলো সাপুড়ের হাতে বাঁশি। খেলতে লাগলো বিষধর সাপ। ভয়ে নীল কচি-কাচার দল। সাপুড়ে মুচকি হেসে কামড়ে ধরলো সাপের মাথা। বিষ দাঁত ভাঙ্গা সাপকে ভয় কি?

রোশেনারা বাগের পর প্রিন্সেস পার্কে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান। পতাকা দণ্ডকে ঘিরে কয়েক লক্ষ জনতা হর্ষ-উল্লাসে আনন্দে চঞ্চল। আকাশে উড়লো স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। দেবতার আশীর্ব্বাদের মত ঝির ঝির করে ঝরে পড়লো এক ঝলক হালকা বৃষ্টি। আকাশ জুড়ে ফুটে উঠলো রামধনু, মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল জাতীয় পতাকার শ্বেত সবুজ আর গাঢ় গৈরিকের সঙ্গে।

১৬ই আগষ্ট শনিবার।

মেঘ মুক্ত আকাশ। আলো ঝলমলে সুন্দর উজ্জ্বল একটি সকাল।

মুঘল শাসনের স্মৃতি বিজড়িত লাল কেল্লার শীর্ষে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস পতাকা উড়ছে। পাঁচ লক্ষ মানুষের বিপুল জনতা প্লাবন সৃষ্টি করেছে পুরানো দিল্লীর পথে পথে। সেই ঐতিহাসিক সমাবেশে পণ্ডিত নেহেরু তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ দিলেন। আশা আকাঙ্খা উদ্দীপনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরলো। কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি, নেহেরুজীর ঐতিহাসিক ঘোষণা, সর্বহারা মানুষের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে তুললো। বাঁচার অধিকারে অধিকারী স্বাধীন ভারতের মানুষ। দূর হবে দুঃখ দারিদ্র। থাকবে না অনাহারের দুঃসহ যন্ত্রণা, থাকবে না মাথা গোঁজার জন্য একটু আশ্রয় সন্ধান। লাল কেল্লার পাশে পাশে নোংরা ঘিঞ্জি বস্তির জটলার পরিবর্তে গড়ে উঠবে সৌধ, না হলেও সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার মত আশ্রয়স্থল।

কিন্তু আজ, স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ তেইশ বছর পরেও পুরানো দিল্লী ঠিক তেমনি আছে। আছে সে বস্তির জটলা। নোংরা দুর্গন্ধ আর হতাশায় ম্লান নিরন্ন মানুষের দল। যারা সেদিন, সেই তেইশ বছর আগে পণ্ডিত নেহেরুর ঐতিহাসিক ভাষণ শুনেছিল, আশা আনন্দ স্বপ্ন সম্ভাবনায় বুক কেঁপে উঠেছিল যাদের, আজ তারা ভাবে, স্বপ্ন দেখেছিল তারা, স্বপ্ন সত্যের রূপ নেয়নি—স্বপ্ন স্বপ্নই আছে, আগামী দিনের দিকে চোখ তুলে।

সেদিন যারা শত সহস্র লক্ষ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছিল, 'পণ্ডিত নেহেরুজী কি জয়'—আজ স্বাধীনতার দীর্ঘ তেইশ বছর পরে নিজের মনে অস্বীকার করে নিজের কাছেই জবাবদিহি করে, আমি জয় দিই নি। আমি জানতাম নেহেরুজী সেদিন হাততালির লোভে, মনের আবেগে, মুখে যা এসেছিল বলে গিয়েছিলেন। অন্তরের সত্য কথা প্রকাশ করেন নি।

কিন্তু সত্যই সেদিন শতসহস্র লক্ষ কণ্ঠ জয়ধ্বনি করেছিল পণ্ডিত নেহেরুর। সার্থক হয়েছিল সেদিনের লালকেল্লার আনন্দানুষ্ঠান।

অথচ সে সময়, স্বাধীনতা গ্রহণের আনন্দ মুহূর্তে পাঞ্জাব আর বাংলায় চলছিল ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি। পাঞ্জাবে শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে রূপ নিয়েছিল প্রহসনে। পঞ্চনদীর উন্মত্ত কিছু মানুষ আইন তুলে নিয়েছিল নিজেদের হাতে। সেখানকার কিছু কিছু জননেতা হানাহানি বন্ধ করার পরিবর্তে হানাহানিতেই উৎসাহিত করছিল মানুষকে।

বাঁটোয়ারার ঘোষণা পত্র হাতে পেয়ে নেতার দল ক্ষুব্ধ বিস্মিত। কিন্তু লীগ অথবা কংগ্রেস, কোন পক্ষই অস্বীকার করতে পারল না ইংরেজের প্রদেশ খণ্ডন। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী অসন্তুষ্ট। লৌহ মানব সর্দার প্যাটেল ক্রুদ্ধ। শিখ প্রতিনিধি বলদেব সিং নির্বাক। সকলের মনে একটি প্রশ্ন, একি হোল! ভুল করেছেন তাঁরা। কিন্তু সর্তহীন প্রতিশ্রুতি পালনে তাঁরা বাধ্য। ইংরেজের বাঁটোয়ারা যেমনই হোকনা কেন, তাঁরা মেনে নেবেন। অভিভাবকের বিচার মাথা পেতে গ্রহণ করবেন তাঁরা।

ইংরেজ সন্তুষ্ট। বাঁটোয়ারায় দুপক্ষই সমান অসন্তুষ্ট। অতএব সুবিচার করেছেন র‍্যাডক্লিফ। অখণ্ড ভারতকে খণ্ড দুই অংশে ভাগ করেছে তাঁরই বুদ্ধিমত্তা।

ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান, প্রদেশে প্রদেশে কোথাও আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে, কোথাও বা বুকের রক্ত ঝরা অন্তিম আর্তনাদের মধ্যে যখন পালিত হয়েছে তখন গান্ধীজী উপবাসে দিন কাটিয়েছেন। কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাঁর কাছে আনন্দের নয়, বেদনার···তাও হয়তো নয়, গান্ধী-দর্শনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কোন পর্যায়ে পড়ে তা হয়তো তিনি নিজেও উপলব্ধি করতে পারেন নি। খণ্ড ভারতের স্বাধীনতা প্রথমে তাঁর কাম্য ছিলনা, অবশেষে কোন্ যাদুমন্ত্র বলে স্বাধীনতার স্বপক্ষে তিনি মত দিলেন আজও তা অজ্ঞাত। তিনি কি বাধ্য হয়েছিলেন স্বাধীনতার স্বপক্ষে মত দিতে? না, নেতারা তাঁকে বাধ্য করিয়েছিলেন? অথবা তাঁর মতামতের কোন মূল্যই সেদিন ছিলনা নেতাদের কাছে?

কোন্‌টা সত্য ?

গান্ধী-সত্যের অন্তরালে কোন্‌ অসত্য তার পাপের ছায়া বিস্তার করেছিল ? কোন্‌ ক্ষুদ্রস্বার্থ তাঁকে বিচ্যুত করেছিল সর্বত্যাগের মহিমা থেকে ? গান্ধী-আদর্শ বিসর্জিত হতে দেরী হল না কাদের হস্তক্ষেপে ?

সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষে নতুন নয়। আপন স্বার্থ রক্ষায় একদল মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিষে সমাজকে বিভক্ত করে আপন স্বার্থসিদ্ধি করে গেছে বহুদিন। মানুষকে মানুষের শত্রু করে তুলেছে তারা। হিংসার মন্ত্র দিয়েছে মানুষের কানে। পাকা করেছে নিজেদের আসন। গরীবের রক্তে গড়ে তুলেছে সৌভাগ্যের সৌধ।

গান্ধীবাদ ধর্ম নির্ভর। রাজনীতি আর ধর্মকে এক করে ফেলেছেন গান্ধীজী। ফলে কুফল দেখা দিতে দেরি হয় নি। ধর্মান্ধতার মধ্যে জন্ম হয়েছে মুসলিম লীগের। ধর্ম প্রশ্নে বিভেদ দেখা দিয়েছে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে। হিন্দু মুসলমান। মুক্তি চরম লক্ষ্য নয়, সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন বিষবৃক্ষকে মহীরুহ করে তুলেছে। গান্ধীবাদ হানাহানির পথে পরিচালিত করেছে মানুষকে। মুসলমান সম্প্রদায় দূরে সরে গেছে ক্রমশঃ।

কিন্তু কেন ? কাদের জন্যে সরে গেছে ? এর জন্যে দায়ী কে ?

কংগ্রেস। গান্ধীবাদী কংগ্রেস। তার লোভী স্বার্থপর দালাল নেতার দল। সুভাষচন্দ্রের বিতাড়নের পর ভ্রষ্ট-নীতি কংগ্রেস জনগণের স্বার্থে নয়, গোষ্ঠীস্বার্থে পরিচালিত হয়েছে। মেনে নিয়েছে দেশভাগের স্বাধীনতা। মানুষকে করেছে প্রতারিত।

ধর্ম মানুষের কম মূল্যবান সম্পদ নয় কিন্তু ধর্মটাই তো সব নয়। ধর্মের সংকীর্ণতার মাঝে কর্মের বৃহত্তর প্রচেষ্টা তো ব্যর্থ হতে পারেনা। তবু কেন ব্যর্থ হল ?

কেন অখণ্ডতা বজায় রইলো না ভারতবর্ষের ? মানুষের আত্মার কামনা মুক্তি—সে মুক্তি এলনা কেন ?

কেন? কেন? কেন?

কারা এর জন্যে দায়ী? মুসলিম লীগ? জিন্না? গান্ধী? কংগ্রেস? নেহেরু?

কে???

দায়ী সংকীর্ণতা। অপরিনামদর্শিতা। লোভ।

লালসা উন্মত্ত কিছু মানুষের পাপের বোঝা চাপানো হয়েছিল সেদিন চল্লিশ কোটি মানুষের মাথায়। জননেতার দল সেদিন আপন আপন স্বার্থরক্ষায় কলঙ্কের পসরা চাপিয়ে দিয়েছিল মানুষের মাথায়। ব্যর্থ করেছিল, বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা থেকে। তাই সুদীর্ঘ একশত আশী বছরের পীড়নের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দে উৎসবে আত্মহারা হয়ে উঠতে পারেনি। ক্ষুদ্র স্বার্থ সংকীর্ণতার দুরারোগ্য ব্যাধিতে জ্ঞানশূন্য হয়ে ভাই বসিয়েছে ভাইয়ের বুকে ছুরি। পুত্রের সামনে মা হয়েছে ধর্ষিতা। বোনের কুমারী ধর্ম কলঙ্কিত করতে একটুকু দ্বিধাবোধ করেনি তার ভাই। চরম পশুত্বের প্রকাশ ঘটেছে মানব ইতিহাসে।

এই হানাহানি, স্বার্থ সংকীর্ণতার দ্বন্দ্ব, ধর্মান্ধতার উগ্রপ্রকাশ, সাম্প্রদায়ীকতা কি রোধ করা যেত না? রোধ করা যেত না কি মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, নারকীয় তাণ্ডব লীলা?

মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। ইতিহাসের শিক্ষা। মন নয়, মতের অমিল। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, মিটতে দেরি হয়না মনের দ্বন্দ্ব। অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে তখনই যখন ঘুচে যায় ব্যবধানের প্রাচীর। থাকেনা লোভের কণামাত্র।

স্বাধীনতাই যদি চরম লক্ষ্য হোত, আন্দোলন যদি সঠিক পথে পরিচালিত হোত, যদি ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি মানুষের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলা হোত:

'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন
কাণ্ডারী। বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

যদি

ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত একনাম—
চট্টগ্রাম : বীর চট্টগ্রাম।
বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎ প্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন।
চট্টগ্রাম : বীর চট্টগ্রাম।
এখনো নিস্তব্ধ তুমি
তাই আজো পাশবিকতার
দুঃসহ মহড়া চলে,
তাই আজো শত্রুরা সাহসী।
জানি আমি তোমার হৃদয়ে
অজস্র ঔদার্য আছে, জানি আছে সুস্থ শালীনতা
জানি তুমি আঘাতে আঘাতে
এখনও স্তিমিত নও, জানি তুমি এখনো উদাস—
হে চট্টগ্রাম।

তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে
সহস্র কাজের ফাঁকে মনে পড়ে শার্দুলের ঘুম
অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর।
হে অভুক্ত ক্ষুধিত শ্বাপদ—
তোমার উদ্যত থাবা সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর
এখনো হয়নি নিরাপদ
দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—
যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ
তোমার সংকল্প স্রোতে ভেসে যাবে লোহার গারদ

এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম।
আমার হৃদপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম ॥

আর ছেচল্লিশের সেই :

বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
শুনেছ? শুনেছ উদ্দাম কলরব?
নয়া ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত;
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি।
তাইতো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ। বিপ্লব চারিদিকে।

সব ব্যর্থ। ব্যর্থ করে দিল অসহ্য লালসার আগুন। সংকীর্ণ রাজনীতির কেনা বেচায় মুক্তি থেকে বঞ্চিত হল মানুষ। সুরু হল ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি। স্বার্থের ভাগাভাগিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ হল নিরাশ্রয়, পথের ভিখারী। নিজেদের ভুল তখন বুঝতে পেরেছে তারা। তাই হিন্দু আর মুসলমান বলে আলাদা পরিচয় তাদের মুছে গেছে। তারা বুঝেছে কাদের ষড়যন্ত্রে তারা সর্বহারা। উদ্বাস্তু হয়ে চলেছে অনিশ্চিত আশ্রয় সন্ধানে। নত মুখ, নীরব

কণ্ঠ, দুই চোখে শুষ্ক অশ্রুধারা। তারা সুবিধায় পাওয়া স্বাধীনতার বলি।

আর তথাকথিত সেই নেতার দল? ভারতের ভাগ্য-বিধাতা, আকাঙ্খা যাঁদের আকাশ স্পর্শী। ইংরেজের হীন চক্রান্তের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতীয় বণিক-গোষ্ঠীর স্বার্থে যাঁরা শাসকের নিশ্চিত আরাম লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁরা উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা। অধিকার-চ্যুত মানুষের বিদ্রোহের আশঙ্কায় জরুরী বার্তা পাঠিয়ে টেলিফোন করে সিমলার স্বাস্থ্য নিবাস থেকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনকে। পরিকল্পনাহীন দায়িত্ব গ্রহণকারীর দল চরম দৈন্যের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। করুণ কণ্ঠে মিনতি জানিয়ে বলেছিলেন, জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে যে ব্যবস্থা করতে হবে, সে ব্যবস্থা উদ্ভাবনের, প্রয়োগের এবং পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব মাউন্টব্যাটেনের। তাঁদের তিনি রক্ষা করুন, বাঁচান। নাহলে ক্ষুধিত সর্বহারা মানুষের বিদ্রোহে তাঁদের অতি সাধের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে যাবে। রাজধানী দিল্লীর নিরাপত্তা একান্ত প্রয়োজন।

আর বাংলা?

বাংলা বহুদূরে। বাংলা থেকে রাজধানী দিল্লীর দূরত্ব বড় কম নয়। বাংলার আর্তনাদ হাহাকার দিল্লীর কানে পৌঁছবার সম্ভাবনা কম। বাংলায় যতই চিৎকার চেঁচামেচি চলুক না কেন দিল্লীর তক্তে তাউসে সে ধ্বনি পৌঁছাবে না। তাই পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা আজ আর উদ্বাস্তু নয়। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা আজ সুষ্ঠু পুনর্বাসন পেয়েছে। সমস্ত সমস্যা যে তাদের মিটে গেছে তা হয়তো নয় কিন্তু দিল্লীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় মোটামুটিভাবে শান্ত করা হয়েছে তাদের। সরকারী সাহায্যের অকৃপণ ধারা দেবতার আশীর্বাদের মতই তাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে।

বাংলার উদ্বাস্তু-সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে দেখলে হয়তো নেই বলেই

মনে হয়, সরকারী অর্থসাহায্যও তাদের করা হয়েছে, কিন্তু তা কতটুকু? স্বাধীন ভারতে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা পেল অর্থসাহায্য আর বাঙালী উদ্বাস্তুরা পেল ঋণ—কেন?

কেন এই বিসদৃশ আচরণ?

কোন্ অপরাধে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ তেইশ বছর পরেও ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত? কেন বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে? কোন্ স্বার্থহানীর আশঙ্কায়?

ভোরের আলো ফুটছে। পাখিরা ডাকছে। ধীরে ধীরে ম্লান হচ্ছে রাতের অন্ধকার। বন্ধ জানালার শার্সি ভেদ করে বাইরে দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিয়েছে বিনোদ। নির্নিমেষ চেয়ে আছে সে। দেখছে। কি দেখছে?

স্বপ্ন! অতীত আজ স্বপ্ন। অপরিণত বুদ্ধি বালকের মনে স্মৃতি, শুধু বেদনার। মাঝে মাঝে সুখের অনুরণন। ঘষা কাঁচের জানালায় বৃষ্টি ভেজা সূর্যের হঠাৎ আলোর ঝলকানি। মায়ের সুন্দর কালো চোখের গভীর দৃষ্টিভরা মুখ। চাপা নাকে সাপের মাথার মণির মতো মুক্তা বসানো নাকছাবি। দু হাতে সাদা দুধের মত শাঁখা। বর্ষার দিনে দিনরাত্রি টিনের চালে টুপুর টাপুর বৃষ্টির ফোঁটা। গাঙের জলে থৈ-থৈ উঠোন। দাদুর বাড়ি-মাথায়-করা হৈ-হৈ চিৎকার। অজস্র বকুনি মাকে। মায়ের নীরব মুচকি হাসি। মুণ্ডলি নামের ছাগল ছানাটাকে ঘরে নিয়ে আসার উদ্দাম বায়না ছোট্ট ছেলেটার। বিরক্ত মায়ের শাসনে। কান্না; বুড়ো মানুষটার ছুটে যাওয়া গোয়াল ঘরে। মায়ের প্রতিবাদ। দাদুর চিৎকার।

কত সুন্দর সে সব দিনগুলো। কত শান্তি, তৃপ্তি। বড় হয়ে কত শুনেছে দাদুর কাছে। বেলেঘাটার নোংরা বস্তির ছোট্ট ঘর খানায় মাধব চৌধুরী তাঁর জীবন যুদ্ধের কত অলিখিত কাহিনী দিনের পর দিন শুনিয়ে গেছেন। বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের বিদ্যালয়ের পড়ুয়া মাধব চৌধুরী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমান সকলেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পৃথক করার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। বহুভাবে চেষ্টা চলেছিল কিন্তু শয়তানদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। সফল হয়নি অশ্বিনী দত্তের জন্যে। কারণ অশ্বিনী দত্তের পরিচয়, তিনি শুধু মানুষ ছিলেন না, বন্ধু ছিলেন মানুষের। মানুষের প্রতি তাঁর সেই স্নেহ মমতা ভালবাসা মানুষকে মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে আলাদা করতে পারে নি।

দাদু বলতেন, জানিস বিনু স্বদেশী করা ছেড়ে একদিন সংসার আর গঞ্জের চালাঘরে গুড়ের আড়তদার হতে বাধ্য হয়েছিলুম। বাবার হঠাৎ মৃত্যু, মাকে দেখাশোনার কেউ নেই, ছোট্ট গুড়ের আড়ত আর দু এক বিঘে জমি। আর কিছুই ছিলনা। আমি নিজে কিছু বলিনি। আমি ফিরে যেতে চাইনি ঘরের বাঁধনে অন্য ছেলেদের মুখে শুনে আমাকে ফিরে যেতে হয়েছিল সংসারে থেকে সকলের সেবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

নেতা আমি কম দেখিনি বিনু। জীবনে কত ভাবে কত নেতাকে দেখেছি। শুনেছি তাঁদের কথা। কত সহজভাবে সত্য কথা তাঁরা বলেছেন। বলেছেন, এটা করতে হবে, করা উচিৎ। দেখেছি তাঁদের কাজ। কাজের সময় কর্মী আর নেতায় কোন তফাৎ নেই। কে কর্মী, কে নেতা, মিলে-মিশে একাকার। কচুরি পানা ভেসে আসছে নদীতে। মাঠে ছোট ছোট ধানের চারা। একবার যদি ঢুকে পড়ে, ধানের চারাগুলোকে শেষ করে দেবে হাজিয়ে পচিয়ে। খাঁড়িতে-খাঁড়িতে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। গ্রামের মানুষ নেতা, কর্মী বর্ষার

জলে ভিজে কাজ করেন, যতক্ষণ না কাজ শেষ হয়। কাজের সময় সবাই এক।

দাছু বলতেন, নামে শুধু নেতা হলেই হলনা বিন্নু। কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যোগ্যতা। কথায় ও কাজে হতে হবে এক। মানুষের আত্মার আত্মীয় হতে হবে নেতাকে। যারা তা পারেনা তারা কাজের নয়, নামের নেতা। সেই নেতাদেরই ভয় বেশি, তারা দেশ আর দশের সর্বনাশ করতে এতটুকু দ্বিধা করে না। তারা সুযোগ সন্ধানী, মতলববাজ। কথার ফুলঝুরিতে মানুষের মন ভোলাতে তারা ওস্তাদ। যা তারা পারবে না, যা তাদের সাধ্যের বাইরে তাও অবলীলায় বলে যায়। মানুষকে ঠকায়, ঠকিয়ে আনন্দ পায়। হিসাব কষে নিজে কি পেল। কত লাভ হোল।

ছুঃখ করতেন দাছু। আক্ষেপের অন্ত ছিলনা। নিজের মনেই আক্ষেপ করে বলতেন, বিন্নু, আমরা স্বাধীন হয়েছি রে। কি মূল্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছি জানিস, বুকের রক্ত নয়, মনুষ্যত্ব বিকিয়ে। বঙ্গভঙ্গে বাঙালী গর্জে উঠেছিল। সারা ভারতবর্ষ কণ্ঠ মিলিয়েছিল সে গর্জনে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গে, পাঞ্জাব ছুভাগ করায় ছু একটি কণ্ঠ ছাড়া তো কেউ প্রতিবাদ জানালো না। আমরা কি করে আমাদের দৃষ্টিশক্তি হারালাম বিন্নু? কেন আমরা বুঝেও বুঝলুম না, এ আমাদের সেই অন্তরের অন্তঃস্থলের তিল তিল করে গড়ে ওঠা স্বরাজ নয়, বেদনার দান।

বিন্নু, আমরা কেন মেনে নিলুম এ স্বাধীনতা? মানুষের ধর্মটাই কি একমাত্র সত্য, মানুষের কি মূল্য নেই? হিন্দু মুসলমানের স্বরাজের স্বপ্ন কি, এই স্বরাজ? বল্ বিন্নু, উত্তর দে।

বিনোদ উত্তর দেয়নি। উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিলনা তার পক্ষে। উত্তর সে জানতো না।

একটা কিশোর স্বরাজ-পাগল বৃদ্ধের মুখের দিকে শুধু চেয়ে থাকতো। চোখের সামনে স্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠতো ছুঃস্বপ্নের

অতীতটা। মুসলমান হিন্দুর শত্রু। মুসলমানের হাতে নিধন যজ্ঞ সুরু হয়েছিল খণ্ড বাংলার ওপারে। খোদার নাম নিয়ে পশুর মত বিভৎস চিৎকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ও বাংলার মানুষ।

মানুষ ?

না, মানুষ নয়। মানুষের অন্তরালে হিংস্র লোভাতুর কিছু উন্মত্ত পশু কেড়ে নিয়েছিল মায়ের ধর্ম, বোনের ইজ্জত : ভাইয়ের বুকে বসিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা।

প্রাণের ধর্মে এগিয়ে এসেছিল মানুষ। ধর্ম সেখানে তুচ্ছ, মনুষ্যত্বের নির্মলতায়, পঙ্কিলতার আবর্তে জ্বালিয়েছিল সত্যের দীপ-শিখা। মা বাবা বোন তারই চোখের সামনে নিহত হয়েছে। কিন্তু তাকে নিরাপত্তায় পৌঁছে দিয়েছে একটি মানুষ' ধর্ম সে মানুষটির পথরোধে ব্যর্থ হয়েছে। হেরে গেছে ধর্ম। জয়ী হয়েছে মানবতা।

পৌঁছেছে স্বাধীনতার আলো পাওয়া একটা ভিন্ন ভূখণ্ডে। অবাক দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছে সর্বহারা মানুষের সমুদ্র। শুনেছে সন্তান-হারা, স্বামীহারা কতশত নারীর আর্তক্রন্দন। চোখে পড়েছে অবহেলার কত দৃশ্য।

শুধু অবাক হয়েছে। অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছে।

হাত ধরে টেনেছিল দাদু। বলেছেন, চল্

বেরিয়ে পড়েছে তারা। দু একদিন পথে পথে ভিখারীর মত ঘোরাফেরা। একদিন পরিচিত মুখ দেখতে পেয়ে ছুটে গেছেন দাদু। হাত ধরে টেনেছেন।

— চুপ চুপ। চিনতে পেরে মুখে আঙুল চাপা দিয়েছেন তিনি।

—কেন কেন, ভয়টা কি ?

—আমি এখন মহাদেব। মহাদেব রায়।

—কও কি! অবাক হয়ে দাদু বলেছেন, তুমি হলে গিয়া……

—আপনার পায়ে পড়ি। কাঁদ কাঁদ তিনি। বাঁচান আপনি।

—তোমাকে মারছেভা কে ?

—যারা আপনাদের মেরেছে। সেই শয়তানের দলই। মরার ভয়ে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছি। বাঁচি যদি তো পথেই বাঁচবো।

—তোমার বাড়ি-ঘর ? মা বাবা ?

—সব শেষ। উঠেছি এক বন্ধুর বাড়ি, কারখানায় আমি তার ওপর-ওলা ছিলুম, এখন সে আমার। তার বন্ধুরাও জানে আমার পরিচয়। সে হয়তো আমাকে রাখতে সাহসী হোত না, স্থান দিয়েছেন তাঁর মা।

—কও কি ?

—শুনে গল্প বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যি।

—তাহলে রাস্তায় ঘোর ক্যান্ ?

—সন্দেহ এড়াতে। শেয়ালদা ষ্টেশনে খুঁজতে আসি আমার আত্মীয়দের।

—তোমার মামাদের ?

—কাউকে নয়। একটু ভেবে হেসে বলেছিলেন, চলুন।

—কোথায় ? অবাক হয়েছিলেন দাদু।

—আমার বন্ধুর ওখানে। আপনাদের নিয়ে যাব।

দাদুর কোন আপত্তি টেঁকেনি। জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আশ্রয় মিলেছিল। কিছু দিন পরে দাঙ্গা একটু থামতে ও-বাংলায় চলে গিয়েছিলেন তিনি। যাবার আগে তাঁর যা ছিল সব দিয়ে গিয়েছিলেন।

বেলেঘাটার সেই বস্তি বাড়ির ছোট্ট ঘরখানায় জীবনের ষোলটা বছর কেটেছে তার। দাদু মারা গেছেন তার আঠারো বছর বয়েসে। একটি বৃদ্ধ পাগলের জীবন শেষ হয়েছে বিনা চিকিৎসায়। অনেক কষ্টে লেখাপড়া শেষ করেছে। কারখানার শ্রমিক, নিরক্ষর অধীর দত্ত অনেক সাহায্য করেছে তাকে। পথের সন্ধান দিয়েছে। একদিন কর্মরত অবস্থায় বয়লারের আগুনে ঝলসে শেষ হয়ে গেছেমানুষটার জীবন।

মামীমা অধীর দত্তের মৃত্যুর পর দু বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মেসে আশ্রয় নিয়েছে সে।

কষ্ট জীবনে কম করেনি। সাহায্য অনেকেরই পেয়েছে। কিন্তু···

— জেগে আছেন নাকি? ও বিনোদ বাবু!

পাশের বেডের বৃদ্ধ ভদ্রলোক ডাকছেন। বিনোদ সাড়া দিল, বলুন।

কখন উঠলেন?

ঘাড়টা ফিরিয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলো সে। বলল, আমার ওঠার প্রশ্ন নেই।

বিব্রত হলেন তিনি। বললেন, কিছু মনে করবেন না। আমি বলতে চেয়েছি, কখন ঘুম ভাঙলো আপনার?

—ভোর বেলা। তখন সূর্য ওঠে নি।

উত্তরটা শুনে তিনি একটু চুপ করে রইলেন। কি যেন চিন্তা করলেন একটু। বললেন, কাল থেকে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলুম।

—বেশতো, বলুন না।

—আচ্ছা আপনি তো মাষ্টারী করেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা······

তিনি 'আচ্ছা' বলে চুপ করতে বিনোদ তাঁর মুখের দিকে তাকাল। বলল, বলুন।

—থাক গে।

কেন যে তিনি 'থাকগে' বললেন একটু পরেই বোঝা গেল তা। রাতের ডিউটিরতা নার্স'টি এগিয়ে এল। হেসে জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছেন?

—ভাল। হাসল বিনোদ।

টেম্পারেচার নিল নার্স। ওষুধ খাওয়াল। জিজ্ঞাসা করলো, চা খাবেন নাকি ?

—যদি দেন।

—দেখি, কি দিয়েছেন ডাক্তারবাবু।

বিনোদ বলল, দেখুন।

নার্সটি চলে যেতে ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, মেয়েটি ভদ্র ঘরের, বুঝলেন বিনোদবাবু। বড় সুন্দর ব্যবহার।

—কেউ অভদ্র ব্যবহার করেছে নাকি আপনার সঙ্গে ? জানতে চাইলো বিনোদ।

—করেনি আবার। যেন ফুঁসে উঠলেন ভদ্রলোক। আমি গ্যাষ্টিকের রোগী। এর আগে দু-দুবার অপারেশন হয়ে গেছে আমার। এবার নিয়ে তিনবার হবে।

— বলেন কি ? আঁতকে ওঠে বিনোদ।

—তবে আর বলছি কি। ছাপ্পান্ন বছরের জীবনটায় গোটা আষ্টেক হাসপাতালে বিভিন্ন সময় বেড নিয়েছি। বদলীর চাকুরী। নার্সদের দুর্ব্যবহারের তুলনা হয়না। আর আমার একটা ছেলে নার্সের জন্যেই মরেছে।

—কিঁ করে ?

—সাপে কামড়েছিল। হাসপাতালে দিলুম। হয়তো বেঁচে যেত, বাঁচলো না।

—কেন ?

—বিষের জ্বালায় জল তেষ্টা পায়। গলা বুক শুকিয়ে ওঠে। একটু জলের জন্যে ছটফট করে কিন্তু এক ফোঁটাও জল দেওয়া হয়না। দ্বিতীয় দিন থেকে ডাব দেয় দু-তিনটে। জল চাইলে অল্প পরিমাণ ডাবের জল দেওয়া হয় গলা ভেজাবার জন্যে। বিকেলে কামড়ালো, সন্ধ্যেবেলা ভর্তি করলাম হাসপাতালে। রাতে বেডের পাশে চলে যাওয়া রোগীর কুঁজো ভর্তি জল টেনে নিয়ে খেল। অন্য রোগীদের

চিৎকারে নার্স কিন্তু ছুটে এল না। এলো প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে। কোথায় গিয়েছিল সেই জানে! তারপর অবশ্য বাঁচাবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু……

ভদ্রলোক চুপ করলেন। চুপ করে রইলো বিনোদ। কি বলবে সে?

অভিযোগটা কি মিথ্যা? চিন্তা করলো সে। ভদ্রলোক মিথ্যা দোষারোপ করছেন?

কিন্তু তাই বা কি করে হয়? এই তো কিছুদিন আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের কেলেঙ্কারী নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। অন্যায় এবং পাপ কখনো চাপা থাকে না চিরকাল। স্বাস্থ্য দপ্তরের অবাধ পাপের খেলাও চিরদিন চাপা থাকে নি।

সেখানেও সেই আমলাতন্ত্রের খেলা। বড় বড় আমলার দলই সেখানকার একচ্ছত্র অধিপতি। দুর্নীতির ছত্রছায়ায় ঢেকে আছে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র; হয়তো গোটা ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিও

সেবা মানুষের জীবনের বড় ধর্ম। অনেক বড় বড় ডাক্তার আছেন, যাঁরা তাদের শিক্ষা, যোগ্যতার মূল্যস্বরূপ টাকার অঙ্কে মানুষের চিকিৎসা করেন কিন্তু মানুষের সেবা তাঁরা করেন না। তাঁরা মানুষের সেবক নন, ধনের সেবক। রোগ, অর্থ দেখে আসে না। কিন্তু ডাক্তার দেখেন অর্থ। ডাক্তারের অর্থের চাহিদা মেটাতে সাধারণ মানুষ যেখানে অক্ষম সেখানে মৃত্যু ভিন্ন গতি কোথায়?

অথচ এই সমস্ত নামী দামী ডাক্তাররা সমাজে প্রতিপত্তিশালী সম্মানীয়। অসংখ্য ডিগ্রীর মহিমায়, আভিজাত্যে তাঁরা সমাজের যোগ্য পুরুষ, সেবকের মহিমায় মহিমান্বিত।

কালো-বাজারী ব্যবসাদার আর এই সব গুণী ডাক্তার—এঁরা সমাজসেবক! এঁদের আদর্শ, মানুষের সেবা। সেবার আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়েই এঁরা জীবনের লক্ষ্য পথে এগিয়ে যান!

অভিজ্ঞতা যে হয়নি তা নয়। বেলেঘাটার জীবনে এক বন্ধুর সঙ্গে এঁদের চেম্বারে একবার গিয়েছিল বিনোদ। দুরারোগ্য ব্যাধিতে বহুদিন যাবৎ ভুগছিলেন বন্ধুর বাবা। অনেকদিনের ইচ্ছা তাঁর, নামকরা ডাক্তারকে একবার দেখান। বিশেষজ্ঞ তিনি। তাঁকে দেখালে হয়তো তাঁর রোগ যন্ত্রণা উপশমের ব্যবস্থা হবে। তিনি হয়তো আরোগ্যলাভ করবেন।

বন্ধুর সঙ্গে বিখ্যাত ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েছিল বিনোদ। ডাক্তারবাবু তখনো নামেন নি। ডানলোপিলো গদীতে মোড়া অপেক্ষাগারে লোকজন বড় কম ছিল না। সুন্দরভাবে সাজানো ঘরখানার একধারে সাজানো টেবিল চেয়ারে লিক্‌লিকে রোগা এক বুড়ো ভদ্রলোক ফাইল পত্রের আড়াল থেকে ইসারায় কাছে ডেকেছিলেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে জানতে চেয়েছিলেন, কি চাই?

বলেছিল বন্ধু।

ভদ্রলোক খাতাপত্র উল্টে জানিয়েছিলেন, দিন ছয়েক পরে দুটো সিট খালি হবে।

—সিট? অবাক হয়েছিল বন্ধু।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, সিট। এ ঘরে পনেরোটা সিট আছে। পাশের ঘরে ছ'টা। মোট একুশটা। বাদবাকী সব সঙ্গে এসেছেন। যেমন আপনারা দুজন এসেছেন।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিল, একটু আগে ব্যবস্থা হয়না?

ভদ্রলোক রেগে উত্তর দিয়েছিলেন, দেখুন না খাতা। আমি কি মিথ্যা বলছি?

অপ্রস্তুত হয়েছিল বন্ধু। বলেছিল, না-না, আমি সে কথা বলছি না। বড় কষ্ট পাচ্ছেন কিনা সেইজন্যেই বলছিলাম।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে হয় আপনার?

—আমার বাবা।

—হুঁ, বলে আবার কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়েছিলেন ভদ্রলোক। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, খুব কষ্ট পাচ্ছেন?

আশান্বিত হয়েছিল বন্ধু। বলেছিল, দিন রাত্রি ছটফট করছেন।

ভদ্রলোক যেন খুব বিপদে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, দেখুন, যেভাবে রোগীর কথা বললেন তাতে আমার মনে হয় আজ দেখিয়ে দিতে পারলেই ভাল হয়। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। দুটো দিন অপেক্ষা করতেই হবে। আগামী পরশু চেষ্টা করে দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করিয়ে দিলেও দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য ডাক্তারবাবু রাজী হবেন কিনা বলতে পারছি না।

বন্ধু প্রায় হাত জোড় করে বলেছিল, দয়া করে একটু দেখুন না। বড় উপকার হয় তাহলে।

—আচ্ছা ঠিক আছে, তাই করা যাবে। আগামী কাল এসে ইতিহাসটা লিখিয়ে যাবেন।

—ইতিহাস?

—হ্যাঁ। রোগ আর রুগীর হিষ্ট্রী। সিট নম্বর দিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেব আমি। তিনি অবসর সময়ে পড়ে রাখবেন।

—বেশ, কালই এসে আমি জানিয়ে যাব।

—হ্যাঁ। আর শুনুন, মোষ্ট আর্জেন্ট কেশ বলে কিছু বেশি লাগবে।

—কত লাগবে?

—দেখবার ফি ছিয়ানব্বুই, ইতিহাসের জন্যে পনেরো, আর আর্জেন্ট কেশে চল্লিশ টাকা নেওয়া নিয়ম, আপনি পাঁচ টাকা কম দেবেন।

—এঁ্যা! চমকে উঠেছিল বন্ধু। হয়তো টাল খেয়ে পড়ে যেত। ভদ্রলোক বলেছিলেন, কি হল আপনার?

বন্ধু হেসেছিল। বলেছিল, টাকাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছেনা?

—এক্সট্রা যেটা? না ওটা ঠিকই আছে।

সেই তিক্ত হাসি মুখেই বলেছিল বন্ধু, ঘুস টুস একটু বেশি নেওয়াই ভাল। পনেরো টাকার ইতিহাস সস্তাই বলতে হবে। ডাক্তার বাবুরটাই যা একটু আক্রা।

রাগে ভদ্রলোকের মুখে কথা সরেনি। কঠিন দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়েছিলেন।

বন্ধু বলেছিল, চলি দাদু। আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করার জন্যে ক্ষমা করবেন।

ভদ্রলোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিল। ডেকেছিলেন, শুনুন।

ভালমানুষের মত বন্ধু বলেছিল, আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ আপনাকেই বলছি। আপনার বাপের তো অনেক দিনের অসুখ ?

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ। সরল কণ্ঠে বলেছিল বন্ধু।

ভদ্রলোকের হাড় বার করা মুখমণ্ডল অমায়িক হাসিতে ভরে গিয়েছিল। বলেছিলেন, এককাজ করুন না, বাংলা দেশে তো ঠাকুর দেবতার অভাব নেই। একটা মাদুলী টাদুলী ঝুলিয়ে দিন না নিয়ে এসে।

—সেখানেও বাজার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাদুলীর দাম বেড়ে গেছে। এখন আর পাঁচ পয়সা বা শোয়া পাঁচ আনার কারবার নেই। দেবদেবীরা নয়া পয়সার হিসাব শিখে গেছেন। ভরের মুখে, দিব্যি বলে দেন, একুশ টাকা সাঁইত্রিশ পয়সা লাগবে।

—তাহলে কোন গণৎকার কে.........

আঁতকে উঠেছিল বন্ধু। বলেছিল, দাদু আপনি নিশ্চই পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়েন না, তাই একথা বলছেন। পড়লে দেখতে পেতেন, সেখানকার কবচের মূল্য কি লেখা আছে, ছোট বড় সাধারণ স্পেসাল। ভাগ্য জানবেন ? একটি প্রশ্ন পনেরো টাকা। সারা জীবনের গনণার জন্য সাড়ে তিন শত টাকা মাত্র। সেও সাধারণের জন্যে নয়।

—তাহলে ডাক্তার কি সাধারণের জন্যে ?

—আমার তাই বিশ্বাস ছিল।

—বড় রোগের ডাক্তারকে বেশি টাকাই দিতে হয়। আপনার বাবার রোগটাকে ছোট করলে, ছোট ডাক্তার পাঁচ টাকাতেই সারিয়ে দিত।

—রোগ যে বলে আসেনা দাদু।

কথাটা বলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল বন্ধু। বলেছিল, জানিস বিনোদ, এইসব ডাক্তারগুলো শালা মানুষ নয়।

—দেবতা। সেই প্রথম কথা বলেছিল সে।

অত রাগেও তার কথা শুনে না হেসে পারেনি বন্ধু। আক্ষেপের সুরে বলেছিল, না-না ইয়ারকি নয়। আমরা কোথায় আছি বলতো? যত দিন যাচ্ছে, যেমন সব জটিল রোগ দেখা দিচ্ছে তেমনি সে রোগকে সারিয়ে তোলার চিকিৎসকও তৈরী হচ্ছেন। কিন্তু সাধ্যের বাইরে চিকিৎসা। কেন না, অর্থ নেই। যাদের অর্থ আছে তাদের চিকিৎসা হবে, যাদের নেই, তারা···অনেকক্ষণ চুপ করে পাশাপাশি হেঁটেছিল বন্ধু। এক সময় বলেছিল, জানিস, গরীবের বাঁচার অধিকার নেই। ছিলনা, হয়তো···········

গরীবও বাঁচতে চায়। বাঁচার আকাঙ্খা নিয়ে নিরুপায় হয়ে ছুটে যায় হাসপাতালে। জনস্বাস্থ্য রক্ষা, জনগণের চিকিৎসার জন্যই স্বাস্থ্য-কেন্দ্র। ছোট বড়, ধনী নির্ধনীর প্রশ্ন অবান্তর। সেখানে সকলের সমান অধিকার। সমান সুযোগ সুবিধা কামনা করে। কিন্তু পায় কি?

পায় না। সবই চেনা-জানার খেলা। প্রতিপত্তির প্রবেশপত্র। মরণাপন্না রোগীকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। আসন্ন-প্রসবা

স্থান পায় না। অবহেলা, বিনা চিকিৎসায় দিনের পর দিন মৃত্যুর দিন গোণে মানুষ।

কেন, কেন এই অবহেলা, অনাদর? মানুষের সেবাই যাঁদের ধর্ম, কেন তাঁরা দুর্ব্যবহার করেন মানুষের সঙ্গে? মানুষ হয়ে মানুষের জীবন নিয়ে কি করে তাঁরা ছিনিমিনি খেলেন?

সেই আমলাতন্ত্র। দুর্নীতি যাঁদের অস্থি-মজ্জা-রক্তে মিশে গেছে। মানুষের সেবা নয়, স্বার্থ খেলায় মেতে থাকেন তাঁরা। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয় এঁদের চক্রান্তে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মধ্যমণির দল রোগীর সেবার অর্থে আপন আপন সম্পদ বাড়ায়। চলে ভুরিভোজ, ওড়ে মনের ফোয়ারা, আর সেই সঙ্গে……

নষ্ট দুষ্টের দল আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান। খেয়াল-খুশির অন্ত নেই তাঁদের। ভারতবর্ষকে তাঁদের লক্ষ্যপথে পরিচালনা করার দায়িত্বভার এঁদের ওপরই ন্যস্ত।

এই তো কিছুদিন আগে এম. ডি পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্ব, আত্মীয় পোষণ, প্রভাব প্রতিপত্তির অবাধ প্রয়োগের অভিযোগ করে কয়েকজন এম. ডি পরীক্ষার্থী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে প্রতিবাদ পত্র পেশ করেছিলেন। ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের উচ্চপদস্থ কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দিয়ে তাঁদের অভিযোগ সমূহ তদন্ত করার দাবী জানিয়েছিলেন।

অবশ্য অভিযোগ অথবা তদন্তের দাবী জানানো এই প্রথম নয়। দিনের পর দিন অভিযোগ করেছেন ছাত্ররা। দাবী জানিয়েছেন তদন্তের। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের অভিযোগের বিন্দুমাত্র মূল্য দেননি।

এম. ডি পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অযোগ্যকে যোগ্যতরের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। মানুষের বাঁচা মরার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় এদের হাতে।

টাকার খেলা। অর্থই সব। অকৃপণ হাতে অর্থ ব্যয় করার পর

হবু ডাক্তার রীতিমত ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে এসে, কেউ শ্বশুরের কৃপায় অথবা পিতৃদেবের পয়সায় ব্যবসায়ের আড়ৎ সাজিয়ে জোর ব্যবসা চালায়। এক বছর দু বছর তিন বছরের মধ্যে বাড়ি গাড়ি ইত্যাদিতে জীবন পরিপূর্ণ করে তোলে। আবার কেউ কেউ আর্তজনের সেবায় স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলিতে যোগদান করেন। ভুল চিকিৎসা, সাধ্যমত দুর্ব্যবহারে মানবসেবার মহত্বে পূর্ণ হয়ে ওঠেন।

যাঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতি, চুরি জোচ্চুরি, মুনাফা-বাজির খেলা বন্ধ করার জন্যে এগিয়ে যান, রোগীদের ঔষধ পথ্য থেকে বঞ্চিত করার প্রতিকার চান তাঁরাই অযোগ্য এবং দুর্নীতি-পরায়ণ বলে নাম কেনেন। হেয় প্রতিপন্ন হতে দেরি হয়না। তাঁদের নিয়ে চলে জঘন্য ষড়যন্ত্র। যোগ্য হয়েও অযোগ্য হয়ে থাকতে হয় তাঁদের।

ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র ঘিরে জালপাতা। যাঁরা এই জালে ধরা না দিয়ে মানুষের প্রকৃত সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে চান, অন্যায়ের প্রতিবাদ জানান, প্রতিকারের চেষ্টা করেন তাঁদেরই কপালে জোটে দুর্গতি।

স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের আমলাতন্ত্রের কাছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছেলেমানুষ। কতটুকু ক্ষমতার তাঁর। নির্বাচনী ব্যবস্থায় পাঁচ বছরের মেয়াদে সুবোধ বালকের মত আমলাদের দলভুক্ত হলে আখের গুছিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ কিন্তু দুর্নীতি দূর করে সেবাব্রতের মহান আদর্শ স্থাপন করতে চাইলে পড়ে থাকতে হবে একধারে। কপালে জুঠবে শুধু অবজ্ঞা এবং অসম্মান। তার চেয়ে জনগণের অর্থে আত্মসেবায় মগ্ন হওয়াই শ্রেয় নয় কি? রোগীরা নাইবা পেল ঔষধ, নাইবা পেল পথ্য—নাইবা হল সময়মত চিকিৎসা, কি এসে যায় তাতে? জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই তো স্বাধীন ভারতবর্ষের লক্ষ্য। মানুষ মরলে লাভ ছাড়া লোকসান কোথায়!

কিন্তু মরছে কজন? মৃত্যুর সঙ্গে জন্মহারও বেড়ে চলেছে তাল রেখে। জন্ম মৃত্যু যেন খেলায় মেতেছে, ভারতবাসীর সুস্থভাবে বাঁচার পথকে পঙ্গু করে দিতে। এভাবে যদি জন্মহার দিনের পর দিন বেড়েই চলে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে জাতির জীবনে অভিশাপ নেমে আসবে। অন্ন বস্ত্রের হাহাকার দেখা দেবে।

সর্বনাশ! উপায়?

উপায় উদ্ভাবনে বিলম্ব হয়নি। দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। সরকারী উদ্যোগে ব্যবস্থা নেওয়া হল। জন্ম শাসন। জন্ম নিয়ন্ত্রণ। রাস্তাঘাটে, পথে প্রান্তরে, গ্রামে গ্রামান্তরে লাল ত্রিভুজের ছড়াছড়ি। পুরুষের বন্ধ্যাকরণ। আর্থিক প্রলোভন। দালালদের ছোটাছুটি। অর্থের লোভে বালক বৃদ্ধ দেখা হল না। যা পাওয়া যায় তাই সই।

হিন্দু জীবন সংস্কারাচ্ছন্ন। মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপার। ভারতবর্ষ সেকুলার ষ্টেট। ধর্মনিরপেক্ষতা বিসর্জন দেওয়া যায় না। হিন্দু জীবনে একটি স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ অমার্জনীয় অপরাধ। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে দণ্ডনীয়। মুসলমানদের ক্ষেত্রে বাধ্য-বাধকতার বালাই শূন্য। তাঁদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়।

মানুষ জীবনে সুখ শান্তি স্বাচ্ছন্দ কামনা করে। অধিক সন্তান যে সাংসারিক জীবনের অশান্তির কারণ সেটুকু সে বোঝে। সন্তানের জন্ম দেওয়া এক, আর সেই সন্তানকে শুধুমাত্র খাইয়ে পরিয়ে নয়, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলা দুরূহ ব্যাপার। আজ সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা অতিবাহিত হয় অতি কষ্টে। আয় এবং ব্যায়ে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না সাধারণ গৃহস্থের। অধিক সংখ্যায় সন্তান জন্ম সংসারের শান্তি নষ্ট করে, দুশ্চিন্তায় জীবনকে করে তোলে আনন্দ শূন্য।

লাল ত্রিভুজের আবেদন অথবা সতর্কীকরণ শিক্ষিত গৃহস্থকে

ভবিষ্যতের সর্বনাশা পথ থেকে বাঁচিয়েছে। অবশ্য আবেদনে কর্ণপাত না করে সংস্কারকে যাঁরা আঁকড়ে ধরে আছেন, দায়িত্ব তাঁদেরই।

কিন্তু এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ইতো দেশকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। দেশের বিপুল অংশ নিরক্ষর। শ্রমিক কৃষক, তাঁদের কাছে এর আবেদন কতটুকু। সরকারী হিসাবে আত্মতুষ্টি লাভ করা হয়েছে। চতুর্দিকে সাড়া জেগেছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সত্যই কি তাই?

খাদ্যাভাব, বেকারীত্বের আশঙ্কায় শাসককূল আতঙ্কিত দিশাহারা। দেশকে, জাতিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্যে আজ লক্ষ লক্ষ টাকার জন্ম-শাসনের পরিকল্পনা। কিন্তু কেন? কেন আজ এই অবস্থা? আজকের এই ভয়াবহ অবস্থার জন্য দায়ী কি শুধু মানুষ?

জন্ম নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা যতই ঢাকা নিনাদে নিনাদিত হোকনা কেন, যতই মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে বোঝাবার চেষ্টা করা হোকনা কেন, কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে সরকারী প্রচেষ্টা। অশিক্ষার অন্ধকারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন মেনে নিতে পারেনি সরকারী নীতি। উপরন্তু ব্যাভিচারের স্পৃহা জেগে উঠেছে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে।

কলকাতা ছেড়ে মফঃস্বলে শিক্ষকতা করতে এসে প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধায় পড়েছিল বিনোদ। এ যেন নির্বান্ধব পুরী। এখানে সে একা।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিল সে। উত্তর পেয়েছিল

কদিন পরেই। রবিবার সকালে দেখা করতে বলা হয়েছিল। সময় ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। লোকাল ট্রেন। তবুও তিন ঘণ্টা লেট। কারণ আগে কোথায় যেন গতরাত্রে তার কাটা হয়েছে। মেরামত হওয়ার পর গাড়ি গন্তব্য পথে এগিয়ে যাবে। অথচ হাওড়ায় যখন টিকিট কেটে গাড়িতে চড়েছিল তখনও পর্যন্ত কোন সংবাদ ছিল না। জানা গেল বেশ কটি ষ্টেশন পার হওয়ার পর।

গাড়িতে অসহ্য ভীড়। গ্রীষ্মকাল। কম্পার্টমেন্টের সব কটি পাখাই বন্ধ। সহযাত্রী মন্তব্য করেছিলেন, পাখা চলুক না-চলুক আছে দেখলেও শান্তি।

অন্যজন বলেছিলেন, গ্রীষ্মে অচল, শীতে সচল।

তিনি বলেছিলেন, চলেতো ?

উত্তর, নিশ্চই চলে। চলে—চলবে।

তিনি বলেছিলেন, বলুন না, চলছে—চলবে ?

একজন নীরব শ্রোতা কথা বলেছিলেন, এখানে চলুক বা না-চলুক, আছে, তবু দেখতে পাচ্ছেন। বসে বসে চলছে চলবে করছেন। কিন্তু শেয়ালদা সেকশনে না পাখা না সিট। দাঁড়িয়ে থাকলে মুখ দিয়ে কথা বেরুতো না।

প্রথম জন বলেছিলেন, বেরুতো মশাই বেরুতো। দেওয়ালে কি লেখা আছে দেখুন না, বাহান্ন জন যাত্রী বহিবার জন্য। বসবার কথা কোথায় লেখা আছে দেখিয়ে দিন? এই বসাটা নেহাৎ ফাউ। অবশ্য দাঁড়িয়ে যাঁরা আছেন তাদের সংখ্যাও, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, এই কম্পার্টমেন্টটায় অন্ততঃ শত খানেকের ওপর।

—তাহলেই বঝুন ?

—বোঝার কি আছে মশাই এতে? বুঝতে পারিনা শুধু প্রতি

বছর রেল বাজেটে ঘাটতি আর ভাড়া বাড়বে না বলে, রেল মন্ত্রীর প্রথম দফায় বিবৃতির পরও ভাড়া বাড়ে।

—ঘাটতি কি করে হয় বলুন তো? আগে যখন যাত্রী কম ছিল তখনও মোটা টাকা বাঁচতো, এখন ঘাটতি হয় কেন?

—আপনি মশাই বড় সরল।

—কেন হয় বলবেন তো?

বক্তা গুছিয়ে বসেন। সিগারেট ধরিয়ে বলেন, চুরি, স্রেফ চুরি।

—কি চুরি?

—তার।

—তার চুরিতো আর রোজ হয়না?

—হয় হয়। কোথাও না কোথাও রোজই হয়।

—শুধু তার চুরিতেই ঘাটতি?

—শুধু তার চুরি হবে কেন, কত কি চুরি হয়। রেলতো আর সামান্য নয়? চোখে যা দেখা যায় তার মধ্যে একটা হল গাড়ি থামিয়ে ব্যাটারী চুরি। এসব বলা হয়তো ঠিক নয়। এসব অভিযোগের প্রমাণও হয়তো দিতে পারবো না। আমাদের ষ্টেসনের একটু আগে রোজ গাড়ি থামিয়ে ব্যাটারী চুরি হয়। একদিন ষ্টেসন মাষ্টারকে বললাম, কি মাষ্টার মশাই ব্যাটারী চুরি হয়, কিছু করেন না কেন আপনি? স্টেশন মাষ্টার বললেন, অনেক করেছি। ওপরে নীচে অনেক লেখালিখি করেছি। কোন জবাব পাইনি। আগের স্টেশনের জি, আর, পি-তে, প্রতিকার যাতে হয়, দেখা করতে গেছি। গিয়ে দেখেছি বড়বাবু ভীষণ ব্যস্ত। হোমগার্ডদের ধরা চাল মাপতে তিনি ব্যস্ত। কাছেই বাজারে পাঠাবেন। ফিরে এসে চুপ চাপ আছি। চাকুরী করতে এসে জানটাতো দিতে পারি না।

—বলেন কি? একজন আঁতকে উঠেছেন।

ভদ্রলোক বলেছেন, আর রেলের যে 'র' লোহাগুলো, কি যেন নাম গুলোর? দিব্যি পাহারাদার আর, পি, এফদের সামনে হিন্দুস্থানী

বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর মেয়েরা বহে নিয়ে যাচ্ছে। ঢালাই কারখানায় মোটা দামে বিক্রি হচ্ছে ওগুলো।

—উইদাউট টিকেটে যাতায়াতও আছে।

—আর ওয়াগন ভাঙা পার্টি?

—আচ্ছা, প্রায় ষাট সত্তর খানা ওয়াগানের মধ্যে একটা ছুটো ওয়াগন কি করে ভাঙা হয় বলুন তো?

—মিয়া বিবি রাজী তো কেয়া করেগা কাজী?

—সেটা কি রকম?

—গাই বাছুরে ভাবের মত।

—হেঁয়ালী করছেন?

—হেঁয়ালী নয় মশাই, ধাঁধাঁ। এবার বক্তা অন্যজন। যারা ধাঁধাঁ খেলা খেলে তাদের কাছে উত্তরটা খুব সোজা।

—ব্যাপারটা পরিস্কার করুন। অনুরোধ আসে।

—পরিস্কার করলেই তো আমাকে একজন ওয়াগন-ব্রেকার বলে ধরে নেবেন সবাই? ভদ্রলোক যেন রহস্য করেন।

প্রতিবাদ ওঠে, না-না, তা কেন? আপনি কেন ওয়াগন-ব্রেকার হতে যাবেন?

—আপনিও তো হতে পারেন?

—এঁ্যা। চমকে ওঠেন অনুরোধকারী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আপনি, কিছু মনে করবেন না, উপস্থিত আমাদের মধ্যে ওয়াগন-ব্রেকার কেউ যদি থাকেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। একদিন গুণ্ডা বদমাস বলতে, আমরা না দেখলেও ধরে নিতাম, ইয়া লম্বা চওড়া শরীর, শিক্ষা-দীক্ষাহীন, সমাজে যাদের আমরা ছোটলোক বলতাম, তারাই। কিন্তু আজ? আজ সেসব গুণ্ডা বদমাসের দল নিশ্চিহ্ন না হলেও অবলুপ্তির পথে। সমাজ-বিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে আজ, আমার আপনার, কারো না কারো ঘরের ছেলেরা। এরা বিপথগামী, কিন্তু কেন? শিক্ষার

দোষে? অসৎ সংস্পর্শে? কোনটা ঠিক? শিক্ষার দোষে অথবা অসৎ সংস্পর্শে একটা অংশ যে বিপথগামী হয়েছে এটা যেমন সত্য তেমনি বর্তমানের শিক্ষায় শিক্ষিত একদল বিপথগামী হয়েছে অথবা বলতে পারেন হতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু হয়েছে এবং হতে বাধ্য হয়েছে কেন? কেন তারা অসুস্থ জীবনকে মেনে নিয়েছে, সমাজের-দেশের-মানুষের ক্ষতি করছে? সমাজ ব্যবস্থা। এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী ভ্রান্ত নীতি। উত্তরোত্তর বেকার বৃদ্ধি। প্রশাসন ব্যবস্থায় গলদ, সমস্যা সমাধানে গাফিলতি।

-- কিন্তু ওয়াগন ভাঙাটা·· ···

— বক্তা থামিয়ে দিয়ে বলেন, বলছি মশাই বলছি। ওয়াগন-ব্রেকাররা ব্রেকারী করে নিজেদের জন্যে নয়, মালিকের জন্যে।

—বলেন কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওয়াগন-ভাঙাও আজ একটা ব্যবসা। প্রতিটি ব্যবসায় আসল যেটা সেটা সততা নয়, পুঁজি। হাজার হাজার টাকা লগ্নী করতে হয়।

—এসব কি বলছেন আপনি? জানলেন কি করে?

—জানলাম কি করে? হাসলেন বক্তা। বললেন, ওসব প্রশ্ন করবেন না। যেমন করেই হোক জেনেছি। আর এই সব ওয়াগন ভাঙার ব্যবসা সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে। আপনাদের যদি কারো ধারণা থাকে, ওয়াগন-ব্রেকারের দল তাদের নিজেদের জন্যে ওয়াগন ভাঙে, তাহলে সেটা ভুল ধারণা। ভাঙে মালিকের জন্যে। তারা মাইনে আর কমিশনের চাকর। যদি নিজেদের জন্যে ভাঙতো, তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করার পর নিরাপদ জীবনে নিশ্চই ফিরে যেত তারা। তাছাড়া ব্যবসা চালাতে যে হাজার হাজার টাকার দরকার, তা কোথায় পাবে? কোথায় বিক্রী করবে লুঠের মাল?

—তা বটে। মন্তব্য করেন একজন।

—তাছাড়া বাট সত্তর খানা ওয়াগনের সবগুলোতেই মূল্যবান

জিনিস থাকেনা। হয়তো থাকে দু একটিতে। ভাঙা হয় সেই দু একটি।

—কি করে?

—সেই কথাই বলছি। ব্যবসায়ের মূলধন যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন কর্মীর। কর্মীর দল ছড়িয়ে আছেন রেলওয়ের অনেক বিভাগেই। তাঁরা সংবাদের আদান প্রদান করেন। বড়, মেজ, সেজো, ছোট, 'ন' সকলেই টাকার খেলায় খেলেন। কখনো ইয়ার্ডে ভাঙা হয়, কখনো বা পথিমধ্যে। মাত্র কয়েক মিনিটের খেলা। কর্মীরা তৎপর। সকলের কাজ নির্দিষ্ট। ওয়াগনের মাল গিয়ে ওঠে অপেক্ষমান লরিতে। যেমন শীল ছিল তেমনি শীল হওয়া অবস্থায় গাড়ি যাত্রা করে তার লক্ষ্যপথে। কয়েক লক্ষ টাকার মাল যে লুঠ হয়ে গেল তার এতটুকু চিহ্ন মাত্র থাকেনা। অনেক সময় মালিকের মাল মালিকের ঘরে গিয়েই পৌঁছায় শেষ পর্যন্ত।

—কিন্তু মাঝে মাঝে ওয়াগন-ব্রেকাররা মরে তো?

—মরে বৈকি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হিস্সার গণ্ডগোলে মরে। মরে উভয় পক্ষই। হঠাৎ আসা বিপদের আশঙ্কায় মালিক পক্ষ সদা প্রস্তুত। দরা-দরি চলে। দু পাঁচ হাজার থেকে পঞ্চাশ ষাট হাজারে নীলাম চড়ে। সন্ধি না হলেই এক পক্ষের মৃত্যু। অবশ্য মাঝে মাঝে রক্ষকের দল কর্তব্য পালনে দ্বিধা না করে গুলি চালায়। তবে তেমন ঘটনা খুব কমই ঘটে। কারণ রুই-কাতলার টিকি বাঁধা, স্ত্রীর নামে বাড়ি, পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে উকিল ব্যারিষ্টার ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি চাকুরীর পয়সায় হয়? সাধ আছে, সাধ্য কোথায়? অতএব……

ট্রেনের জমজমাট আসর। অযথা হায়রানি থেকে মুক্তি। সময় মূল্যহীন। বিপত্তি তো ভাগ্যের খেলা।

অস্থির হয়েছিল বিনোদ। সময় চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে নিরুপায়। কিছু করার সাধ্য তার নেই।

শুধু তার-কাটা নয়। অবরোধ, বিক্ষোভ। যাত্রীরা নিরুপায়। লেটের মাশুল তাদেরই গুণতে হয়। আবেদন, নিবেদন। কর্তৃপক্ষ মূক, বধির। দপ্তরের শোভা বর্দ্ধন করেন তাঁরা, হাজার দু হাজারের ভাগ্যবানের দল। কোথায় গলদ, কেন গলদ, কি ভাবে যাত্রীদের সুবিধা হবে, প্রতিকারের পথ কি নেই? হয়তো আছে। কিন্তু প্রতিকার করতে বয়ে গেছে তাঁদের।

ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে মানুষের, দেখা দেয় উন্মত্ততা। সুযোগ সন্ধানীর দল সদা প্রস্তুত। একদিনের বিক্ষোভ হাজার দিন ফেটে পড়ে, সামান্য কারণে চলে তাণ্ডব নৃত্য। নষ্ট হয় জাতীয় সম্পত্তি। নষ্ট করেন যাত্রীরা অথবা যাত্রীদের নাম ভাঙ্গিয়ে সুযোগ সন্ধানীর দল।

কর্তৃপক্ষ ঘেন্নায় ছিঃ-ছিঃ করেন। বিবৃতি দেন। মনে মনে হিসাব কষেন ক্ষতি পূরণের মাধ্যমে কি ভাবে কত অর্থ পকেটস্থ হবে। কিন্তু ভুলেও প্রতিকারের যথাযত ব্যবস্থা করেন না।

লোকাল ট্রেনের ব্যাপারে যাত্রী সাধারণের অভিযোগের অন্ত নেই। দু-একটি ট্রেন আছে যেগুলি ছোটে ঠিক দূর পাল্লার গাড়ির মত। অথচ সেগুলিও লোকাল ট্রেন। টুপিতে টুপিতে ভাব! গাড়ি ভাল যাবে, ফাঁকা যাবে। নাহলে বন্ধুত্বের বন্ধন কিসের! ক্ষমতা যখন করায়ত্ব, বন্ধুদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বৈকি।

আরো নানা অভিযোগ। সরল সহজ আলোচনা। শুনতে শুনতে বিনোদের মাথা ধরে গিয়েছিল। চিৎকার, চেঁচামেচি, হৈ-হৈ। ভিখারীর করুণ আর্তি। হকারের প্রচার মহত্ব।

—এই ভিখারীটাকে চেনেন মশাই?

—আজ্ঞে না, আমার সঙ্গে আলাপ নেই। ওকে কোনদিন ভিক্ষা দিয়েছি বলেও মনে পড়ে না।

—আপনি না দিলেও অনেকে দেয়।

—যার আছে সে দেয়।

—যার নেই সেও দেয়।

—দিতে পারেন।

—কিন্তু দেওয়া উচিৎ নয়।

—আপনি যে মহাত্মা গান্ধী হয়ে গেলেন দেখছি! অথবা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চাইছেন।

—অনুসরণ করা উচিৎ।

—কেন বলুন তো? খাটবার ক্ষমতা আছে বলে? আপনি একটা কাজ জুটিয়ে দিন না।

—কাজ দিতে পারলে তো দেবেন। তৃতীয় ব্যক্তির মন্তব্য।

—দিলেও করবে না। বুঝলেন?

—বলেছে আপনাকে?

—ও না বলুক, ওদের একজনকে বলতে শুনেছি। একটা ভিখারী ছেলেকে এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীতে চাকরের কাজ দেবেন বলেছিলেন। তা ছেলেটা কি বললে জানেন, কত মাইনে আপনি দিতে পারেন বাবু? ভদ্রলোকের কাছে মাইনের কথা শুনে বলেছিল, বাজার ভাল হলে, ও-পয়সা একদিনেই সে উপায় করে।

—তাহলে ভিখারীরা তো দেখছি রীতিমত বড়লোক!

—সকলের কথা জানি না। কিন্তু ওই ভিখারীটা রীতিমত অবস্থাপন্ন। অন্যের মুখে শোনা নয়, সোদপুরে ওর ভিক্ষার পয়সায় তৈরী বাড়ি নিজের চোখে দেখেছি। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে ওর ফ্যামিলির লোকজনদেরও দেখেছি। কে বলবে, ছেলেমেয়েরা একটা ভিখারী পরিবারের।

—একজনের অবস্থাই তো সব ভিখারীর অবস্থা নয়? তৃতীয় ব্যক্তি অগ্রণী হন।

—তাতো আমি বলছি না।

—আপনি সব ভিখারীর কথা জানেনও না।

—স্বীকার করছি।

—জানেন, সমস্ত ভারতবর্ষে আজ কত ভিখারী? জানেন, যত দিন যাচ্ছে উত্তরোত্তর ভিখারীর সংখ্যা বাড়ছে?

ভদ্রলোক নীরব। তৃতীয় ব্যক্তি একটু চুপ করে থাকেন। একসময় কতকটা আত্মগত ভাবেই বলেন, ভিখারীর পীঠস্থান বলতে কলকাতা এবং বোম্বাই। অবশ্য সমস্ত ভারতবর্ষেই ভিখারী কোথাও কম, কোথাও বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। ভিখারী, অনেক সমস্যার মত একটা জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যার হাত থেকে পৃথিবীর খুব কম দেশই মুক্ত। ভিখারী একটা ব্যবসায়ও বলতে পারেন। বহু সমাজ-সেবক, যেমন বস্তির মালিক, মুখে সমাজ উন্নয়ণের কথার ফুলঝুরি ওড়ে, ঠিক তেমনি একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ভিখারীর ব্যবসা করে, মানুষের দয়ার দানে মুনাফা বাড়ায়। আমি কলকাতা অথবা হাওড়ার কথা বলছি, যদি কদিন ভিখারীদের আড্ডায় আড্ডায় ঘোরেন তাহলে অনেক কিছুই দেখতে পাবেন আপনি। সর্দ্দার ভিখারীকে চিনে যদি অনুসরণ করেন, তাহলে জানতে পারবেন অনেক কথাই।

—সর্দ্দার ভিখারী? একজনের বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্ন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে এই যে ব্যবসাদার পরিচালিত ভিখারীরা, এরা শুধুমাত্র ভিখারী নয়। এদের আরো অনেক গুণ আছে। এরা ভিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম কাজ করে; কয়েকবার ধরা-টরা পড়ার পর কাগজে কিছু কিছু লেখালিখিও তো হয়েছে। কিন্তু প্রতিকার কিছুই হয়নি। কারণ......। ভদ্রলোক চুপ করে যান।

একজন প্রশ্ন করেন, তাহলে ভিখারীরা সব.........

—না। বাধা দেন ভদ্রলোক। ম্লান একটু হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। বলেন, কিছু ভিখারী যেমন ভিক্ষাকে পেশা করেছে, ভিখারীদের একটা অংশ যেমন সমাজসেবী ব্যবসাদারদের দ্বারা পরিচালিত, তেমনি একটা বিপুল অংশ শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে

ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এরা কারা জানেন, গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের দল। বিপন্ন শ্রমিক পরিবার।

—বলেন কি?

ভদ্রলোক গম্ভীর। ব্যথিত তাঁর কণ্ঠ। বলেন, এ আমাদের লজ্জা না অবহেলা, অবিচার না শোষণ, বঞ্চনা না ব্যর্থতা সে প্রশ্নে আমি যেতে চাইনা। কেতাবী কথাও আমি বলবো না। আমি যা দেখেছি, যা আমার মনে হয়েছে সেইটুকুই শুধু বলতে পারি।

অনুরোধ করেন একজন, আপনি বলুন।

ভদ্রলোক জানেন। বলেন, একটা কথা কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি। আমি কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ আলোচনা করছি না। রাজনীতির মত উঁচু এবং রাজনীতির ধোঁয়াটে কোন নীতি আমার মনে সংক্রামিত হয়নি। আমি গ্রামের ছেলে। জীবনের কুড়িটা বছর একভাবে গ্রামে কাটিয়েছি। আজ তিরিশ বছর সহরে বাস কিন্তু গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ-শূন্য নই। মড়ক, মহামারী, প্লাবন অথবা দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্যাভাবে গ্রামের গরীব মানুষ গ্রামত্যাগ করে সহরে ভিখারীর জীবনে প্রবেশের একমাত্র কারণ বলে যদি আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়, তাহলে তা শুধুমাত্র ভুল নয়, মিথ্যা। অনিশ্চিত জীবন মানুষকে ভিখারী করে। কারখানার অশক্ত শ্রমিক, বেকার শ্রমিক পরিবার অথবা উপার্জনহীন অনেক পরিবার যেমন ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়, তেমনি আজকের গ্রাম বাংলার অনেক খেটে খাওয়া মানুষ, তার পরিবার পরিজন নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। আজ নাকি আমাদের জীবনের অনেক মানোন্নয়ণ হয়েছে। দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে গেছে। ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে মানুষের। গ্রাম-জীবন অনেক উন্নত। কিন্তু গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ, ক্ষুদ্র চাষীর জীবন যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই পড়ে আছে। পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য সেখানে দেওয়া হয় না।

—বলেন কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভারতবর্ষের অনেক গ্রামে আমি ঘুরেছি। সামন্ত-তান্ত্রীক সমাজ ব্যবস্থা কয়েক বছর আগেও দেখেছি। সাধারণ মানুষের ওপর ভূ-স্বামীদের অত্যাচার এখনও সমানভাবে বহে চলে। দুকাঠা জমির বিনিময়ে কেনা গোলাম হয়ে থাকে। বাইরের কাজ যতই থাকনা কেন, মালিকের কাজের যদি ডাক আসে, মরা ছেলে ঘরে ফেলে রেখে আগে মালিকের কাজ শেষ করে আসতে হবে।

নীরব শ্রোতা এক তরুণের সকৌতুক টিপ্পনি, কোথায় দাদু ?

—কোথায় কি ?

— গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষদের ওপর জঘন্য অত্যাচার কোথায় হয় ?

— ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে।

—আর দু কাঠা করে জমির দাসখত কোথায় দেখেছেন ?

—পালামৌ তে দেখেছি।

—বলেন কি ?

—সমস্ত ভারতবর্ষে শত শত পালামৌ আছে। সহরের মানুষের মত গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষও এক একটা ধাক্কায় ভিখারীর বৃত্তি-গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে।

ভিখারী শুধু ভারতবর্ষের মানুষ হচ্ছে না, শুধু গ্রামের দীন মজুর, কারখানার বেকার শ্রমিক পরিবার অথবা নিরাশ্রয় উদ্বাস্তুরাই ভিখারী নয়। যত দিন যাচ্ছে, ভিখারী হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষ। তিনটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আংশিক সাফল্য, ব্যর্থতা ক্ষত সৃষ্টি করেছে সমাজ জীবনে। সম্ভাবনায় উজ্জ্বল ভবিষ্যত মুখ ঢেকেছে লজ্জায়। ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা সাফল্য আনতে পারেনি।

কিন্তু সাফল্য লাভ কি অসম্ভব ছিল ?

হয়তো ছিল না।

তাহলে কেন সাফল্য এলোনা? কাদের অদূরদর্শিতা, মুনফা-বাজি, স্বার্থপরতা পরিকল্পনার সাফল্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করল? তারা কারা? কি তাদের পরিচয়?

যত দিন যাচ্ছে ভারতবর্ষের বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলার বেকার সমস্যা আজ চরমে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সরকারী হিসাবের বেকার এবং বেসরকারী হিসাবে আজ আকাশ-পাতাল তফাৎ। অথচ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশকে শুধুমাত্র স্বাবলম্বী অথবা উন্নতির স্তরে পৌঁছে দিতনা, বেকার সমস্যারও সমাধান করতো। কিন্তু তা হয়নি। প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে ব্যর্থ হয়েছে তা। কিন্তু যাদের জন্যে এই ব্যর্থতা তারা সম্মানের অংশীদার হয়েছে।

সেদিন ট্রেনের মধ্যে বসে অনেক কথাই শুনেছিল বিনোদ। কলকাতাকে পণ্ডিত নেহেরু দুঃস্বপ্নের নগরী, মিছিল নগরী, বহু আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। বিদেশীরা কলকাতার ভিখারীর ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে টেলিভিসনে দেখিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। দারিদ্র জীবনের অভিশাপ। হয়তো সত্য, দারিদ্র জীবনকে সংগ্রামের পথে পরিচালিত করে। দুঃখের অনির্ব্বাণ শিখা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। দারিদ্র মানুষের ব্যক্তিগত, জাতীয় সমস্যা।

সেই সমস্যা নিয়ে, একটা জাতীর, দেশের দারিদ্র নিয়ে বিদেশীর দল সমবেদনার ছলনায়, কৌতুকে, কপট সহানুভূতিতে আপন দেশের মানুষকে দেখিয়ে আনন্দ পায়। একটা বিদেশী রাষ্ট্রকে আপন রাষ্ট্রে হেয় প্রতিপন্ন করে।

বিদেশীস্থ রাষ্ট্রদূতের দল, যাঁদের জীবন, দেশের অসংখ্য মানুষ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে থাকলেও রাজকীয় আড়ম্বরে অতিবাহিত হয়, পানাহারের ঢালাও ব্যবস্থা যাঁদের করায়ত্ব, তাঁরা ভুলেও কখনো সৌজন্য মূলক প্রতিবাদ করেন না। স্মরণ করিয়ে দেননা, ভারতবর্ষ শুধু ভিখারীর দেশ নয়। কলকাতার দর্শনীয় বস্তু শুধুমাত্র জঞ্জাল

ভিখারী, বিশৃঙ্খল জীবন যাত্রা, মিছিল, শ্লোগান নয়। আছে আছে, আরো আছে। বিদেশী বন্ধুরা মনকে উদার করো, স্বচ্ছ করো দৃষ্টি। তাহলেই দেখতে পাবে ভারতকে। শুনতে পাবে ভারতাত্মার সেই শাশ্বত বাণী। সেই চির আহ্বান। দুঃখ দারিদ্র্য অনাহার জর্জরিত জীবন-যুদ্ধে সদা ব্যস্ত মানুষের অন্তরের একমাত্র প্রার্থনা—

ঐ নামে একদিন ধন্য হল দেশ দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আর বার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি॥
বোধিদ্রুম তলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক। মুক্ত হোক মোহ আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রি শেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নব প্রভাতে উঠুক কুসুমি॥
চিত্ত হেথা মৃত প্রায়, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধন মন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী;
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি
এনে দিক অজেয় আহ্বান॥

কিন্তু তা তাঁরা করেন না। ভারতবর্ষকে নিয়ে বিদেশীরা যখন ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মুখর হয়ে ওঠে তখন মহামান্য রাষ্ট্রদূতের দল যেন পরোক্ষ ভাবে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। বোধহয় নিজেদের ভারতীয় ভাবতে ভুলে যান তাঁরা, লজ্জা বোধ করেন।

ভারতবর্ষের লজ্জা, তার সীমাহীন দারিদ্র। যত দিন যাচ্ছে, দেশটা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। অযোগ্য পক্ষপাত, দুষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থাই মুখ্য কারণ। মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের দল আরামে বিলাসে দিন কাটাচ্ছে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে লক্ষ-লক্ষ মানুষ।

এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, জানেন, বাংলার এই চরম দুর্গতি কেন?

কয়েক জনের অনুরোধ, কেন দাদা?

—কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্যে। শাসক পালটেছে কিন্তু শাসন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি আজও। একদিন ইংরেজ সবচেয়ে বেশি শোষণ করে গেছে এই দেশটাকে। অর্থকষ্টে ডুবিয়ে রেখেছিল।

—কেমন করে?

—ভারতবর্ষের পরশ মানিক এই বাংলাদেশ। বাংলার সম্পদ ঘর ভরিয়ে দিয়েছিল ইংরেজের। বাংলার আয়ের একটা বিরাট অংশ ইংরেজ পকেটস্থ করতো। আজও সেই অবস্থাই চলছে। বছরে প্রায় চারশো অষ্টআশী কোটি টাকা কেন্দ্রীয় কর বাবদ আদায় হয় বাংলা থেকে, পরিবর্তে বাংলা কেন্দ্রের কাছ থেকে পায় মাত্র আটচল্লিশ কোটি টাকা। বাংলার যা প্রয়োজন তা তাকে দেওয়া হয়না। অথচ জাতীয় সমস্যা তারই মাথায় গুরুভার হয়ে চেপে আছে। তাকে যেন অনিশ্চিত অসহায় অবস্থার মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্যেই এই চক্রান্ত। তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। তার অর্থে উন্নতি সাধন চলেছে অন্যান্য প্রদেশের। কেন্দ্র সেখানে মুক্ত হস্ত। কিন্তু কেন?

—কেন আবার কি, ষড়যন্ত্র। বক্তা অন্য এক ভদ্রলোক। বলেন, বাংলাকে অথর্ব করে রাখা হয়েছে। কারণ প্রাদেশিকতা, পক্ষপাতিত্ব। বাংলাকে শেষ করে দিতে হবে। মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হবে বাংলার।

—এসব কি বলছেন আপনারা? তৃতীয়জন প্রতিবাদীর ভূমিকা নেন।

—বলছি মশাই অনেক দুঃখে, অনেক ঠেকে এবং দেখে শিখে। বলেন দ্বিতীয়জন। কিছু মনে করবেন না, আমি একজন কেন্দ্রীয় কর্মচারী। ১৯৬০ সালের রেল ষ্ট্রাইকের কথা মনে আছে আপনাদের? ধর্মঘটের ব্যর্থতা। কর্মচারীদের ন্যায্য ধর্মঘট কোন্ ঘরভেদি বিভীষণের জন্যে ব্যর্থ হয়েছিল তাও নিশ্চই আপনারা ভুলে যাননি। রামচন্দ্র যেমন বিভীষণকে বঞ্চিত করেন নি, তেমনি দাড়িওয়ালা বিভীষণও সেদিন বঞ্চিত হননি। ইনি সেই তিনি, যিনি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহকে 'ড্রেস-রিহার্সাল' বলে অভিহিত করেছিলেন, কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ধর্মঘট ব্যর্থ করায় মুখ্য-ভূমিকা নিয়ে লাভ করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্ব।

—আপনার অনুমান। তৃতীর জনের জবাব।

—অনুমান প্রত্যক্ষ করেছি আমরা। দেখেছি তাঁর খবরের কাগজে ছবি ছাপা মুখ।

—কিন্তু এর মধ্যে প্রাদেশিকতার গন্ধ পেলেন কোথায়?

—একটি মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে।

—কে তিনি?

—তিনি বিধানচন্দ্র রায়। তিনিই কেন্দ্রের জঘন্য চক্রান্তকে ব্যর্থ করেছিলেন। বেছে বেছে বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞের যে সূচনা হয়েছিল, তা বন্ধ করেছিলেন। স্পষ্ট কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলার ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করবেন না। প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যখন তিনি, তখন কেন্দ্রীয় কর্মচারী হলেও দায় দায়িত্ব তাঁর।

—কিন্তু···

—কিন্তু কি মশাই। ফুঁসে উঠেছিলেন ভদ্রলোক। টেলিফোন ভবনের মেয়েদের নাকে খত দেওয়ার ঘটনাগুলো কাগজে পড়েন নি? বেছে বেছে বরখাস্তের তালিকায় বাঙ্গালী কর্মচারীদের নাম উঠেছিল, জানেন না?

—আপনার বিধান রায়ও সমালোচনার উর্দ্ধে নন।

—তা হয়তো তিনি নন। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রকৃত বন্ধু ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালীর উন্নতির জন্যে প্রকৃত চেষ্টা তিনিই করে গেছেন। বাংলার সমস্যাকে বাংলার সমস্যাজ্ঞানেই সমাধানের পথ খুঁজেছেন। অন্যান্য নেতাদের মত শুধুমাত্র গদির মোহে চোখ কান বুজে থাকেন নি। অন্যান্য নেতাদের হয়তো অকাট্য যুক্তি আছে, তাঁরা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার প্রভাবমুক্ত। তাঁরা উদার, মহান। বিধান রায় হয়তো অন্যান্য নেতাদের মত অতটা উদার এবং মহান ছিলেন না, একান্ত বাধ্য হয়েই হয়তো অনেক ভুল করেছেন কিন্তু বাংলার নিজস্ব চিন্তা তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি।

—সেই জন্যেই বেরুবাড়ি হস্তান্তর দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন ?

—করেছিলেন। কিন্তু কেন করেছিলেন, কেন করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেটুকু চিন্তা করে দেখুন। তিনি কি অন্যায় বলে প্রতিবাদ করেন নি ? তাঁকে কি বাধ্য করা হয়নি ?

—আর বাংলা বিহার এক করার ব্যাপারটা ?

বক্তা একটু নীরব থাকেন। তারপর ম্লান কণ্ঠে বলেন, বাংলা বিহার একত্রীকরণের বিষয়টিকে তাঁর জীবনের একটা ভ্রান্তি, আপনি বলতে পারেন। তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়েই একত্রীকরণ কামনা করেছিলেন। তিনি দুই প্রদেশের উন্নতির জন্যেই চেয়েছিলেন মিলন। বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লোপের জন্যে নিশ্চই চাননি।

—বাংলা বিহার যদি এক হোত সেদিন, আজ তার ফল কি হোত জানেন ?

—কি হোত ?

—সত্যি সত্যিই বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লোপ পেত। তার মুখের ভাষাও অবলুপ্তির পথে পা বাড়াতো।

—না-না।

সেদিন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ভদ্রলোক। ট্রেনের তর্ক ট্রেনেতেই

শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদকারী ভদ্রলোকের আশঙ্কাই যেন সত্য প্রমাণিত হতে চলেছে।

হিন্দী আজ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার পেছনে সব থেকে বড় যুক্তি, হিন্দী ভারতবর্ষের অধিক সংখ্যক মানুষের মধ্যে চলিত। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে কিছু না কিছু মানুষ হিন্দী বোঝে, বলতেও পারে।

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনসাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়। জনসাধারণের মনোনীত প্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। বিধানসভা এবং লোকসভা। লোকসভার প্রতিনিধিরাই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সংসদই ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রকৃত রক্ষক। ভাল-মন্দের গুরুদায়িত্ব ভার তাঁদের ওপরই

এই সংসদেই ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা বিল গৃহীত হয়েছিল একদিন। ভারতবর্ষের মত বহুভাষাভাষী রাষ্ট্রে চৌদ্দটা প্রধান ভাষার মধ্যে হিন্দী পেয়েছিল রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা।

রাষ্ট্রভাষার বিল ভোটে সমান-সমান। রাষ্ট্রপতির ভোটে হিন্দীর জয়। সে জয় তার সৌভাগ্যের সুচনা করেছিল। শুধুমাত্র ভাষার নয়, ভাষাভাষীরও।

অথচ যোগ্যতা বিচারে হিন্দীর স্থান প্রথম তো নয়ই, দু-একটি ভাষার নীচে। একমাত্র যুক্তি, হিন্দী অধিকাংশের সহজবোধ্য ভাষা। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান থেকে মোটরে চড়া বাবুরাও বুঝতে এবং অল্প বিস্তর বলতে পারেন. অহিন্দীভাষী বালকও বলতে পারে, হাম খেলতে যাতা।

অবশ্য প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির জন্যেই সরকার সচেষ্ট, মুক্তহস্ত কেবলমাত্র হিন্দীর জন্যে। অকাতরে অর্থব্যয় রাষ্ট্রভাষার কল্যাণে। লোভনীয় ব্যবস্থা, বিরামহীন গবেষণা। বাধ্যবাধকতা, কোথাও কোথাও লাঞ্ছনা অবজ্ঞা, কৈফিয়ত তলব। ভারতবর্ষের

সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী মাননীয় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর ভোটে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভে সহায়তা করেছিলেন। হয়তো তিনি হিন্দীভাষী বলেই তা করেছিলেন, কিন্তু যদি তিনি অহিন্দীভাষী হতেন?

এখনও পর্যন্ত প্রদেশগুলিতে হিন্দী শিক্ষার ব্যায়ভার বহন করে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে প্রদেশগুলিকেই সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। হিন্দী শিক্ষকদের বিশেষ বেতনহার অনুযায়ী প্রাপ্য মেটাতে হবে।

হিন্দীর বিরুদ্ধে অহিন্দীভাষী অঞ্চল সমূহের ক্ষোভের অন্ত নেই। কোথাও কোথাও প্রতিবাদ সোচ্চার। হিন্দী প্রচার প্রসারের মাধ্যম হিসাবে হিন্দী উর্দ্দু মেশানো চলচ্চিত্রের অবদান নেহাৎ কম নয়। অবাধ ছাড়পত্র তাই তার ভাগ্যে।

'আংরেজি হটাও'—হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে জোরদার হয়ে উঠেছিল একদিন। হিন্দী, শুধু হিন্দী। আংরেজি চলবে না, শুধুমাত্র হিন্দী।

ট্রেনের সেই প্রতিবাদী ভদ্রলোকের কথা বিনোদের মনে পড়েছিল। বাংলা বিহার একত্রীকরণের উগ্র সমালোচকের আশঙ্কাটাকে আজ উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই যেন। বাংলাদেশে হিন্দী ভাষার স্কুলের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। হিন্দীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জেহাদ ঘোষণা করেনি। ষড়যন্ত্র করে তাড়াবার চেষ্টা করেনি হিন্দীকে।

কিন্তু বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্ত নেই বিহারে। বাংলা সেখানে বিদায়ের পথে।

প্রতিকার?

তাও হয়তো নেই বিহারে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের। বাঙ্গালী শিশু একদিন হয়তো 'জল পড়ে—পাতা নড়ে' পড়তে পারবে না। বাংলা নয়, হিন্দী পড়বে সে। উগ্র প্রাদেশিকতার বলি হয়ে

মাতৃভাষার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে, হারিয়ে ফেলবে তার উদার ভাবুক স্বপ্নিল বাঙ্গালী মনটাকে।

ধন নয়, প্রাণ নয়—ভাষা। মুখের ভাষা, বুকের ভাষা, বাঙ্গালীর প্রাণের সম্পদ - বাংলা ভাষা। কবির আনন্দে উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হৃদয়ের প্রকাশ, আহা মরি বাংলা ভাষা।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী।

স্মরণীয় অথচ বেদনার্ত একটি দিন। ওপার বাংলার তিরিশটি প্রাণের রক্তধারায় সিক্ত হয়েছিল মাটির বুক। অসংখ্য আহতের করুণ আর্তনাদের পরিবর্তে জেগে উঠেছিল সোচ্চার দাবী। মাতৃভাষার মর্যাদালাভের জন্যে বাঙ্গালী বুক পেতে দিয়েছিল কুখ্যাত মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রকারীদের বুলেটের মুখে।

লীগের জন্ম সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার ভিত্তিতে। লীগের সোচ্চার ঘোষণা, মুসলমানরা আগে, মুসলমান তারপর ভারতীয়। গান্ধীজী মেনে নিলেন তা, সমর্থন করলেন খিলাফৎ আন্দোলন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে গৃহীত হল পাকিস্থান প্রস্তাব। কংগ্রেসও দেশ বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করলো একদিন। দেশভাগ, স্বাধীনতা গ্রহণ।

ফলে উভয় বঙ্গ মার খেল। মার খেয়ে খেয়ে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়লো। পশ্চিমে শুধু সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা। বেঁচে থাকার অন্তহীন প্রচেষ্টা। যে বাংলা ছিল সমগ্র ভারতের চিন্তা-নায়ক, দেশ বিভাগের অভিশাপে হল রিক্ত নিঃস্ব, পথের ভিখারী। বাঙ্গালী আপন দেশে পরদেশী।

কিন্তু উঠে দাঁড়াল পূর্ব বাঙ্গলা। সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো

স্বাধীনতার অন্তর্নিহীত অর্থ। প্রভু বদল হয়েছে কিন্তু শোষণ বন্ধ হয়নি। হয়তো প্রভু বদলও হয়নি, এসেছে বিদেশী প্রভুর পরিবর্তে দেশী প্রভুর দল। অত্যাচারে শোষণে যারা সমান। এতটুকু তফাৎ নেই দুজনের মধ্যে।

এ বাংলায় খাদ্য নেই, নেই বেকারের চাকুরী। এ বাংলায় যত দিন যাচ্ছে মানুষ হচ্ছে পথের ভিখারী। যুব সম্প্রদায় হচ্ছে বিপথগামী। কিন্তু কেন হচ্ছে? কাদের পাপের শাস্তি ভোগ করছে বাংলা?

যে মুসলিম লীগের হাতে পাকিস্থানের দলিল তুলে দেওয়া হয়েছিল সে লীগ আজ কবরে। পশ্চিমের শোষক শ্রেণী, শোষণের স্বপ্ন দেখে। অবাঙ্গালী চক্র দাবীয়ে রাখতে চায় বাংলাকে। হাতে তাদের অস্ত্র। চোখে হিংস্র পশুর লালসা। তর্জনে গর্জনে কাঁপায় আকাশ। কারণ, তাদের পাকিস্থান সৃষ্টির সুদূরপ্রসারি চক্রান্ত আজ ব্যর্থ। তারা দেউলিয়া হয়ে যাবে। মারো-মারো, শেষ করে দাও বাংলাকে।

মুসলিম অধিকার রক্ষার জন্যে যে পাকিস্থান, সেই পাকিস্থানে মুসলমান মারছে মুসলমানকে! না মুসলমান নয়, অত্যাচারী শাসক শ্রেণী মারছে শোষিতকে। শোষণ যন্ত্র হাতছাড়া হতে দেখে সে ক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে বাঙ্গালী আজ অকুতোভয়, মৃত্যু তার পায়ের ভৃত্য—চিন্তা ভাবনাহীন। বেঁচে থাকার অধিকার অর্জনের পথে তার দৃঢ় পদক্ষেপ। সে আজ পণ করেছে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার। সে চায় অত্যাচারের অবসান। সে চায় সত্যকারের স্বাধীনতা। কবির লেখনীতে তার প্রতিজ্ঞার প্রকাশ। সে কবি তাদেরই একজন। তাদের প্রতিজ্ঞা:

জনতার সংগ্রাম চলবেই।
আমাদের সংগ্রাম চলবেই॥

হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥

প্রতারণা প্রলোভন প্রলেপে
হ'ক না আঁধার নিশ্ছিদ্র
আমরা তো সময়ের সারথী
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র।
দিয়েছি তো শান্তি, আরো দেবো স্বস্তি
দিয়েছি তো সম্ভ্রম, আরো দেবো অস্থি
প্রয়োজন হলে দেবো একনদী রক্ত,
হ'ক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত,
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই।
চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥

মৃত্যুর ভর্ৎসনা আমরা তো
অহরহ শুনছি
আঁধার গোরের ক্ষেতে তবুতো
গোরের বীজ বুনছি
আমাদের বিক্ষত চিত্তে
জীবনে জীবনে অস্তিত্বে
কাল নাগ-ফণা উৎক্ষিপ্ত।

বার-বার হলাহল মাখছি,
তবুতো ক্লান্তিহীন যত্নে
প্রাণের পিপাসা টুকু স্বপ্নে
প্রতিটি দণ্ডে মেলে রাখছি ॥
আমাদের কি বা আছে
কি হবে যে অপচয়,
যার সর্বস্বের পণ
কি সে তার পরাজয় ?
বন্ধুর পথে পথে দিনান্ত যাত্রী
ভূতের বাঘের ভয়
সে তো আমাদের নয়।
হ'তে পারি পথশ্রমে আরো বিধ্বস্ত
ধিকৃত নয় তবু চিত্ত
আমরা তো সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী
চলবার আবেগেই তৃপ্ত।
আমাদের পথরেখা দুস্তর দুর্গম
সাথে তবু অগণিত সঙ্গী
বেদনার কোটি কোটি অংশী
আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অগ্নি
সকল বিরোধ বিধ্বংসী।
এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনোদিন আমরা যে ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া জানবোই,
আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নূতন সূর্যশিখা জ্বলবেই।
চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥

পশ্চিমবঙ্গের মূল সমস্যা চারটি। ভূমি, খাদ্য, দারিদ্র, বেকারি।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সমস্যা আজ একটি বড় সমস্যা। ১৯৬১ সালের আদমসুমারি হিসাব অনুষায়ী লোকসংখ্যা ৩, ৪৯, ২৬০০০। আয়তন ৮৮,৫৬১·৯ বর্গ কিলোমিটার। এই আয়তনে বসতির ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৩৯৯ জন। ভারতবর্ষে বসতির ঘনত্ব, গড়ে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ১৪৩ জন। ভারতবর্ষের গড় বসতির ঘনত্বের তিনগুণ পশ্চিম বাংলায়। এটা হিসাবের মধ্যে। হিসাবের বাইরে যা আছে তার কোন হিসাব নেই এবং ৬১ সালের পর দশ বছরে লোকসংখ্যা বেড়েছে ছাড়া কমেনি। যত দিন যাবে এ সংখ্যা উত্তরত্তোর বৃদ্ধি পাবে। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যসীমা পুনর্নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত এ সমস্যা চিরকাল সমস্যাই হয়ে থাকবে। এবং এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই আছে।

পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের ৬৫·৭৭ শতাংশ (৫৭,৭৯,০০০ হেক্টর) আবাদ যোগ্য জমি। ৬২·৩ শতাংশ জমি আবাদ হয়ে গেছে, অনাবাদি জমি রয়েছে মাত্র ৩·৭ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের ১৪·৬ শতাংশ জমি বাস-গৃহ, শিল্প প্রতিষ্ঠান, রাজপথ, নদী, জলাশয় দ্বারা অধিকৃত। ১২·৫ শতাংশ জঙ্গল। ৬·৯ শতাংশ চাষের অযোগ্য পতিত জমি। আবাদি জমি ৬২·৩ শতাংশ। ৩·৭ শতাংশ আবাদযোগ্য অনাবাদি জমি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়াবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ফলন যদি বাড়ানো না যায় তাহলে খাদ্য সমস্যার মীমাংসা হবে না।

ভারতবর্ষে মাত্র তিনটি রাজ্যে ধানের ফলনের হার পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশি। ফলনের হার গড়ে বিঘা প্রতি মাদ্রাজে ২০৯ কেজি, মহীশূরে ২০১ কেজি, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৮২ কেজি আর পশ্চিমবঙ্গে ১৪০ কেজি।

১৯৬৮-৬৯ সালের মোট উৎপাদন ৫৭'৮০ লক্ষ টন। বীজ প্রভৃতির জন্যে এক পঞ্চমাংশ বাদ দিলে খাদ্যের জন্যে পাওয়া যায় ৪৬ লক্ষ ২৪ হাজার টন।

১৯৬১ সালে লোক সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬০ হাজার। দশ বছরে যদি ২৫ শতাংশ বেড়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, বর্তমানে লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ। হিসাব করে দেখলে বছরে মাথা পিছু পড়ে ১০৬ কেজি ধান বা ৮০ কেজি চাল অর্থাৎ বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় যা ধান জন্মায় তাতে সুষ্ঠ বণ্টন করতে পারলে প্রতিটি লোক দৈনিক ৯৫০ গ্রাম চাল পেতে পারে। সত্যকারের চালের অভাব পশ্চিমবঙ্গে নেই।

কিন্তু হিসাবটাই তো সব নয়। হিসাবের বাইরেও কিছু আছে। সেই কিছুর প্রাধান্যই এখানে প্রবল। বণ্টন যাতে সুষ্ঠভাবে হয়, কামনা করে মানুষ। কিন্তু মুনাফাখোর কালোবাজারীর দল মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এখানে। যে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ সুষ্ট বণ্টন আশা করেছিল তাও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। চোরাই চালানের অবাধ গতিরোধার চেকপোষ্টগুলি ঘুসের আড্ডা। হোম-গার্ডের দল সমাজ সেবার নামে আত্মসেবায় মত্ত। শুধু তাই নয়, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির মাধ্যমে এরাজ্যের বেশ কিছু নারী শিশু কিশোর কিশোরী আজ অধঃপতনের শেষ সীমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। জনজীবন তাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থা কালে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যে হাহাকার দেখা দেয়। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, খরার প্রকোপে সমস্ত ভারতবর্ষেই খাদ্যাভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষ প্রকৃত পক্ষে কৃষি নির্ভর। কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃষিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে শিল্পকে নিয়ে মাতামাতি সুরু হয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই। একরকম অবহেলিত হয়ে পড়ে কৃষি। কৃষির

উন্নতির জন্যে যেটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেটুকু যেন নেহাৎ না করলে নয় বলেই। ফলে খাদ্যের হাহাকার ওঠে ভারতবর্ষ জুড়ে।

পি, এল ৪৮০-র পসরা নিয়ে এগিয়ে আসে আমেরিকা। সুযোগে আঘাত হানতেও দেরি হয় না। হুঁশিয়ার করে। স্বাবলম্বী হতে উপদেশ দেয়। কৃষির প্রতি যত্নবান হয় ভারতবর্ষ। আজ অবশ্য সরকারী ঘোষণায় সবুজ বিপ্লব জয়যুক্ত। কিন্তু সবুজ বিপ্লব কি সত্যই বিপ্লব ঘটিয়েছে?

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাব সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন স্বার্থে। প্রফুল্ল সেনের কংগ্রেসী সরকার একসময় মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে নি। খাদ্যাভাবে গোমাংস ভোক্ষণের নজির পর্যন্ত তুলে ধরে পাণ্ডিত্য করেছিলেন তিনি। উপদেশ দিয়েছিলেন অখাদ্য কুখাদ্য সুখাদ্য ভক্ষণের। ভূখা মিছিলের ওপর নির্বিচারে চালিয়েছিলেন গুলি। আজীবন গান্ধীবাদী অহিংস নেতা নিরস্ত্র মানুষকে হাসি মুখে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। ফলে বিদায় নিতে দেরি হয়নি তাঁর। যাঁরা তাঁর বিদায়ের পর এসেছিলেন, খাদ্য সমস্যার সমাধান করা তাঁদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। কারণ হয়তো একাধিক, কিন্তু অন্যতম কারণ এরাজ্যের অসুস্থ খাদ্যনীতি। প্রশাসন ব্যবস্থার গলদ। অবাধ দুর্নীতি, কালোবাজারী। অন্যায় কারীদের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন। যে পারিস লুঠে নে ভাই।

অথচ প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ফলনের হার খুব খারাপ নয়। শুধুমাত্র সুষ্ঠ ব্যবস্থার অভাবে খাদ্যাভাবের হাহাকার। বাঙালীর সুস্থ চিন্তাশক্তিকে অসুস্থ করে রাখার চক্রান্ত। বাঙালীকে ভাতে মেরে রাখতে হবে।

বাঙালী দু-বেলা খেয়ে বাঁচতে পারে কয়েকটি উপায়ে। সুষ্ঠ বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ, আজন্মা, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার জন্যে সঞ্চয় ভাণ্ডার। অসাধু ব্যবসায়ী কালোবাজারী দমন। সীমান্তে কর্ডন এবং সজাগ দৃষ্টি রাখা।

খাদ্যের পর দারিদ্র। বাংলা ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। অথচ ব্রিটিশ-ভারতে তুলনামূলক ভাবে বাংলা ছিল সমৃদ্ধশালী। ১৯৬৭-৬৮ সালে চলতি দর হিসাবে মানুষের মাথা পিছু বার্ষিক আয় ছিল ৫৪৭ টাকা। ভারতবর্ষের মাথা পিছু গড় আয়ের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কম। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মাদ্রাজে পশ্চিমবঙ্গের আয়ের তুলনায় বেশি। প্রায় সমান সমান অন্ধ্র, আসাম, রাজস্থান। কম—উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, উড়িষ্যা বিহার ও মহীশূর। যদিও হিসাবটা ১৯৬৬-৬৭ সালের।

চার বছরে অন্যান্য রাজ্যের আয় বাড়লেও পশ্চিমবঙ্গের যে বাড়েনি এটা ঠিক। মাথা পিছু গড আয় বৃদ্ধি করতে হলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। উৎপাদন বৃদ্ধি হয় কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্প-ক্ষেত্রে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ স্তরেই থাকবে। একমাত্র উপায় শিল্পের প্রসার।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা ভয়াবহ। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এখানে জন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ কাজ করে, বাকি দুই তৃতীয়াংশ কোন কাজে নিযুক্ত নয়। এই ১,১৫,৮০,১৯৫ জনের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত ৬৬,৭৪,৯৪০ জন। এদের মধ্যে যাদের নিজস্ব জমি আছে, ৪৪,৫৮,৭৭৯। কৃষি মজুর ১৭,৭১,৭০৮ এবং অন্যান্য ৪,৪৪,৪৫৩। দশ বছর আগের হিসাব। দশ বছরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমস্যা সেই একই, কৃষিক্ষেত্রে বেকারি বেড়েছে কিন্তু জমি বাড়েনি।

বাকি কর্মীদের মধ্যে শিল্পে উৎপাদন কাজে নিযুক্ত মাত্র ১৩,১৯,১৬০ জন। বাকি অন্যান্য কাজে যারা নিযুক্ত তারাও প্রকৃত-পক্ষে কৃষি নির্ভর।

পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র, বেকারী দূর করতে হলে প্রয়োজন শিল্পের প্রসার। কিন্তু প্রসারের পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্র সঙ্কুচিত হচ্ছে। ধর্মঘট, লক আউট, স্থানান্তরিতকরণ যেমন, তেমনি

বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের দাবীকে নস্যাৎ করে শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া অবাঙ্গালী কর্মী নিয়োগ। অন্যান্য প্রদেশে স্থানীয় কর্মী নিয়োগ যেখানে একরকম বাধ্যতামূলক, সেখানে বাংলার শিল্পক্ষেত্রে বাঙ্গালী বেকার যুবকদের কোন দাবী নেই। বাঙ্গালী যুবকরা কর্মক্ষম হলেও কর্মক্ষমতা লাভের অধিকারী নয়, দর্শক মাত্র। বাংলা দেশে বাঙ্গালী অধিকারহারা।

অবশ্য দোষ শুধুমাত্র অবাঙ্গালী শিল্পপতিদের নয়, কেন্দ্রও সমান অপরাধে অপরাধী। কেন্দ্রীয় সরকারের বাধাদানই পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

অবাঙ্গালী শিল্পপতি বি, এম, বিড়লা প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রসারের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যতগুলি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, তার প্রায় সবগুলিই নামঞ্জুর করা হয়েছে।

বিড়লাজীর সাম্প্রতিক আচরণ, তাঁর স্বার্থসুষ্ট ব্যবসায়ীদের কূটবুদ্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছে। গোপনে এবং যোগসাজসে তিনি তাঁর কোলকাতাস্থিত হেড অফিসকে স্থানান্তরিত করে নতুনভাবে বেকার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, তিনি যে পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, এটা নিশ্চই মিথ্যা ভাষণ নয়?

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে বাধা সৃষ্টি করছে কেন?

মাঝারী শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটির শিল্প মূলধনের অভাবে প্রসার লাভ করতে পারছে না। কোন কোনটা অর্থ এবং কাঁচা মালের অভাবে বন্ধ হয়ে নতুন ভাবে বেকার সৃষ্টি করছে। রাজ্যসরকার যে সাহায্য করে শিল্পগুলিকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে তারও উপায় নেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার কোনদিনই পশ্চিমবঙ্গকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দেয়না। ইদানিং সি, আর, পি পোষার ব্যায়ভার বহন করতে করতে তার লাভের গুড় সবই প্রায় পিঁপড়েয় খেয়ে

যাওয়ার মত অবস্থা। রাজ্যপালের শাসনে কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামো আজ গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগে নিযুক্ত।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ, তার চতুর্থ পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্যের জন্যে যে বরাদ্দ করা হয়েছে তাতেই সুস্পষ্ট। মাথাপিছু গড় বরাদ্দ যেখানে পঞ্জাবে ২৪৬ টাকা, গুজরাটে ২১৮ টাকা, মহারাষ্ট্রে ২০৫ টাকা, হরিয়ানায় ২৫০ টাকা, সেখানে অভাগা পশ্চিমবঙ্গে ৯১'৮ টাকা মাত্র।

কেন? কেন এই অন্যায় আচরণ?

কোন্ অপরাধে পশ্চিমবঙ্গ মার খাচ্ছে দিনের পর দিন?

ঠিক অপরাধ হয়তো নয়, কারণটাও অস্পষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি পরিষ্কার। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে গেলে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাটের মত হিন্দী এলাকার স্বার্থ ব্যহত হবে। বাংলাদেশ আজ অস্তিত্বহারা। খণ্ড বাংলার জনবল আজ ক্ষীণ। কংগ্রেসী শাসনের দীর্ঘ কুড়ি বছরে বাঙ্গালী শাসকের দল আপন স্বার্থ এবং দল বজায় রেখে গেছেন। বাংলার নিজস্ব দাবী, পক্ষপাত-দুষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করতে সাহসী হননি। অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করার চেষ্টা বিধান রায় যেটুকু করেছিলেন তাও শেষ করতে চেষ্টা করেছেন অপগণ্ডের দল। আজ কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পশ্চিম ভারতের ওপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে বলি দিয়ে এতগুলি রাজ্যের বিপুল জন সমর্থন তাঁদের বাঁচার মন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ সেখানে মরুক অথবা বাঁচুক, কি এসে যায় তাতে তাঁদের?

কিন্তু হাতছাড়া যাতে না হয় সেদিকে কেন্দ্রের সজাগ দৃষ্টি। খণ্ড বাংলা আজও যে ভারতের দৃষ্টি-প্রদীপ, একটু মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে সমগ্র ভারত। সেই জন্যেই বাংলা যাতে মাথা তুলতে না পারে, বাংলা যাতে ভরাপেট খেতে না পায়, বাংলার প্রাণশক্তি, যুব সম্প্রদায়

যাতে বাঁচার মন্ত্র খুঁজে না পায় তার জন্যে ষড়যন্ত্রের বিরাম নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও বাংলার অন্যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ মিলেটারী আর সি, আর, পির দল। চলে বাংলাকে খতম করার অভিযান।

তবু বাংলা শেষ হয়নি। হচ্ছেনা।

আকাশে দেখা দিয়েছে কালো মেঘের ইসারা।

ঝড়?

না। বর্ষণধারাও সুরু হবেনা। মেঘও নয়, নামছে রাত্রি। সূর্যদয়ের পথ কতদূর?

চাকরীটা পেয়েছে বিনোদ। কারো সুপারিশে নয়, নিজের ভাগ্য অথবা যোগ্যতা বলেই সে চাকরীটা পেয়েছে।

বছর দেড়েক আগে তার সেই চাকরীর জন্যে দেখা করতে আসবার দিন ট্রেন ছিল সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা লেট। দুষ্কৃতকারীর দল ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল তার কেটে নিয়ে। দেড় বছর আগে সেদিনটা ছিল রবিবার। হাতে অনেক সময় নিয়েই বেরিয়েছিল সে। দেরি বেশ কিছুটা হয়েছিল। স্কুলটা খুঁজে নিয়ে অপরাধীর মতই গেট পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিল সেদিন। পরিচয় পেয়ে বুড়ো দারোয়ানটা অবশ্য অভয় দিয়ে বলেছিল, আপনার জন্যেই বাবুরা অপেক্ষা করছেন বাবু। আমি চা দিতে গিয়ে শুনে এসেছি গাড়ি বন্ধর কথা বলছেন।

পায়ে পায়ে অফিস ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

নিজের পরিচয় জানাবার আগেই শুনেছিল সাদর আহ্বান। এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আসুন, বসুন।

—নমস্কার, পরিচয় বিনিময়ের পর আসন গ্রহণ করেছিল বিনোদ। বলেছিল, আমার ভীষণ দেরি হয়ে গেল।

আহ্বানকারী ভদ্রলোক বলেছিলেন, দেরি সত্যিই হয়েছে। ট্রেন যদি আজ স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতো আমরা আপনার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতাম না। অবশ্য একথাও আমরা ভেবেছি, আপনি বোধ হয় আসবেন না।

বিনোদ বলেছিল, আমি অনেকটা সময় হাতে নিয়েই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু···

হাসিমুখে বাধা দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আপনার কিন্তু হওয়ার প্রয়োজন নেই। সময় এবং প্রয়োজনের কোন মূল্য নেই এখন। ট্রেন চলাচল না করলেই স্বাভাবিক, চলাটাই স্বাভাবিক নয়। ছ'টার গাড়ি যদি ন'টায় যায় সেটাও স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে হবে। চলছে তো?

অন্য এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, দুদিন বাদ-বাদ এভাবে তার কাটে, হৈ-হুজ্জুত করে, যদি বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে চলবে কি করে বল?

—তাহলে যারা তার কাটে বা কথায় কথায় ট্রেন বন্ধ করে, দোষটা তাদেরই শুধু?

—আমি তাই কি বলছি?

—তুমি বলবেটা কি শুনি? তোমার বলার মত কিছু থাকলে তো বলবে? তার যারা কাটে তাদের গুলি করে মারা উচিৎ। কিন্তু গুলি করে মারবে কে? কিন্তু কর্তৃপক্ষের দোষে যাত্রীদের দুর্গতির সীমা থাকে না যেখানে, সেখানে কি হবে? ষ্টেসনে ষ্টেসনে কমপ্লেন বুক আছে। তুমি দেখাতে পারো, অভিযোগ করেও কোন ফল

হয়েছে? প্রতিকারের আবেদন জানিয়েও যখন প্রতিকার হয় না, মানুষ তখনই নিজেরা এগিয়ে যায়।

—কিন্তু ট্রেন বন্ধ করে, ষ্টেসন তছনছ করলেই কি প্রতিকার হয়? অথবা ষ্টেসনমাষ্টার, গার্ড অথবা ড্রাইভারকে মারধোর করলে?

—প্রতিকার কোন্ পথে হয় একটু বাত্‌লে দাও না ভাই?

—তোমার পথটা ঠিক নয়।

—ঠিক পথটাই তো আমি জানতে চাইছি?

—হিংসার পথে কিছু হয় না।

—কিন্তু হয় কোন্ পথে? সেই পথটাই তো বিক্ষুব্ধ যাত্রীরা দিনের পর দিন জানতে চেয়েছেন। আবেদন নিবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু প্রতিকার কিছু হয়নি। শেষকালে···

—তোমার যুক্তিটা সমর্থন যোগ্য নয়।

—আমি তা জানি। জানেন বিক্ষুব্ধ যাত্রীদের অনেকেই। ক্ষতি দেশের, জাতির। তাদের ব্যর্থ ক্রোধে জাতীয় সম্পত্তিই নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নষ্ট হচ্ছে কাদের জন্যে? মূলে কি যাত্রীরা? মাসখানেক আগে সাড়ে সাতটার সময় মেয়ের বাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার জন্যে ট্রেন ধরতে এসে মাইকের ঘোষণা শুনতে পেলাম, ইলেকট্রিক ফেল হওয়ার জন্যে আপ এবং ডাউন ট্রেন আসতে এবং ছাড়তে দেরি হবে। সাড়ে নটার সময় শুনলাম অত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে অমুক এক্সপ্রেস ছাড়ছে, অমুক ষ্টেশন পর্যন্ত দাঁড়াবে—সেখান থেকে লোকাল ট্রেন পাওয়া যাবে। ছোট্ ছোট্। আমার পক্ষে সে গাড়িতে ওঠা সম্ভব হয়নি। ঝুলতে লাগলো ষ্টেসনে জমা হওয়া মানুষের অতি সামান্য একটা অংশ। দশটা থেকে মাইকের ঘোষণার কাজ বন্ধ। সাড়ে এগারোটায় সে গাড়ি ছাড়লো। তারপর রাত্রি আড়াইটেতে। আমি বুড়ো মানুষ চুপচাপ বসে আছি। কয়েক হাজার মানুষ, শিশু বৃদ্ধ সব আছে। খাবার জন্যে ছটফট করছে। ক্যাটারিং বন্ধ, বন্ধ কফিকর্ণার। কিছু নেই ষ্টেসনের চায়ের ষ্টলগুলোতে। একটু জলের

নিয়েও কাড়াকাড়ি। এবার বলতো, সেই প্রতীক্ষারত ক্ষুধার্ত মানুষের দল যদি অধৈর্যের পরিচয় দিত, তাহলে বড় অপরাধী হয়ে উঠতো? সব কিছুর দায়িত্বে হাজার দুহাজারী হয়ে যারা বসে আছেন ষ্টেসনেই, তাঁদের কর্তব্য কি? নিয়ম মাফিক সব কিছুই বন্ধ করে দেওয়া? তাঁদের ইচ্ছাকৃত অযোগ্যতা কিছু নয়, যাত্রীদের ধৈর্য্যের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে ষ্টেসনের কুলির হাতে লাঠি তুলে দেবেন, নিয়ে আসবেন পুলিশ? নাম কিনবেন যোগ্য পরিচালক বলে? চাই কি, কোনদিন হয়তো কাগজে দেখতে পাবে কোন কৃতী পরিচালকের নাম। কৃত্তিত্বের পরিচয়ে লেখা থাকবে সন তারিখ দিয়ে সংখ্যার হিসাবে মানুষ পেটানোর কথা। পেটানো হয়েছে কাদের? শিশু, নারী, অতিবৃদ্ধ, রোগী, গর্ভবতী, বালক, কিশোর যুবা। সকলেই দুষ্কৃতকারী। সুকর্ম করেছেন কেবল তিন হাজারী মাস মাইনের পরিচালক।

বিনোদ চুপ করে বসে বসে শুনছিল। তিনি থামতে হেডমাষ্টারমশাই বলেছিলেন, এবার একটু.........

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বলেছিলেন, হ্যাঁ মাষ্টারমশাই এবার কথাবার্তা আরম্ভ করা যাক। আমি শুধু আমার বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দোষ শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের নয়। সাধারণ মানুষকে দোষী করে তোলা হচ্ছে। অন্যায়কারী একটা ক্ষুদ্র অংশ সব সময়ই সুযোগ সন্ধানী। সাধারণ মানুষ শান্তি চায়। সুষ্ঠু জীবন যাত্রা সকলেই কামনা করে। কিন্তু.........

সুরু হয়েছিল আলোচনা। বিনোদ তার সার্টিফিকেটগুলো দেখিয়েছিল। দ্বিতীয় বিভাগে এম, এস, সি পাশ করা ছাত্র। বি, এস, সি পাশ করার পর চাকরীর চেষ্টা কম করেনি। এম, এস, সিতে ভর্তি হয়েছিল মামামার উৎসাহে। বলেছিলেন, চুপ চাপ বসে থেকনা বিনোদ। কাজ একদিন না একদিন ঠিকই পাবে। লেখাপড়াটা ছেড় না।

ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে বিনোদ সেদিন বলেছিল, কিন্তু লেখাপড়া

যে করবো তার জন্যে পয়সা চাইতো। কাগজ বিক্রী বন্ধ। কটা টিউশানির ওপর নির্ভর করে লেখাপড়া চালানো আর সম্ভব নয়।

—অসম্ভবটা কোথায় শুনি? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

অসম্ভবটা যে কোথায় তা যেমন বিনোদ নিজে জানতো, তিনিও জানতেন। মাস কাবারের খোরাকীর টাকা দেওয়া সব সময় সম্ভব হয়ে উঠতো না তাঁর পক্ষে। অসম্ভবকে সম্ভব করতেন তিনিই। কেন করতেন তা একমাত্র তিনিই জানতেন। দয়া? চিন্তা যে সে না করেছে তা নয়। কিন্তু মনে হলেও মুখে প্রকাশ করতে পারেনি।

মামীমার ছেলে বলতেন, জানিস বিনোদ আমাকে নিয়ে ব্যর্থ আশাটা মা তোকে দিয়েই পূরণ করতে চায়।

অবাক বিনোদ প্রশ্ন করতো, সেটা কি?

—আমার লেখাপড়া হয়নি। অল্প বয়েসে আমি বখে গিয়েছিলুম। বড্ড বেশি পয়সা চিনে ফেলেছিলুম অল্প বয়েসে। পরিবেশ আমাকে, পয়সার বিনিময়ে যে জীবন, সেই দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমার আর একটা ভাই থাকলে মা হয়তো তাকে নিয়েই এক্সপেরিমেন্ট চালাতো। কিন্তু.........হেসে ফেলেছিল সে। বলেছিল, আমার কথা যদি শুনিস, মওকা ছাড়িস না।

—মওকা? আশ্চর্য হয়েছিল বিনোদ।

—মওকারে মওকা, গোদা বাংলায় যাকে বলে সুযোগ। সুযোগ সকলের আসেনা। আর আমি নিজে লেখা-পড়া না শিখলেও আমিও চাই তুই আরো পড়াশুনা কর।

সুযোগ? হ্যাঁ, সে তার জীবনে অনেক সুযোগ পেয়েছে। বার বার সুযোগ এসেছে তার জীবনে। সুযোগ গ্রহণ করেছে সে। চেষ্টা করে গেছে দিনের পর দিন। আশা আকাঙ্খা জেগেছে মনে, স্বপ্ন দেখেছে। আবার নিরাশায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে মন। ব্যর্থতা গ্লানি, হাহাকার। বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে চেয়েছে বুকে।

শিক্ষা। পড়াশুনা করো, পাশ করো। বসে থাকো দিনের পর দিনের। ব্যর্থতার গ্লানিতে যখন মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে তখনও উত্তর মিলবে না, কেন পড়াশুনা করলাম। কিসের জন্যে এতগুলো দিন মাস বছরের হিসাবে সময় নষ্ট করলাম। অর্থ-পরিশ্রম।

আশা জাগিয়েছেন মামীমা। কিছুই ব্যর্থ হয়না। প্রতিদান ঠিকই পাওয়া যায়।

যায় কি?

বিনোদ নিজে পেয়েছে? অথবা অসংখ্য বিনোদ?

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন কেন? 'মোষ্ট অবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট' হওয়ার জন্যে? অন্তরের আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি লাভের জন্যে নয়?

একদিন জীবনের জন্যেই প্রয়োজন ছিল শিক্ষার। আজ জীবিকার জন্যে। কিন্তু শিক্ষা লাভ হয়, জীবিকার সন্ধান মেলেনা।

কেন মেলেনা? কেন সম্ভব হচ্ছেনা? জীবন অথবা জীবিকার জন্যে যে শিক্ষা, কেন আজ তা পণ্যমূল্যে বিকোচ্ছে?

রেল কর্তৃপক্ষের সমালোচনাকারী কমিটি মেম্বার ভদ্রলোক কথা বলেছিলেন। হেডমাষ্টার মশাই যখন জানিয়েছিলেন, বিনোদকে তাঁর প্রশ্ন করার মত কিছু নেই, তখন তিনি বলেছিলেন, বিনোদবাবু, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমি কটি প্রশ্ন করবো আপনাকে?

বিনোদ বলেছিল, বেশতো, জিজ্ঞাসা করুন।

তিনি বলেছিলেন, দেখুন, যে কটি প্রশ্ন আমি আপনাকে কোরবো তা হয়তো ব্যক্তিগত। কিন্তু করতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণেই, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপেই গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম একদিন। কিন্তু……

বিনোদ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ভাবতে চেষ্টা করেছিল, তিনি কি বলতে চান।

—আপনি বরাবর শিক্ষকতাই করবেন ?

—কেন ?

—স্কুলটা প্রায় বাইশ বছর হল। আগে যে সমস্ত মাষ্টার-মশাইরা এসেছিলেন তাঁদের দু-তিন জন ছাড়া সকলেই চলে গেছেন।

—কোথায় গেছেন তাঁরা ?

—অন্য স্কুলে।

—কেন ?

—সুযোগ সুবিধার জন্যে।

—আপনি কি বলতে চান ভাল সুযোগ-সুবিধা পেলেও আমি যেতে পারবো না ?

—নিশ্চই পারবেন। সেখানে আমাদের বাধা দেওয়ার কিছু থাকতে পারে না। আর আমাদের বাধা আপনি মানবেন কেন অথবা আমরা বাধা দেবই বা কেন ?

—তাহলে ?

—আমার কথায় আপনি দুঃখ করবেন না বিনোদবাবু। আমি দুঃখ দেওয়ার জন্যে এ কথাগুলো বলছি না। এ স্কুলের এক একখানা করে ইট আমরা গেঁথে তুলেছি। হেডমাষ্টার মশাইয়ের অপমানের চ্যালেঞ্জ আমরা নিয়েছিলাম। আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, বিদ্যালয় কেনা বেচার হাট নয়।

অন্য একটি স্কুলের সাধারণ শিক্ষক ছিলেন হেডমাষ্টার মশাই। আদর্শ শিক্ষক ছিলেন তিনি। কিন্তু আদর্শ রক্ষা করে সেখানে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিরোধ বেধেছিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। অপমানিত হয়ে স্কুল ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল তাঁকে। ফলে স্থানীয় শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন বিদ্যালয়টি।

কিন্তু ভদ্রলোকের কথাগুলোর মর্মার্থ অনুধাবন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি কেন যে ওসব কথাগুলো বলছিলেন, বুঝতে পারেনি সে।

তিনি বলেছিলেন, দেখুন, আমাদের জীবনের একটা আদর্শ থাকে। ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখি আমরা। কিন্তু উচ্চাশার পরিণতি লাভ সব সময় আমাদের সম্ভব হয়ে ওঠে না। যে ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন দেখেছিল, সে হয় কেরাণী, যে চেয়েছিল বিজ্ঞানী হতে সে হয় সেলস্‌ম্যান। জীবিকার সন্ধানে ছুটে বেড়াই আমরা। আজ তিন বছরের মধ্যে কম করেও জনা-কুড়ি তরুণ মাষ্টার, কেউ ব্যাঙ্কের চাকুরীতে যোগ দিয়েছেন, কেউ-বা শিক্ষকের মাইনের চেয়েও বেশি মাইনের চাকুরীতে। তাঁদের বিরুদ্ধে খুব একটা বড় অভিযোগ আমরা হয়তো করতে পারি না। কারণ, সকলেই চান অবস্থার পরিবর্তন। অর্থের জন্যে আদর্শচ্যুত হতে বাধ্য হন তাঁরা। হয়তো বা······

তিনি চুপ করেছিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর বলেছিলেন, বিনোদবাবু, আমাদের স্কুলের শিক্ষার মান অনেকটা নেমে গেছে।

—কেন ?

—যাঁরা জীবিকার মাধ্যম হিসাবে শিক্ষকতাকে গ্রহণ করেছিলেন, সব সময় চেষ্টা করে গেছেন একটা ভাল চাকুরীর। তাঁরা শুধু ডিউটি বজায় করে গেছেন মাস মাইনের জন্যে।

—অভিযোগ ?

—অভিযোগ। বিনোদের তীক্ষ্ণ প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলেছিলেন তিনি। মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অসংখ্য।

—প্রতিকারের উপায়ও তো ছিল আপনাদের হাতে ?

—আমরা চেষ্টা করেছি অনেক। আর······

—বলুন ?

—ভবিষ্যতের জন্তে সাবধান হয়েছি।

—উচ্চাশা আমারও কিছু কম নেই।

—আপনি……

—মাষ্টারীর খাতায় নাম লিখিয়ে জীবনটাকে পার করে দেবো বলেই স্থির করেছি অনেকদিন আগেই।

চারজন শিক্ষক নেওয়া হয়েছিল সেদিন। বিনোদ তার মধ্যে একজন। এসেছিল দশজন।

সহজভাবেই আলাপ জমে উঠেছিল তারপর। ঘড়ির কাঁটা একটার ঘর ছুঁই ছুঁই করতে উঠে পড়েছিলেন সকলে। স্নানাহারের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন তাঁরা। বিনোদ রাজি হয়নি। কলকাতার মেসে যখন ফিরে এসেছিল ঘড়ির কাঁটা তখন চারটের ঘর ছুঁই ছুঁই।

চাকরী হওয়ার পর একমাস কলকাতা থেকে যাতায়াত করেছিল সে। মাষ্টার মশাইয়ের একান্ত বাধ্য ছাত্র কমলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। প্রায় সমবয়েসী। হিন্দুস্থান মোটরে চাকুরী করে। ছোট সংসার। মা, একভাই, বছর বারোর একটা বোন। ডাকা বুকো ছেলে। ভয়ডর নেই। যা বলে, মুখের ওপরে। মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে একবিন্দু ইতস্ততঃ করেনা। চেষ্টা করে ঘর জোগাড় করে দিয়েছিল। গুছিয়ে দিয়েছিল বিনোদের সংসার। ব্যবস্থা করে দিয়েছিল খাওয়া দাওয়ার।

বলেছিল, মাষ্টার, বেশিদিন বাইরের খাবার খেলে শুধু অরুচি নয়, শরীর নষ্ট হবে। এবার একটা বে-থা করো। বলতো যোগাযোগ করি।

বিনোদ বলেছিল, তোমার নিজেরটাও করো?

কপালে করাঘাত করেছিল কমল। বলেছিল, ছুটো বোনের বিয়ে দিয়েছি। এটার দিয়ে করবো নিজে।

—তোমার বোনতো এখন ছোট।

—ছোট বড় হতে বেশি দেরি হবে না। বছর দুই পরে বিয়ের বাদ্য বাজাবার ইচ্ছা আছে। আশা, সেই সঙ্গে নিজেরটাও।

—এখন বাধাটা কোথায়?

—এই এখানে। নিজের বুকে হাত দিয়েছিল সে। বলেছিল, এখন টেঁপি অন্ত প্রাণ। হা টেঁপি জো টেঁপি। দুদিন কোথাও গেলে চোখে অন্ধকার দেখি। বউ হলে ওই টেঁপিই হবে হয়তো চক্ষুশূল।

—একথা বলছো কেন?

—বলছি অনেক দুঃখে ভাই। হেসেছিল কমল। এখন টেঁপির ভবিষ্যৎ ভাবছি। ওকে ভাল ঘরে বিয়ে দিতে হবে। চেষ্টার কোন ত্রুটি করবো না। তখন নিজের ভবিষ্যৎ ভাববো। সংসারে স্ত্রী পুত্রের চেয়ে আপন কে বল? ক্ষুদ্র স্বার্থ কর্তব্য ভোলায়। টেঁপিকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেব।

—ভাগ্যকে অস্বীকার করো তুমি?

—তা হয়তো করিনা। কিন্তু ভাগ্যটাইতো সব নয় মাষ্টার। মানুষের চেষ্টারও যে একটা মূল্য আছে, এটা অস্বীকার করি কেমন করে?

—মূল্য কি সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য?

—তাও হয়তো নয়। তবু মানুষের জীবনের ধর্ম পালন করতে হবে বৈকি।

—এ যে দার্শনিক তথ্য।

—জীবন দর্শনও বলতে পারো। দর্শন করে করেই শিখেছি। ঠেকে শেখার লোভ সংবরণ করেছি। অতএব…

—তাহলে তুমি এখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছো না?

—উপস্থিত তেমন কোন পরিকল্পনা নেই। তবে…

—তবে?

কমল সহসা কোন উত্তর দেয়নি। একটু চুপ করে থেকে একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, বয়েসটা যদি বছর বারো চৌদ্দ কম হোত তাহলে নাহয় একবার প্রেম-প্রেম খেলাটা জমিয়ে খেলে নিতুম।

—কি করে?

—জাননা?

—নাতো। সরলভাবেই স্বীকারোক্তি করেছিল বিনোদ।

কমল বলেছিল, তুমি মাষ্টার, গুড্ বয়। বাংলায় যাকে বলে, ভাল ছেলে। বলি, বয়েস কালে হিন্দী ছবি-টবি দেখতে?

—আমি সিনেমা বড় একটা দেখিনা।

—দেখবে মাষ্টার। এক-আধখানা হিন্দী ছবি মাঝে মধ্যে দেখবে। নাহলে জীবনটা সেই শুষ্কং-কাষ্ঠং হয়ে উঠবে। জীবনের অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে। তোমার শরীর অভ্যন্তরের ষড় রিপু জেগে উঠবে। মনে হবে তুমি বেঁচে আছ।

চায়ের দোকান নয়, মুদির দোকানে বিকালে কাজ থেকে ফেরার পর প্রায়দিনই আড্ডা দেয় কমল। ওদের বাড়ির কাছেই দোকানটা। বলাই সাধুখাঁর মুদি দোকান। তিনপুরুষের দোকান। লম্বা হলঘর। এক সময় থরে থরে মাল সাজানো থাকতো বস্তা বস্তা। এখন সামান্য জিনিষের বেসাতি। সে দিন আর নেই। একটার জায়গায় এখন দশখানা নতুন দোকান হয়েছে। বলাই সাধুখাঁ একটা পেটের জন্যে পুরানো ব্যবসাই আঁকড়ে ধরে আছে। বলে, বউ নেই, ছেলে নেই, কি হবে ব্যবসা বাড়িয়ে। যেমন চলছে চলুক।

সমস্ত দিন কেনা-বেচা করে বলাই সাধুখাঁ। বিকাল হতে না হতেই সুরু হয় উসখুশ। ঘন ঘন ঘড়ি দেখা। সন্ধ্যের আগেই দু-একজন করে জমা হয়। কোনদিন তাস, অথবা দাবা। খেলায় বলাই সাধুখাঁও একজন। খদ্দের এলে ফেরেনা। বিক্রেতা তখন খেলোয়াড়রা সবাই।

যারা খেলে আর যারা বসে দেখে সকলেই মুখর। একদল

তাসের কল দেয়, আর একদল আলোচনায় মাতে। বিষয় বস্তুর অভাব কোন দিনই হয় না। জমে ওঠে তর্ক।

কমল জোর-জার করে বিনোদকে ধরে নিয়ে গেছে কদিন। বলেছে, তুমি প্রাইভেট টিউশানি করবে না, কোন আড্ডায়ও যোগ দেবেনা তাতো হতে পারে না। রোজ না হয়, দু-একদিন এসো। বলাইদার দোকানে পরনিন্দা পরচর্চা চলে না। তেমনি বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ।

একরকম জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কমল। বলাই সাধুখাঁ সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল তাকে। আলাপ হয়েছিল আরো কজনের সঙ্গেও। সকলেই প্রায় কমলের সমবয়েসী। অন্তরঙ্গতা জমে উঠতে খুব বেশি দেরি হয়নি। আর বিনোদ আবিষ্কার করেছিল, দোকানটায় শুধুমাত্র তাস দাবার আকর্ষণে কমলের দল প্রতিদিন যায়না, যাওয়ার অন্য কারণও আছে। সেটা প্রায়দিনই বলাই সাধুখাঁর এটা ওটা রেঁধে খাওয়ানো। মানুষটার যুক্তি, কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা হলে, একজনের জন্যে রেঁধে আনন্দ কোথায়?

বলাই সাধুখাঁ সেদিন বাধা দিয়ে বলেছিল, কোথায় তোর পেরেম আর কোথায় হিন্দী সিনেমা। তোর ব্যাপারটা কি বলতো কমল?

মুচকি হেসেছিল কমল। বলেছিল, হিন্দী সিনেমা আর তোমার পেরেম নয় বলাই দা, প্রেম একই সুতোয় গাঁথা। হিন্দী সিনেমা দেখলে প্রেম শেখা যায়।

—বলিস কিরে? আঁতকে উঠেছিল বলাই সাধুখাঁ।

—যা সত্যি তাই বলছি। তুমি যদি হিন্দী বই দেখতে তাহলে তুমিও আমার কথাই বলতে।

—কেন, বাংলা বইয়ে প্রেম থাকেনা?

—কেন থাকবে না। নিশ্চই থাকে। কিন্তু যা থাকে তা জোলো, বুঝলে? টগবগে প্রেম হিন্দী বইতে। বাংলা বইতে নায়ক যদি নায়িকার হাত ধরে, হিন্দী বইয়ের নায়ক কোমর জড়িয়ে ধরে সামনে

টেনে নেয়। এটা যদি নায়িকার আঁচল ধরে টানে তো ওটা নায়িকার ব্লাউজের ভেতরের অন্তর্বাস দেখতে চায়। জাপ্টা-জাপ্টি, ল্যাপ্টা-লো প্ট সব পাবে। পাবে প্রায় নগ্ন নতর্কীর ভারত-নাট্যম। পাবে হঠাৎ জলে পড়ে যাওয়া নায়িকার ভেজা দেহ। পনেরো মিনিটে ধরে কলেজ হোষ্টেলের মেয়েদের নাচতে-নাচতে গাইতে-গাইতে শলোয়ার পরা হা-ডু-ডু খেলা। মার পিট দাঙ্গা। ভারত-নারীর আদর্শ-প্রচার। ধনী গরীবের ভেদাভেদ লোপ। মূলে প্রেম। মুহব্বতকে লিয়ে সব কুছ হো সকতা। সব প্রেমের জন্যে।

বলাই সাধুখাঁ বলেছিল, ভালবাসার অভাবেই তো এই বিরোধ রে।

—তা বৈকি। যেন ধমকে উঠেছিল কমল। বুড়ো বয়েসে এমন কথা তুমি বলবে না তো বলবে কে ?

—বলে অন্যায় করলাম নাকি ?

—ক্ষেপেছো, তাই কি বলতে পারি। কিন্তু হচ্ছেটা কি জানো ?

—কি হচ্ছে ?

—অকালপক্ক হয়ে যাচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা। এসব ছবি মা বাবা ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বসে দেখতে পারে না। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। নায়িকার প্রায় নগ্ন স্নানের দৃশ্য পর্যন্ত সর্ব্বসাধারণের প্রদর্শনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কি করে হয়, কেন হয় বলতো ?

—কি করে জানবো ?

—হিন্দীর প্রচার হচ্ছে, প্রসার ঘটছে। সেন্সার বোর্ড বলে যা আছে তার সদস্যের দল বিকারগ্রস্থ। হিন্দী ছবির কপালে ইউনিভার্সাল ছাপ মারতে এতটুকু দ্বিধা করেন না তাঁরা। হিন্দী ছবির প্রভাবে আজ দেশের ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ব্যাভিচারের বীজ বপন করছে কচি মনে, ক্ষতি করছে সমাজের ।

—এ তোর মিথ্যা অভিযোগ। প্রতিবাদ জানিয়েছিল বলাই সাধুখাঁ।

—মিথ্যা নয় অভিযোগ। আমি অভিযোগ করছি। যদিও জানি আমার এ অভিযোগ মূল্যহীন না হলেও এর প্রতিকার হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রতিকার করার ক্ষমতা যাঁদের করায়ত্ত তাঁরা প্ল্যান করে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুস্থ সবল চিন্তাধারাকে বিকৃত, বিপথগামী করে তুলছেন। মুনাফাখোর কালোবাজারীর দল কালো টাকার জোরে সরকারী সমর্থনে বিকৃত চিন্তাধারার অধিকারী করে তুলতে চাইছে মানুষকে। একমাত্র যুক্তি, আনন্দ। আনন্দদানের উদ্দেশেই ছবি। জীবনের সমস্যাসঙ্কুল দিন যাপনের গ্লানি-মুক্ত করতে চাইছে মনকে। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

ক্ষণিক নীরবতা। এক সময় ধীরে ধীরে সাধুখাঁ বলেছিল, ভালর প্রচেষ্টা কি কিছু হবে না?

—হয়না যে তা নয়, হয়। কিন্তু ব্যবসাদারী মনবৃত্তির প্রাধান্য যেখানে সর্বগ্রাসী সেখানে ভালর মূল্য কোথায়? রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়া ভাল হিন্দী ছবিও মুক্তির পথ পায় না। ব্যবসাদারের দল সেখানে একচ্ছত্র অধিপতি। ছবির ব্যবসায় তাঁরাই সব। ছবির বাইরে যে চিন্তা, সেখানে সরকারের ব্যবহারে ক্ষোভের অন্ত নেই তাঁদের মনে। আছে প্রাদেশিকতার গাত্রদাহ।

—সেটা আবার কি?

—পৃথিবীর চলচ্চিত্র আজ উন্নতির সোপান-শ্রেণী একের পর এক অতিক্রম করে চলেছে। যোগ্য পরিচালক, যোগ্য চলচ্চিত্র, বিচারকদের বিচারে হচ্ছে পুরস্কৃত। সে সম্মান দেশের-জাতির সাংস্কৃতির অগ্রগতির স্বীকৃতি। বিশ্বসমাজে ভারত-সাংস্কৃতির সার্থক রূপকার সত্যজিৎ রায়। সার্থক জীবন-শিল্পী তিনি। তাঁর ছবির প্রাপ্য সম্মান দেশের, জাতির—শুধু বাঙ্গালী অথবা বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের। কিন্তু হিন্দীওয়ালাদের বিচারে তিনি ভারতের

প্রকৃত রূপকে বিকৃত করেছেন। ভারত-সাংস্কৃতির প্রকৃত রূপ, তাঁদের সৃষ্ট আঠারোখানা গান, বারোখানা নাচ আর নায়ক-নায়িকার শরীর নিয়ে খামচাখামচিতে। সেই সঙ্গে অর্ধনগ্না নায়িকাকে ভারতের আদর্শ নারী বলে সদম্ভ ঘোষণা।

কমলের কথা শুনে হেসে ফেলেছিল বিনোদ। বলেছিল, আজ তোমার কি হয়েছে বলতো ?

—তুমিই বল না ? পাল্টা প্রশ্ন করেছিল কমল।

—গণৎকার হলে বলতে পারতাম। তেমনি হাসি মুখেই জবাব দিয়েছিল সে।

কমল বলেছিল, হাসছো, হাসো। হাসতে সকলে পারে না। আমার কথাগুলো সামান্য বলে উড়িয়ে দিতে চাও—দাও। কিন্তু আমি যা বললাম তার একটি বিন্দুও মিথ্যা নয়। আমার লজ্জা করে মাষ্টার। আমরা নাকি সমান অধিকারে অধিকারী। কিন্তু কোথায় ?

—হিন্দী ছবিতে। যেন রসিকতা করেছিল বলাই সাধুখাঁ।

—তোমার কথাটা মিথ্যা নয় বলাই দা। হিন্দী ছবির নায়িকাদের শরীরের আবেদন সার্ব্বজনীন। নাভী বারকরা একদল অর্ধনগ্না নর্ত্তকীর আবেদনও সার্ব্বজনীন। আর এই সার্ব্বজনীন আবেদনের পসরা নিয়ে ভারতীয় জুরীর দল বিদেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে ভারত সাংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে দ্বিধা করেন না, তাঁদের অভিনীত 'বাহাদুর কা খেল'-এর মাধ্যমে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে বিদেশে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় ছাত্ররা। হিন্দী ছবির আউটডোরে বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর, মন্ত্রীদের বিদেশ ভ্রমণ আটকায় না। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আসেনা অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

কমল থামতে বলাইদা বলেছিল, তোর কথা বাপু কিছু বুঝতে পারছিনা।

—না বোঝবার মতো কিছু বললাম নাকি ?

—শুধু কি হিন্দী ছবিই সমাজের ক্ষতি করছে ?

—আমি কি তাই বলেছি ?

—তোদের বাংলা ছবি, সাহিত্যও কি কম ক্ষতি করছে না ?

—করছে। ক্ষতি করছে ইংরেজী নাইট পিকচার আর স্পাই পিকচারগুলো। তবে সাহিত্যের মধ্যে আপত্তিকর ব্যাপারে মাঝে মাঝে সোরগোল ওঠে। প্রতিবাদীর দল কেস করেন আদালতে। সুরু হয় সাহিত্যের শ্লীল অশ্লীলের বিচার। কিন্তু আমার মনে হয়, সাহিত্যের দর্পণে যদি সমাজের গোপন সত্য অথবা সমাজে যার অবাধ বিচরণ, সাহিত্যে তার প্রবেশ নিষেধের পরোয়ানা জারি করার চেষ্টা চলে তাহলে সাহিত্য থাকবে অসম্পূর্ণ। সত্যের প্রকাশ সিদ্ধ। অসত্যের প্রকাশ শুধু অন্যায় নয়, পাপ। জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য, জীবনকে বিপথগামী করার অপচেষ্টা কঠিন ভাবে রোধকরা উচিৎ।

—কে করবে, তুই ?

—তুমি আমি, আমাদেরই করতে হবে।

—কি করে করবি শুনি ?

—তাইতো ভাবছি। অশ্লীলতায় দিন দিন চারিদিক ভরে উঠছে। পথে ঘাটে অশ্লীল বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। ভাই বোনে পাশাপাশি পথ চললেও শুনতে হয় কটূক্তি। নিরালা পার্কে চলে তরুণ তরুণীর অবাধ প্রেম। অবশ্য প্রকাশ্য চুম্বন দেখে এসেছি দিল্লী, বম্বের রেষ্টুরেন্টে। দেখেছি সামান্য অর্থের বিনিময়ে নগ্ন ছবির প্রদর্শনী। ইঙ্গ-ভারতীয় ভাবধারা বাংলাদেশে যদিও উচ্চবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু গোপন ব্যাভিচারের আক্রমণও সাধারণের মধ্যে সুরু হয়ে গেছে। যত দিন যাচ্ছে, সুস্থ চিন্তাধারার অবলুপ্তি ঘটছে। অসুস্থ বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়ছি আমরা।

কথাগুলো শোনার পর বলাই সাধুখাঁ একটু গম্ভীর হয়ে থাকবার পর বলেছিল, একটা কথা তোদের বলছি কমল। প্রকাশ করিসনি যেন। আমার ব্যবসায় ক্ষতি হবে।

কমল কিছুক্ষণ অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার ব্যবসার ক্ষতি হবে? কি ক্ষতি?

—যদি হৈ হুজুত করিস আমার সেল কমে যাবে।

—কি এমন অমূল্য জিনিষ যে সেল কমবার ভয় করছো তুমি? খিঁচিয়ে উঠেছিল কমল।

—নিরোধ।

—কমলের মুখে কথা সরেনি। ফ্যাল ফ্যাল করে বলাই সাধুখাঁর মুখের দিকে চেয়েছিল।

বলাই সাধুখাঁ চুপি চুপি বলেছিল, আমি ব্যবসাদার। কিন্তু বারো বছরের ছেলে থেকে বাষট্টি বছরের বুড়ো পর্যন্ত আমার বন্ধু। নিরোধের বিজ্ঞাপনে দেশটা ছেয়ে গেছেরে ভাই। রেডিও খুললেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের জ্বালায় কান ঝালাপালা। ছোঁড়াগুলো পনেরো পয়সায় তিনটে বড় কম কেনে না।

কথাটা শোনবার পর গুম হয়ে গিয়েছিল কমল। সন্ধ্যে হয়েছিল। বলাই সাধুখাঁর দোকানে একে একে এসেছিল অনেকে। চা খেয়ে উঠে পড়েছিল বিনোদ।

কমল বলেছিল, বলাইদা মাষ্টারকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

রাস্তায় নেমেছিল দুজনে। পাশাপাশি হাঁটছিল।

অন্ধকার ছায়া ছায়া পথ। কমল এক সময় বলেছিল, জানো মাষ্টার, আমার নিজের ওপর কেমন মাঝে মাঝে অসহ্য রাগ হয়।

—কেন? চলতে চলতেই জানতে চেয়েছিল সে।

—মানুষের জীবন নিয়ে যেন ব্যবসা চলেছে আজ।

বিনোদ ওর কথাটা বুঝতে পারেনি। চুপচাপ হাঁটছিল।

—মাষ্টার! একসময় ডেকেছিল কমল।

—বল।

—পিন-আঁটা পত্রিকা দেখেছো?

বিস্মিত হয়েছিল বিনোদ। বুঝতে পারেনি, ও কি বলতে চায়। জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন বলতো ?

—দেখেছো কিনা বলনা ?

—দেখেছি।

—ওর ভেতরে কি থাকে জানো ?

—না।

হেসেছিল কমল। বলেছিল, আমি জানি। চারখানা পত্রিকা কিছুদিন আগে আমি পড়েছি।

—কোথায় পেলে ?

—বোনের কাছে। ওর পড়ার বইয়ের মধ্যে ছিল বইগুলো। আমি চারখানা বইই পড়েছি।

বিনোদ চুপ।

কমল বলেছিল, আমি পড়লাম, পড়লাম বললে ভুল বলা হয়, আমি নরক ঘাঁটলাম। চারটে বইই প্রাপ্ত বয়স্কদের লেবেল আঁটা। পেলাম এক অপ্রাপ্ত বয়স্কার কাছে। জানবার বিষয় কিছু কম নেই। সেই সঙ্গে রয়েছে অজানাকে জানার জন্য আগ্রহী করে তোলার ব্যবস্থা। যৌবনের নগ্ন, বিকৃত প্রকাশ। অসংখ্য নগ্ন বিদেশী সুন্দরীদের ছবি। রতি সম্ভোগের স্বাধীনতার গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ।

দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল কমল। জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার কি করা উচিৎ ছিল বলতো ?

—কি করবে ?

—আমার বোনকে বইগুলো ফেরৎ দিয়েছিলাম আমি।

কথা বলেনি বিনোদ। কমল বলেছিল, বিনোদ, আমার বোনকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি। আমি তার ভাল চাই। আমি কখনই কামনা করিনা, তার দেহ এবং মনের পবিত্রতা নষ্ট হোক। আমি তাকে ডেকেছিলাম। ভয়ে প্রথমটায় সে স্বীকার করতে চায়নি। পরে বলেছিল, তার স্কুলের এক বান্ধবী তাকে বইগুলো দিয়েছে।

আমি তাকে বুঝিয়ে ছিলাম। ভাল এবং মন্দ উভয় দিকই আলোচনা করেছিলাম। বলেছিলাম, কিশোর মনের জানার কৌতূহল দুর্বার। কিন্তু এভাবে বিকৃতি দেখা দেবে, অন্যায়ে প্রলুব্ধ করবে। আমাকে বলল, আর সে এমন করবে না। বললাম, আজ নয়, চিন্তা কর। অন্যায় করার একটা মোহ আছে। এই মোহকে কাটিয়ে ওঠা বড় শক্ত। দেহ এবং মনের পবিত্রতা রক্ষা করা জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম। অন্যায়কে ঘৃণা করতে শিখতে হয়। ও কথা দিয়েছে, জীবনে কোন অন্যায় আর করবে না।

বিনোদ নীরব।

—কিন্তু মাষ্টার! কমল যেন আক্ষেপে ফেটে পড়েছিল। সব দোষটা কি আমার বোনের অথবা যারা ওই সব পত্রিকাগুলো গোপনে পড়ছে, তাদের? প্রতিটি পত্রিকা রেজিষ্টার্ড। পাপ ব্যবসায়ীর দল অন্যায়ভাবে মুনাফা লোটবার আয়োজন করেছে। নগ্ন ছবিতে পত্রিকা ভরে দিয়ে প্রকাশ্যে বিক্রী করছে। রাজনীতির কথা লেখা বইয়ের বিক্রী নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ বই হয়ে গোপনে বিক্রী হয় সেসব। কারণ আইন সেখানে সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিচ্ছে। যুব সম্প্রদায় যাতে রাজনীতির আবর্তে পড়ে দেশ এবং সমাজের ক্ষতি না করে, বিপথগামী না হয়, তার চেষ্টা। কিন্তু মাষ্টার, রাজনীতি সকলে করে না। রাজনীতি সকলের জন্যে নয়। সুস্থ রাজনৈতিক চিন্তাধারা ক্ষুদ্রতর স্বার্থ নয়, বৃহত্তর কল্যাণের পথ ধরে অগ্রসর হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনাবোধও স্বীকৃত। অসুস্থ রাজনীতির প্রসার বন্ধ হোক এটা সকলেই কামনা করে। কিন্তু সমাজে ব্যাভিচারের অবাধ ছাড়পত্র দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? কোন্ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে নগ্ন বিকৃত পাপের ফসলে ভরা, কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেবেল এঁটে বিক্রি হচ্ছে? জনসংখ্যার অভিশাপ মুক্ত করে জাতীয় জীবনকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়াই সরকারী উদ্দেশ্য। প্রচারে কোন ত্রুটি নেই।

সহজলভ্য নিরোধ। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হাতে পড়ে সমাজের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি? না, হয়নি। কিন্তু কেন?

রাশিয়ায় সবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোন দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম প'রে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে। সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপর ওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধা সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোন, উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতেই পারে না। অথচ উপরে থাকার দরকারও আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না। কেবল মাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে তো মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত

জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতার এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর মনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখ সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া করে কোন স্থায়ী জিনিষ করা চলে না, বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভাল করে কিছুই ভেবে পাইনি—অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে, একথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।

ভেবে দেখ না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংল্যাণ্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংল্যাণ্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংল্যাণ্ড বড় হয়ে উঠে জনসমাজে বড় কাজ করছে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায়, কম পরে, তাতে কী যায় আসে। তবুও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত, এমন কথা তাদের মনে জাগে। কিন্তু একশো বছর হয়ে গেল, না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁসে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয়নি, আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য

হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত —ভারতবর্ষ তো প্রায় বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।

বিশ্বকবির রাশিয়ার চিঠির কিছু অংশ মনে পড়লো বিনোদের। মনে করিয়ে দিলেন পাশের বেডের ভদ্রলোক। সকালবেলা যে প্রশ্ন করতে গিয়েও করা হয়নি তাঁর, তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

বাইরে দুপুর। একটু তন্দ্রা এসেছিল তার। ডাক শুনেছিল, মাষ্টারমশাই।

চোখ মেলে চেয়েছিল বিনোদ। বলেছিল, কিছু বলছেন?

—আপনি কি ঘুমোচ্ছিলেন?

—একটু তন্দ্রামত এসেছিল।

জিভ কেটেছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন, কিছু মনে করবেন না, আপনি ঘুমোন।

হেসেছিল সে। বলেছিল, ঘুম আর হবে না। আসুন গল্প করি।

—গল্প? বেশ। হেসে ফেলেছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন, আমার কিন্তু কিছু জানার আছে আপনার কাছে।

—বেশ তো। বিনোদও হেসেছিল। কি জানতে চান বলুন।

একটু ইতঃস্তত করেছিলেন তিনি। চিন্তা করে নিয়েছিলেন যেন। পরে বলেছিলেন, কিছু মনে করবেন না মাষ্টারমশাই, আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ। আমি সমালোচনা করছি না কিন্তু আমার জানতে বড় ইচ্ছা, আজ যে-শিক্ষা ছেলেমেয়েদের দেওয়া হচ্ছে, চাকরীর বাজারে হয়তো তার মূল্য আছে, পরীক্ষায় পাশ করাটা হয়তো মিথ্যা নয় কিন্তু এ শিক্ষা কি সত্যকারের শিক্ষা?

একটু আশ্চর্য হয়েছিল সে। ক্ষুণ্ণও হয়েছিল। মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল, কেন নয়?

—তাইতো জানতে চাইছি।

—আপনার কি মনে হয়?

—আমার? ভদ্রলোক যেন একটু বিব্রত বোধ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমাকে বিপদে ফেললেন।

—বিপদ মনে করলেই বিপদ। হেসেছিল সে। বলেছিল, আপনার ছেলেমেয়েরাও নিশ্চই স্কুল-কলেজে পড়ে?

—হ্যাঁ মাষ্টারমশাই। দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। একটা ছেলে কলেজে পড়ছে, বাকি দুটো স্কুলের ছাত্রছাত্রী। কিন্তু যা দিন পড়েছে, মুখে অন্ন দিয়ে সবকটা ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানো আর বোধহয় সম্ভব হয়ে উঠবে না আমার পক্ষে।

—লেখাপড়া বন্ধ করে দেবেন?

—তাছাড়া উপায় কি মাষ্টারমশাই। অর্থের অভাব যাদের নেই, হাতী পোষার সখ মেটানো তাদের পক্ষেই সম্ভব।

—একি বলছেন আপনি?

—মাষ্টারমশাই, আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েদের পড়ানো হয়না, পড়া ধরা হয়। বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ নেই, বিদ্যাভ্যাস করে যেতে হয় বাড়িতে। হাতী পোষার খরচে প্রাইভেট মাষ্টার রেখে পড়িয়ে পাঠাতে হয় ছেলেদের। কেন?

বিনোদ নীরব। সদুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। মনে পড়েছিল অনেক কথাই। পরীক্ষায় পাশ করা আজ যেন শিক্ষার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। যোগ্য অযোগ্য প্রমাণিত হয়।

মনে পড়েছিল মাষ্টারমশাইয়ের কথা। একটি দিনের দৃশ্য।

গত বছর বার্ষিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে এক সকাল বেলা তাঁর কাছে গিয়েছিল সে। দেখেছিল একগাদা লেখা কাগজ সামনে

শিক্ষার মানোন্নয়ণের পরিবর্তে শিক্ষার মান নিম্নগামী হচ্ছে তাঁদেরই হস্তক্ষেপে। কুখ্যাত ব্রিটিশের আমলাতন্ত্র শিক্ষাক্ষেত্রে আজও বিরাজমান। বহাল তবিয়তে দুর্নীতির ষ্টীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। পরাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটেনি প্রতিটি প্রান্তের, প্রতিটি মানুষের মনোদ্বারে। সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন কি আজও হয়েছে। হয়নি। নিরক্ষরতা, অন্ধকারের অভিশাপ জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শিক্ষার সুযোগ লাভের সৌভাগ্য স্বাধীনতার তেইশ বছর পরেও লাভ করতে পারেনি প্রতিটি মানুষ। অসম্মানের আবর্তে মানুষের জীবনকে নিমজ্জিত করে রাখা হয়েছে ক্ষুদ্রতর স্বার্থে। শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

—কিন্তু···

—দেখুন মাষ্টার মশাই, শিক্ষা জাতীয় জীবনের মস্ত সম্পদ। শিক্ষা আলোকিত করে মন, দেখায় পথের দিশা। আত্মচেতনা লাভ করে মানুষ। কিন্তু ভারতবর্ষের ছাপ্পান্ন কোটি মানুষের কজন এই আলোর স্বার্থলাভ করেছে? শিক্ষা আজ ব্যয় বহুল পণ্য। আত্মজকে শিক্ষিত করে তুলতে অর্থের প্রয়োজন বড় কম নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে কি তা সম্ভব?

বিনোদ চুপ।

---আর রাজনীতি। শিক্ষাক্ষেত্র আজ রাজনীতির আখড়া। ছাত্র সংগঠনগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে পরিচালিত। ছাত্রদের অভাব অভিযোগ, ভাল মন্দের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না, চলে ব্যাপক রাজনীতির প্রচার। আর আপনারা ছাত্রদের সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট করতে সহায়তা করেন।

—আমরা?

—হ্যাঁ মাষ্টার মশাই। ম্লান হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে। বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি। কিন্তু না বলেও পারছি না, প্রকৃত সৎ শিক্ষক যেমন আছেন, শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত

বলে যেমন গ্রহণ করেছেন তাঁরা, তেমনি রাজনীতির চর্চায় ছাত্রদের মনকে আকর্ষিত করছেন কিছু শিক্ষক।

—কিন্তু আপনার অভিযোগ যে সত্য তার প্রমাণ কোথায়?

—প্রমাণ? আবার হাসলেন তিনি। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক বিশৃঙ্খলতাই এই অভিযোগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয়কি?

—এ বিশৃঙ্খলতা তো কিছু ছাত্রের হঠকারীতার চিহ্ন।

—অসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা হঠকারীতার জন্ম দেয়। প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খল অবস্থা শেষ হবেনা।

—আপনি এই বিশৃঙ্খলতাকে, মাথা গরম ছাত্র সমাজকে সমর্থন করেন?

—করিনা মাষ্টার মশাই। আমি চাই প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। চাই শিক্ষালাভ শেষে নিশ্চিত ভবিষ্যতের পথ। আমার দুটি ছেলে আজ পড়ছে। আমার পরিশ্রমের অর্থের একটা বড় অংশ তাদের শিক্ষার জন্যে ব্যয় হচ্ছে। আমার আশা, তারা শিক্ষালাভ শেষে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ পাবে। আমার নিজস্ব ভার লাঘবের কথা যতনা চিন্তা করি, তার চেয়ে বেশি করে চিন্তা করি তাদের ভবিষ্যতের কথা। তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিউরে উঠি। তারা নিশ্চই দিশাহারা বোধ করবে। ক্ষোভে ক্রোধে অন্ধ হবে।

—কিন্তু তা তো উচিত নয়।

—বলছেন বটে মাষ্টার মশাই। কিন্তু আপনি?

—আমি? চমকে উঠলো বিনোদ।

—হ্যাঁ মাষ্টার মশাই, আপনি কি করতেন?

বিনোদ নীরব। নিজের অতীত জীবনটা তার চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল। কিন্তু তাই বলে……

তরুণের প্রতিজ্ঞা, স্বপ্ন-আশা-সার্থকতার পথ খোঁজে সৃষ্টির

মাধ্যমে। তরুণের স্বপ্ন সৃষ্টিতে। কিন্তু সৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ। স্থির গতি। শুধু মাথা খোঁড়া। প্রাণ প্রাচুর্যের কাণায় কাণায় সে পূর্ণ। সে চায় বাঁচতে। অপসারিত করতে চায় বাধা। ব্যবধানের প্রাচীর চূর্ণ করতেও তার দ্বিধা নেই। সে চায় বাঁচার অধিকার।

যুবচিত্তের অসন্তোষ, অতৃপ্তির (কারো কারো মতে বিপথগমণের) কারণ অনুসন্ধানে বিজ্ঞজনের গবেষণার অন্ত নেই। বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে তাঁরা বিচার বিশ্লেষণ করে মোটামুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। বেকারত্ব। বেকার সমস্যা আজ নাকি তরুণ সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের একটা অন্যতম কারণ। বেকার সমস্যার সমাধান হলেই তরুণ সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ অনেকাংশে দূর হবে।

কিন্তু বেকার সমস্যাই কি যুবচিত্তের বিক্ষুব্ধতার সবচেয়ে বড় কারণ? রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থার কি কোন ভূমিকা নেই? শুধু কি যুব সম্প্রদায়ই একমাত্র বিক্ষুব্ধ। সমাজের নিরন্ন বঞ্চিত পীড়িত মানুষের দল কি শান্ত, স্থির?

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ তেইশ বছর পার হয়েছে। যদিও তেইশটা বছর খুব একটা বেশি সময় নয়, কিন্তু নেহাৎ কমও নয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতের তেইশ বছরের ইতিহাস কি? তেইশ বছরের গণতান্ত্রিক ভারতে জনগণ কি পেয়েছে—পায়নি কি?

তেইশ বছরের ভারতবর্ষ আজ স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারেনি। গুটি গুটি হাঁটাও তার উচিত ছিল কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, জড় পঙ্গু অথর্ব হয়ে উঠছে। মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের দল আজ স্বাধীনতার সুফলভোগী। অসংখ্য মানুষ শিক্ষা-দীক্ষাহীন নিরন্ন জীবন যাপনের গ্লানি বহনে

বাধ্য। ক্ষোভ দুঃখ হতাশায় নিমজ্জিত। আশার স্বপ্ন ধুলিসাৎ। চোরা বালির আবর্তে জীবন সঙ্কটাপন্ন। শুধুমাত্র মৃত্যুর দিন গোণা ছাড়া পথ নেই যেন।

পথ হয়তো আছে। সে পথের যাত্রাও আজ দ্বিধাগ্রস্থ। ক্ষুদ্র স্বার্থ, দলীয় স্বার্থের তাঁবেদারিতে ভুলিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। মানুষ আজ বাঁচার পথের সন্ধানে মাথা খুঁড়ে মরছে। আত্ম বিশ্বাসে আঘাত লাগছে। স্মরণ করছে অভিশাপ আর গ্লানি ভরা দিনগুলিকে। বাঁচার আকাঙ্ক্ষা কি তাদের ব্যর্থ হবে? কোন্ পথে আসবে মুক্তি? মুক্তিশঙ্খ বাজবে কার আহ্বানে?

বিশ্বকবির সেই শাশ্বত আহ্বান আবার ধ্বনিত হচ্ছে। আহ্বান জানাচ্ছে—

ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা! কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ জনে! কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্য তল! কোন অন্ধকারা মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার,......

স্বার্থোদ্ধত অবিচারই আজ কেড়ে নিয়েছে মানুষের মুখের গ্রাস, শান্তির নিদ্রা, স্বস্তি—ভবিষ্যতের নিরাপত্তা। সমাজতন্ত্রের স্বার্থকতা আজ ধনীর ধনোঐশ্বর্যের ব্যাপ্তিতে। ধনী হয়েছে আরো ধনী, গরীব পথের ভিখারী।

অর্থনৈতিক অসাম্য দুর্গতির চরম সীমায় নামিয়ে নিয়ে গেছে সাধারণ মানুষের জীবনকে। অথচ একদিন, বিদেশী শাসনই একমাত্র দায়ী ছিল। বিদেশী শাসনের লোলুপতা, শোষণ স্বেচ্ছাচার জাতীর

জীবনকে দিনের পর দিন অন্ধকারে মাথা খুঁড়তে বাধ্য করিয়েছিল। বিদেশী শাসনের অবসানে মানুষ বাঁচার পথ পাবে। জীবন হবে সহজ সরল গতিশীল।

১৯২১-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় জননেতারা ভারতবর্ষের মানুষের গড় দৈনিক আয় মাত্র ছ'পয়সা বলে আক্ষেপ করতেন। দোষী করতেন বিদেশী নাগপাশকে। তারাই মানুষের চরম দুর্গতির একমাত্র কারণ।

কিন্তু আজ?

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতে প্রজাতন্ত্র জন্মলাভ করেছিল। চালু হয়েছিল ভারতীয় সংবিধান। কিন্তু ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার সতেরো বছর পরে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হবার পর জনগণের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ৪৮২ টাকা। পরবর্তী তিন বছরে পাঁচশত টাকার সামান্য কিছু বেশি হয়েছে। জনগণের মাথা পিছু গড় আয় মোট জাতীয় আয়ের ওপর নির্ভর করে এবং এই জাতীয় আয় জাতীয় উৎপাদনের বর্তমান দর হিসাবে মূল্য স্থির করে নির্দ্ধারিত হয়। ১৯২১-২২ সালে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য যা ছিল, বর্তমানে অন্তত তার পনর গুণ। ১৯২১-২২ সালের দরে বর্তমান উৎপাদনের মূল্য নির্দ্ধারণ করলে মাথা পিছু গড় আয় দাঁড়াবে (৫০০ ÷ ১৫) ৩৩ টাকা বা দৈনিক ন' পয়সা বা সেদিনের ছ' পয়সার নীচে। সেদিনের আয়ের চেয়ে আজকের গড় আয় কি সত্যি সত্যিই বেড়েছে? তেইশটা বছর কোথায় গেল?

বেকারত্ব, মূল্য বৃদ্ধি, দারিদ্র্য। তেইশ বছরে একচেটিয়া পুঁজিবাদের রামরাজত্ব। গান্ধীজীর মতে, অহিংস স্বাধীনতার মূল চাবিকাঠিই হল আর্থিক সাম্য। আর্থিক সাম্যের কাজ করার অর্থই হল পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ, তার অবলোপ করা। তার মানে, একদিকে, যে কয়েকজন ধনীর হাতে সম্পদের বিপুল অংশ পুঞ্জীভূত আছে তাদের নীচের স্তরে নামিয়ে আনতে হবে। অপরদিকে,

নগ্ন অর্ধভূক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষকে উপরের স্তরে টেনে তুলতে হবে। ধনী ও ক্ষুধার্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান যতদিন থাকবে ততদিন অহিংস শাসন পদ্ধতি স্পষ্টতঃই অসম্ভব ব্যাপার। নূতন দিল্লীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা আর তার কাছের গরীব দুর্দশাগ্রস্থ কুটিরের মধ্যে যে পার্থক্য স্বাধীন ভারতে তা একদিনও টিকতে পারে না। স্বাধীন ভারতে গরীবরা সর্বাপেক্ষা বড় ধনীদের শাসন ক্ষমতা ভোগ করবে। ধন ও ধনজ ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে তা সাধারণের মঙ্গলের জন্যে ব্যয় না করলে অহিংস ও রক্তাক্ত বিপ্লব অবধারিত।

গান্ধীজীর মতে উত্তরাধিকার সূত্রেই হোক অথবা ব্যবসা বা শিল্পের দ্বারাই হোক, আমার যদি প্রচুর ধনাগমন হয় তাহলে আমাকে জানতে হবে যে, সেই সব ধনের মালিক আমি নই, আমি সম্মানজনক জীবন যাপনেরই শুধু অধিকারী—এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন যাপনের যে অধিকার ভোগ করে, আমার অধিকার তার চেয়ে বেশি নয়। সেই ধনের অবশিষ্ট অংশ সমষ্টির সম্পত্তি এবং সমষ্টির কল্যাণেই তা ব্যয় করতে হবে। জমিদার ও রাজা-রাজড়াদের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে দেশের কাছে যখন সমাজতন্ত্রী তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয়, তখনই আমি এই তত্ত্বের অবতারণা করি। তারা এই সুবিধা-ভোগী শ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে চায়। আমি চাই যে তারা (সুবিধা-ভোগীরা) তাদের লোভ ও মালিকানা বোধকে অতিক্রম করে নেমে আসুক তাদের স্তরে, যারা শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জন করে। শ্রমিকদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, তাদের যে শ্রম করবার নিজস্ব অধিকার আছে, ধনীদের তাদের উপর অধিকার তার চেয়েও কম।

গান্ধীজী তাঁর সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচারে আরো অনেক কথাই বলেছেন। তাঁর সমাজবাদের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র। কিন্তু সত্যই কি তাই?

ভারতীয় তথা কংগ্রেসী সমাজতন্ত্র কোন্ পথে?

কি ভাবে সমাজতন্ত্র পরিণতি লাভ করেছে?

ভারতীয় সমাজতন্ত্র তো একচেটিয়া শোষণ, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারে মানুষকে দিনের পর দিন অবনতির স্তরে নামিয়ে নিয়ে গেছে। রাষ্ট্রের পুঁজি, ব্যক্তিগত পুঁজিতে পরিণত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের অবসানের পরিবর্তে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে।

কংগ্রেসের ভূমি সংস্কার তদন্ত কমিটির (কুমারাপ্পা কমিটি) রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। তাতে কৃষকের স্বার্থের অনুকূলে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সুপারিশ ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের মধ্যে, মুখের কথা ছাড়া তাকে কাজে পরিণত করা হয়নি। ফলে জমি থেকেছে জমিদার জোতদারদের হাতে। দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট। বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চেয়েছে মানুষ। বিব্রত সরকার শত শত কোটি টাকার মার্কিন খাদ্য শস্য এনে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভূমি সংস্কার করে খাদ্য সংকট মেটাবার চেষ্টা করেনি। ফলে খাদ্যসমস্যা সমাধানের পথ থেকেছে রুদ্ধ। একচেটিয়া মুনাফাবাজির অধিকার থেকেছে অক্ষুণ্ণ। আজ সমগ্র ভারতবর্ষে, কৃষিকর্ম যাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন, শতকরা বিরাশী জনের জমির ওপর কোন নির্দিষ্ট স্বত্ব নেই। ছোট জমির মালিক, জমির ওপর নির্ভর করে যাদের থাকা ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই, অথচ ফসলে সারা বছরের অন্ন-সংস্থান হয় না, তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়: ভারতবর্ষের মোট আবাদী জমির বিরাট অংশ জমিদার জোতদারদের কুক্ষিগত।

যদিও সীলিং বা জোতের ঊর্দ্ধসীমা আইনে বাঁধা আছে, কিন্তু বে-আইনের ফাঁক বন্ধ নয়। আইনের সাধ্য কি, আইন লঙ্ঘনকারীদের গাত্র স্পর্শ করে। আইনের আশ্রয়ে বে-আইনী হস্তান্তর সিদ্ধ।

*

১৯৬৯ সালের ২৮শে ও ২৯শে নভেম্বর দিল্লীতে কৃষি সম্বন্ধে "নতুন নীতির" পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীদের সভা হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী, প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সকলেই জোর

দেন ভূমিনীতি পুনর্নিধারণ করার, কি ভাবে তাকে চালু করতে হবে, এবং সফল করার জন্যে প্রয়োজনীয় আইন, প্রশাসন ও আর্থিক সংস্থানের ওপর।

প্রচার করা হল "নতুন নীতিকে" অর্থাৎ ভূমি সংস্কারকে কার্যকর করতে বিলম্ব বা ত্রুটি হলে তা কেবল দ্রুততর, ব্যাপকতর ভাবে প্রয়োগ করার পথে শুধুমাত্র বাধাই সৃষ্টি করবে না, সামাজিক গোলযোগও বেড়ে যাবে, রুদ্ধ হবে অগ্রগতির পথ। অতএব প্রাচীন সামন্তবাদী মধ্য স্বত্বগুলিকে ১৯৭০ সালের শেষ নাগাদ উৎখাত করতেই হবে।

সভায় প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা স্থির করলেন, খোদ চাষী-কৃষকদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হবে এবং এমন সব অধিকার দেওয়া হবে যাতে তারা ব্যাংক, সমবায় সমিতি প্রভৃতি থেকে ঋণ পেয়ে কৃষি উৎপাদনের জন্য স্থায়ী উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে পারে। স্বীকার করা হল, সীলিং আইনকে কার্যকর করার কাজ অনেকগুলি রাজ্যে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলছে এবং আইনের ধারাগুলিও অসন্তোষজনক রয়েছে। অতএব সমস্ত ব্যাপারগুলি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

আবার মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন বসলো ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে। কারণ, ১৯৬৯-এ ভূমি সংস্কার কিভাবে হয়েছে তা দেখা দরকার। কিন্তু দেখা গেল, প্রায় মুখ্যমন্ত্রীরা জোতের সীলিং নামাবার বিরোধী। কারণ···কারণ কি একটা? তাই বহু কারণের ব্যাপারটা তাঁরা অহেতুক আলোচনা করে সময় নষ্ট করতে চাননি। তাই ভূমি ছেড়ে শহরের সম্পত্তি নিয়ে পড়লেন তাঁরা।

কিন্তু ভূমি সংস্কারের কাজকে এগিয়ে দিল বিহার, কেরালা আর পশ্চিম বাংলার কৃষক এবং খেত-মজুরের দল। অবশ্য তারপর ভূমি-সংস্কারের কাজ কিছু-কিছু হচ্ছে।

অবশ্য কৃষক এবং খেত-মজুরদের জমি দখলের লড়াই সবক্ষেত্রে নির্দোষ নয়। অভিযোগ—পাল্টা অভিযোগ প্রচুর। জমি গেছে ছোট

চাষীর, হাত পড়েনি জোতদারের জমিতে। বহু বেনামী সম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে কেবল মাত্র.........

পাটনায় সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসেছিল ১৯৭০ সালে। সেখানে কিছু মেম্বার ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু শুধুমাত্র সময়ের অপব্যবহার হবে বলে সে প্রশ্ন আলোচিত হতে পারেনি।

অথচ ঢাক-ঢোল পেটানোর অন্ত নেই। সার্থকতা! অগ্রগতি। মুখে শুধু কথার ফুলঝুরি। আর কাল হরণের আশ্চর্য উপায় হিসাবে, কমিটি, সাবকমিটি, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন। বিবৃতি আর তদন্ত কমিশন।

অথচ সামন্তবাদী শোষণ বন্ধ করার পথ বড় কম নেই। চাষের জমি আজ মুষ্টিমেয় বড় মালিকের হাতে। গেছে—যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত পাঞ্জাব সম্বন্ধে রিসার্চ ষ্টাডির রিপোর্টে জানা যায়, ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬৭-৬৮ বারো বছরের মধ্যে বড় বড় কৃষক জোতের সংখ্যা ৯.৫ ভাগ বেড়েছে। যত বড় জোত—বৃদ্ধির হারও তত বেশি। ২০-২৫ একরের জোত বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে শতকরা ৪ ভাগ, ১০০-১৫০ একরের জোতের বৃদ্ধি হয়েছে ৪০ ভাগ। অবশ্য বড় জোতের সংখ্যা পরিমান যা বেড়েছে তা জমি ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমেই। চাষী তার ছোট জমিটুকু বেচে দিয়েছে।

নতুন আবাদ অথবা কলোনি তৈরীর জন্যে আবাদযোগ্য পতিত জমি আছে চার কোটি পঁচিশ লক্ষ একর ও চলতি পতিত জমি আছে তিন কোটি আঠাশ লক্ষ একর। কিন্তু এই সমস্ত জমি বন্টনের অনিচ্ছা অথবা সময়াভাব সরকারের।

ভারতে ভূমি সংস্কার ব্যর্থ (যদিও সরকারী ঘোষণা তা বলেনা)। এই ব্যর্থতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের কৃষি বিশেষজ্ঞ উলফলাদে জিনস্কি আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন। ভূমিহীনের সমস্যা যে কত ব্যাপক এবং গুরুতর সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ১৯৬৯ সনের হিসাবে মোট ৪৩

কোটি ৪০ লক্ষ গ্রামীন জনসংখ্যার মধ্যে ১০ কোটি ৩০ লাখের কোন জমিই ছিলনা, আর ১৮ কোটি ৩০ লাখের হাতে ছিল পরিবার পিছু ৫ একরের কম। দুয়ে মিলে মোট গ্রামীন জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগ, তাদের মধ্যে ১৫ কোটি ৪০ লাখ থেকে ২১ কোটি লোক বেঁচে ছিল নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে, বছরে মাথাপিছু মাত্র ২০০ টাকা আয়ের ওপর নির্ভর করে।

ভূমিহীনদের কোন সমস্যা নেই। খুব একটা বড় সমস্যা দেখা দেয়না বড় জোতের মালিকদের। ভূমিহীন, খেত-মজুরদের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে উপোষ করার ও অখাদ্য কু-খাদ্য থেকে জীবনটাকে (এখানে প্রাণ) বাঁচিয়ে রাখার। আর বড় জোতের মালিকের আপশোষ (ফসল যদি কম হয়, লাভের অঙ্ক বাড়েনা। আপশোষ বৈকি)। কিন্তু ছোট জোতের মালিকের সাধ্য কি জমিটুকু আঁকড়ে ধরে থাকে। কারণ—

জমিতে প্রতি বছরই ভাল ফসল হয়না। কারণ চাষ আকাশ নির্ভর। চাষীর প্রাণের করুণ আকূতি, ভগবান জল দাও! আল্লা পানি দে···

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে জলের অভাব খুব বেশি একটা হয়না। অভিযোগ, যখন জলের প্রয়োজন থাকে তখন যে সমস্ত জায়গায় সেচের বন্দোবস্ত আছে, জল দেওয়া হয়না। একটি উত্তর, এখন জল দেওয়া চলবে না। জলাধারে জলের বড় ঘাটতি। জল দেওয়া হয় তখন, যখন ভগবান অথবা আল্লার দয়ায় চাষীর করুণ আকূতি পূর্ণ হয়। আনন্দের জোয়ার নামে গ্রামে গ্রামে। চাষীর মুখে ফুটে ওঠে দীপ্তি। মেঘ কালো ধানের চারাগুলো সান্ত্বনা দিয়ে জানায়—ভয় কি! বর্ষার খেয়ালী আকাশ খেলায় মাতে। জল জল আর জল। আনন্দে জড়াজড়ি হয়ে ভেজে সবুজ ধানের চারারা। বৃদ্ধ চাষীর বুক কাঁপে, তবু সাহস দেয় সকলকে। বর্ষা তো নতুন নয়। বর্ষা চিরদিনই হয়েছে। কপাল যদি খুব মন্দ হয় তাহলে ভয়ের, এ বর্ষায় কোন

ভয় নেই। কিন্তু বিনা নোটিশে জল ছাড়ে ডি, ভি, সি। জল না ছেড়ে উপায় কি? জল না ছাড়লে হাজার হাজার টাকায় নির্মিত তিনটি জলাধার নষ্ট হয়ে যাবে। মরা দামোদর ক্ষেপেছে—জলছাড়-জলছাড়। ভাঙ্গে-ভাঙ্গে, ভাঙ্গলো বুঝি বাঁধ! টাকার জিনিষ, দেশের সম্পদ নষ্ট করা চলেনা। প্রকল্প গড়ে উঠেছে বিদেশের ঋণের টাকায়। ওর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে অনেক টাকার বিনিময়ে আমরা বহাল। অতএব কোন কথা, কোন চিন্তা নয়, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করতে জল ছাড়ো।

জল ছাড়া হয়। জলে-জলে জলময় হয়ে ওঠে বাংলার গ্রাম গঞ্জ। নদী খাল বিল, চাষীর বহু আশার সোনা-ফলা ক্ষেত জলে জলে জলময় (প্রথম অবস্থার পৃথিবী)। গরীব চাষী, ক্ষেত মজুর, সাধারণ মানুষের বাঁশ, টালি, খড়ের-খোলার চাল, কাদার তৈরি ইমারতগুলো প্রায় নিশ্চিহ্ন। মরে মানুষ। গৃহপালিত পশু। আশ্রয়হীনের দল গাছে টাঁছে (ভূতের মত) আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তারপর কাগজে টাগছে লেখালেখি হয়। অভিযোগ—পালটা অভিযোগ। সরকারী বিবৃতি। সাহায্য ভাণ্ডার গঠন। কত প্রতিষ্ঠানের দান। সরকারী সাহায্য। হেলিকপটারে বন্যাপীড়িত অঞ্চল দর্শন। উৎসাহী মানুষের সাহায্য দিয়ে আসার জন্তে এস, ডি, ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর সব কিছু ব্যবস্থা করে দেবার প্রতিশ্রুতি। কার্য্যক্ষেত্রে অক্ষমতা জ্ঞাপন। সুদূর গ্রামে সব-হারানো মানুষের আগ্রহী প্রতীক্ষা। দালালদের ছোটাছুটি। গৌরী সেনের পয়সায় কেনা সাহায্য হিসাবে পাঠানো করগেট টিন দোকানে ফেরত যাওয়া। তেমনি আটা, গুড়, চিঁড়ে ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি।.........

কিন্তু বন্যা কেন হল? মাত্র তিন দিনের অঝোর ধারায় সব ডুবে গেল? অভিযোগ, ডি, ভি, সির জল বন্যা সৃষ্টি করেছে। যদিও বিশেষজ্ঞের দল প্রতিবাদে সদা প্রস্তুত। বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা নাকি বলেছিলেন, পাঁচটি জলাধার করতে হবে। কেন করা হয়নি?

কেন সংস্কার করা হয়নি নদী, খাল গুলোকে? ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তাটা বড় বদ জিনিষ। তবু······বাংলা দেশটাকে······

অভিযোগ : ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই।

অবুঝ দুর্দ্দশাগ্রস্থ মানুষগুলোর অভিযোগ। বাবু, মা আর সোমত্ত মেয়ে একখানি আট হাতি কাপড় জড়িয়ে, তিনটে দিন প্রাণে বাঁচা পঞ্চাশ ষাটটা মানুষের মধ্যে বসেছিল। বাবু, সবার অবস্থা একই। কে কাকে দেখে? কে কার দিকে মন্দ দৃষ্টি দেয়! বাবু, মেয়ে পুরুষের ভেদ আমরা হারিয়ে ফেলেছিনু। পেট ভরা থাকলে তবে তো কামের উদ্রেক। আমরা মরতেও পারিনি, বাঁচতেও চাইনি। বাবু, তিনটে দিন শুধু ভেবেছি, কোন্ পাপে এমনটা হল?

বাজারে ফসল বিক্রী করার সময় ও বাজার থেকে অন্যান্য দরকারী জিনিষ কেনার সময় দর বরাবর সমান থাকেনা। বাড়ে কমে, সেজন্যে সংসারের ও চাষের সম্বন্ধে আয় ব্যয়ের সমতা রাখা যায়না, আয় কমে আর ব্যয়ের হিসাবটা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

তাতো বাড়বেই। কমা বাড়া নিয়েই বাজার। ফাটকার বাজার। জীবনটাই তো জুয়া। জুয়া খেলাতেই তো জীবনের মহৎ আনন্দ। কানে ফোন, মুখে বিচিত্র রুদ্রবীর করুণ (?) সুরের তরঙ্গ তুলে, ডান হাতের অঙ্গুলিগুলির মুদ্রা (অভিজ্ঞা নর্তকীরাও অত নিখুঁত মুদ্রা প্রকাশে সক্ষম, এ কথা হলফ করে বলা যায়) প্রকাশ করে কেনা বেচার লেন দেন চালায়, তাতে দাম উঠবে নামবে বৈকি। আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ, ফাটকা বাজার। সৎ ব্যবসায়ীর দল নিয়ন্ত্রক। পাঞ্জাবের সরষে বিখ্যাত। চিনে কিনলে, লাভ নাহলে মরেছো। সরষের মধ্যে যদি ভূত থাকে তো কি করা যাবে?

সব জিনিষেরই এক অবস্থা। আজ আছে, কাল নেই। আছে, দেড়া দাও। ডালডা নামের বনস্পতি, কাগজে হাফ পেজ বিজ্ঞাপন —দাম কমিল। সুবর্ণ সুযোগ। কিনতে গেলে রসিদ পাবে, ন্যায্য দামের সামান্য একটু বেশি দিতে হবে। ওটা বোধ হয় গুদাম ভাড়া?

খুচরা ক্রেতার অভিযোগ, তবে যে দাম কমেছে ? দোকানীর জবাব, কাগজে।

বড়বাজারে মুটে ষ্ট্রাইক। দাম চড়লো। কারণ, মাল আনবে কে ? হলুদ ছয় থেকে নয়, লঙ্কা আট থেকে বারো। খুচরো দোকানে সামান্য একটু বেশি। পনেরো দিন পরে ধর্মঘট মিটলো। জয় হলো মুটেদের। বোনাস পাবেনা, মোট-প্রতি দু পয়সা বাড়লো। হলুদ নয় থেকে নেমে এল আটে। লঙ্কা দশে। কমলো সব জিনিষেরই দাম। কিন্তু যে দাম ছিল, তা আর হল না। কারণ, মাত্র দু মণের একটা বস্তা বইতে মুটেরা দু পয়সা বেশি নেবে। এভাবে ব্যবসা চলে ?

সরকারী তর্জন গর্জন। সাবধান ব্যবসায়ীর দল। মৃদু হুঁশিয়ারী। ব্যবসায়ীর দল গুড বয়। বাজার তেজী রাখতে হবে। রেলপথের গুদামে গুদামে মাল নামিয়ে রাখো। চাহিদার তুলনায় মাল কম কম থাকলে বাজার থাকবে তেজী। চাই কি·· ······

অসাধু ব্যবসায়ী ধরতে সরকার সদা তৎপর। দাঁড়িপাল্লা পরীক্ষা, বাটখারা দেখা। ধরা পড়লে অনেক কৈফত। তুষ্ট কর্মচারীর দল, ধরে নাজেহাল কম করে না ব্যবসাদারদের। ভালোরা দশ-পাঁচে তুষ্ট। ধরাধরির পরিশ্রম আছে তো ? ব্যবসাদাররা সেদিকে ভীষণ বোঝদার।

অভিযোগ ! অভিযোগ। প্রমাণ কোথায় ? বিনা প্রমাণে এসমস্ত অভিযোগ উচিত নয়। সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার এমন বদনাম করা উচিত নয়।

শুধুমাত্র লিখিত প্রমাণই কি যথেষ্ট ? সাধু যদি অসচরিত্র হবে, তাহলে সাধুত্বের মহিমা ক্ষুন্ন করার দুঃসাহস কার হবে ? অসা অভিযোগকারীর দল। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। রক্তে সম্পর্ক।

ট্যাক্সের বোঝা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় আয়ের তুলনায় ব্যয়ে

মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়, তাতে সংসার ও চাষের কাজ চালানো কঠিন এবং ক্রমে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সরকারী বাজেটে, কি কেন্দ্রীয়, কি রাজ্য, ঘাটতি বাড়ে ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে। অতএব ঘাটতি পূরণে নতুন করের সৃষ্টি হয়। হ্রাস হয় মুদ্রামূল্য (যদিও আগে দৃঢ় ঘোষণা হয়, মুদ্রামূল্য হ্রাস কোন মতেই হবে না। জনশ্রুতি মিথ্যা অপপ্রচার)। বাজারে ছেপে ছাড়া নতুন কাগজের নোট। কর দু রকম, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। দুটো ফাঁসই গলায় পরতে হয় মানুষকে। আর মূল্য বৃদ্ধির সামান্য একটু নমুনা, আজ যেটা ২২৮ টাকায় পাওয়া যায়, সেটা নাকি ১৯৪৯-৫০ সালে একশো টাকায় পাওয়া যেত।

কৃষককে বাধ্য হয়ে ধার কর্জ করতে হয়, মহাজনের দেনা, সুদের বোঝা বইতে হয়। ব্যয় বাড়ে। ফলে জমি বিক্রী। আর জমি বিক্রীর পর পথ একটি—অনাহার-মৃত্যু।

ভরসা ভাগ্য। দুর্ভাগ্যের চপেটা-ঘাত কপালে লেখা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের জীবনে অবশ্য কাম্য। ভিখারীর সমাজ নেই। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মানুষের মন। যার সাহায্যের প্রয়োজন সেও সাহায্য করে। সমাজে বুড়ো কুমীর ওৎ পেতে আছে। অর্থ সাহায্যে দক্ষিণ হস্ত এগিয়ে আছে। টাকা মাটি—মাটি টাকা। টাকা কে চায়, মাটিটুকুই যথেষ্ট।

তেইশটা বছরে শুধু সমস্যা-সমস্যা আর সমস্যা। সমস্যা সমাধানের জন্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা, প্ল্যান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে খরচ করা হয়েছে কিন্তু মাথা পিছু বার্ষিক আয় এক শতাংশের বেশি বাড়েনি। ফলে দেশের দেনা ২০,০০০ কোটি টাকা। সম্প্রতি ১৫ কোটি ডলারের পরিকল্পনা বহির্ভূত এক নতুন ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৯৫১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভারতে এই ধরণের মার্কিণ ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ২৫১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার (১,৮৮৪ কোটি টাকা)। ভারতে যত মার্কিণ ঋণ দেওয়া হয়েছে তার প্রায়

এক-চতুর্থাংশ দেওয়া হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রায়। কুড়ি বছর পরে এই ধরণের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০০০ কোটি ডলার (৭৫০০ কোটি টাকা)।

Reserve Bank of India servey রিপোর্টে বলা হয়েছে, শতকরা ৩০ ভাগ অর্থাৎ ১৭ কোটি লোক দৈনিক ৩৫ পয়সার বেশি খরচ করতে পারে না। পৃথিবীর অনুন্নত দেশের মাথা পিছু আয়ের তুলনায় ভারতবর্ষের মানুষের মাথা পিছু আয় কম। কিন্তু Planning Commission আয় বাড়ার আশ্বাস দেয়। দেশের অগ্রগতির ধ্বজা তুলে ধরেন নির্লজ্জ বেহায়াপনার জাতিয়তাবাদীতে। তাঁদের জীবন ধারণের মানই যেন দেশের সমস্ত মানুষের মান। কারণ দেশের মানুষের পয়সাতেই তো তাঁদের বাবুগিরি। অতএব তাঁরা যখন ভাল আছেন তখন দেশের প্রতিটি মানুষই ভাল আছে।

ভারতীয় Economic Servey 1969-70 অনুসারে আমাদের দেশে শিল্পে রত ব্যক্তির সংখ্যা বর্তমানে ৪৫ লক্ষ, তার মধ্যে Public Sector মাত্র ৭½ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান করতে পেরেছে। সরকারী-চাকুরে এক কোটি, বেসরকারী-চাকুরের সংখ্যা ৬৬ লক্ষ। সরকার এঁদেরই আরো সুযোগ সুবিধা দানের জন্যে ব্যস্ত। ৫০ লক্ষ শিক্ষিত যুবকের কর্ম-সংস্থানের জন্যে চিন্তিত। কারণ যথেষ্ট। সরকারী কাঠামো অচল করে দিতে পারেন এঁরা।

কৃষক, ক্ষেত-মজুর, এঁদের জন্যে সরকারের খুব একটা চিন্তার কারণ নেই। সামন্ত-তন্ত্রবাদ সেখানে টুঁটি চেপে আছে মানুষের। কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, সুতী বস্ত্র, তামাক, চা, চিনি, দেশলাই, কেরোসিন তেল, কয়লা প্রভৃতির ওপর অতিরিক্ত আবগারী শুল্ক বসিয়ে মূল্য বৃদ্ধি করে দেশের জনসংখ্যার বিপুল অংশটাকে ভিখারীর চরম পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট একটু নমুনা, ১৯৫১ সালে যেখানে ভারত সরকারের বাজেটে আয় ছিল ২৫০ কোটি টাকা এবং আবগারী শুল্ক থেকে ৫১ কোটি টাকা সেখানে ১৯৬৯ সালে আয়

বৃদ্ধি হয়ে ৩০০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র আবগারী শুল্ক থেকে আদায় ২৩০০ কোটি টাকা।

দেশে আজ সবুজ বিপ্লবের জয়ঢাক বাজছে। গমের ফলন আশাতিরিক্ত বেড়েছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভর হয়েছি। সেই সঙ্গে বেড়েছে খাদ্য শস্যের দাম।

১৯৬৫ সালের পর উৎপাদন সত্য সত্যই কিছু বেড়েছে। কিন্তু ফলন বিশেষ বাড়েনি। অধিকন্তু অর্থকরী-ফসলের তূলা, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতির উৎপাদন অনেক কমেছে। বেড়েছে গমের ফলন। কমেছে চাল, জোয়ার, বজরা, ভুট্টা।

ভারতীয় কৃষিমন্ত্রী সি, সুব্রাহ্মনিয়াম ঢাক পিটিয়ে বলেছিলেন, কৃষি-বৈজ্ঞানিকরা এমন আশ্চর্যজনক বীজ উদ্ভাবন করেছেন, নতুন বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহারের দ্বারা ৩২০ লক্ষ একর জমি, যেখানে সেচের সু-ব্যবস্থা আছে, সেখানে চাষ করলে পাঁচ বছরের মধ্যে তৎকালীন ৯ কোটি টন খাদ্য শস্যকে ১২ কোটি টনে পরিণত করা যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ২৭০ লক্ষ একর উপযুক্ত সেচ-এলাকার জমিতে উক্ত পদ্ধতিতে চাষ করে ১২ কোটি টনের জায়গায় ১০ কোটি টনেই থেমে থাকতে হয়েছিল। উপরন্তু সেখানে ৫ লক্ষ টন রাসায়নিক সারের জায়গায় ২৫ লক্ষ টন ব্যবহার করা হয়েছিল। চাষের খরচ বেড়েছিল মাত্র আড়াই গুণ।

ছোট কৃষকরা নাকি নিজেদের দোষেই দিনের পর দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ মন্তব্য অপবাদ সূচক। প্রকৃত কারণ অন্যত্র। কারণগুলি :—

কৃষির উৎপাদন সম্বন্ধে কোন নির্ভরতা নেই। সারা ভারতবর্ষে মোট আবাদী জমির শতকরা প্রায় কুড়ি ভাগ সেচের সুবিধা পায়। অগ্রগতির পদক্ষেপে মাত্র আশি ভাগের চাষ নির্ভর করে বর্ষার ওপর। অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির দরুণ ফসলহানি, এতো লেগেই

আছে। দোষ—ধার-দেনা করে ট্যাক্স মেটাতে হয়, খাজনা দিতে হয়। একদিন মহাজনকে ছেড়ে দিতে হয় জমির সত্ত্ব।

খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ ও সুদের টাকা মেটাবার জন্যে, প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনার জন্যে ছোট কৃষককে ফসলের মরসুমেই ফসল বিক্রী করে দিতে হয়। দোষ—ফসলের বাজার চড়ার অপেক্ষা করতে পারে না ছোট কৃষক। কিন্তু শিল্পজাত জিনিষ খুচরা বাজারে তাকে বেশি দামেই কিনতে হয়।

অবশ্য দর চড়বার প্রধান কারণ, বড় ব্যবসাদার ও শিল্পপতিদের সামান্য মুনাফাখোরি ছাড়া, পরোক্ষ কর বৃদ্ধি (শুধু বেড়েই চলেছে)। আয়কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর যা দিতে হয়, প্রধানত ধনীদের তার অনুপাতে যেমন কমানো হচ্ছে, সরকারী ব্যয় পূরণের জন্যে উৎপাদন শুল্ক-প্রভৃতি প্ররোক্ষ কর তেমনি বাড়ানো হচ্ছে, এবং আনন্দের বিষয়, যে কর আদায় করা হয়, আয়ের অনুপাতে ধনীদের তুলনায় সাধারণ মানুষদের ঘাড় থেকেই বেশি। সামান্য নমুনা—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হওয়ার সময় ১৯৫০-৫১ সালে ভারত সরকারের মোট ট্যাক্স বাবদ রাজস্বের শতকরা ৪৯.৯ (প্রায় অর্ধেক) ছিল প্রত্যক্ষ কর। তাকে কমাতে কমাতে ১৯৭০-৭১ সালে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে শতকরা ২৬.৮ ভাগে (প্রায় সিকিতে), এ বছরে টাকার অঙ্কে তার পরিমাণ ৭৯৯.২৪ কোটি টাকা, যেখানে ট্যাক্স ববাদ মোট রাজস্বের পরিমাণ মাত্র ২৯৮৬.৯৭ কোটি টাকা। অবশ্য বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ওপর এই ট্যাক্সের বোঝা অপেক্ষাকৃত কম চাপানো হয়েছে (না কমালে চলে ?)।

উৎপাদন শুল্ক ও পরোক্ষ কর বাবদ ভারত সরকারের রাজস্বের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ানো হয়েছে। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত সরকারের অর্থ দপ্তরের রিপোর্টে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে ভোগ্য পণ্য বাবত মোট ব্যয়ের শতকরা ২.৯ ভাগ পরোক্ষ কর ছিল ১৯৫৩-৫৪ সনে, ১৯৫৮-৫৯এ সামান্য বেড়ে হয় ৪.৪ ভাগ, আরো একটু বেড়ে

১৯৬৩-৬৪তে ৮ ভাগে দাঁড়ায়। তারপর ছয়-সাতটা বছরে আরো একটু নিশ্চই বেড়েছে। তবে ১৯৭০-৭১ সালের উৎপাদন শুল্ক বাবত রাজস্বের পরিমাণ হচ্ছে ১৬৭৯·৩৪ কোটি টাকা মাত্র।

অবশ্য দর বৃদ্ধির আর একটা সামান্য কারণ মুদ্রাস্ফীতি। মাথাভারী বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্যে বাজারে অতিরিক্ত পরিমাণে নোট ছাড়া হয় (না ছেড়ে উপায় কি, কেউ তো ঘাটতি পূরণ করবে না)। জিনিষ পত্রের দর চড়ে একটু লাফিয়ে (অবশ্য সৎ ব্যবসায়ীর দল অনুমান করেন আগে ভাগেই, বাজেটে নিশ্চই ঘাটতি দেখা দেবে। তাই প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের প্রায় শেষ থেকেই বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অনেক কিছুই উধাও হয়ে যায়। বিশেষ করে সিগারেটের আকাল ধরে। কিছুদিন হিসাবের বাইরে চলে বেচা কেনা। তারপর কাগজে বিজ্ঞাপন ছেপে বেরুবার পর সব ঠিক হয়ে যায়। বছরে ন্যায্য দামে বেচা কেনা চলে নয় মাস। সময়টা অল্প কি? অবশ্য ধর্মঘট-টট হলে তো সোনায় সোহাগা)। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৬১-৬২) সময় থেকে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২১৪৬ কোটি টাকা। আশা করা যাচ্ছে, চতুর্থ প্ল্যানের বাকি সময়ে (ভগবান না করুন) আরো ৮৫০ কোটি টাকা তার সঙ্গে যোগ দেওয়া হবে (অবশ্য ধরা হয়েছে, মাননীয় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরী থাকলে নিশ্চই সাফাই গাইতেন, মুদ্রা মূল্য হ্রাস করার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের বড় সুবিধা হবে ভারতের, আহা!)।

ছোট ছোট কৃষকের দল যে দিনের পর দিন জমি হারাচ্ছে, তাকি শুধু তাদের নিজেদের দোষে? স্বাধীনতা লাভের তেইশ বছর পরে গ্রামের মানুষের নিরাপত্তার কতটুকু ব্যবস্থা করেছেন সরকার? অথচ ভারতবর্ষের মত উপমহাদেশের বিপুল অংশ মূলতঃ কৃষি নির্ভর।

সামান্য একটু নমুনা (যদিও হিসাবটা পুরানো):

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫১-৫২ সালে তদন্ত রিপোর্টে জানিয়েছিল, সে-

আছে। দোষ—ধার-দেনা করে ট্যাক্স মেটাতে হয়, খাজনা দিতে হয়। একদিন মহাজনকে ছেড়ে দিতে হয় জমির সত্ব।

খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ ও সুদের টাকা মেটাবার জন্যে, প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনার জন্যে ছোট কৃষককে ফসলের মরসুমেই ফসল বিক্রী করে দিতে হয়। দোষ—ফসলের বাজার চড়ার অপেক্ষা করতে পারে না ছোট কৃষক। কিন্তু শিল্পজাত জিনিষ খুচরা বাজারে তাকে বেশি দামেই কিনতে হয়।

অবশ্য দর চড়বার প্রধান কারণ, বড় ব্যবসাদার ও শিল্পপতিদের সামান্য মুনাফাখোরি ছাড়া, পরোক্ষ কর বৃদ্ধি (শুধু বেড়েই চলেছে)। আয়কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর যা দিতে হয়, প্রধানত ধনীদের তার অনুপাতে যেমন কমানো হচ্ছে, সরকারী ব্যয় পূরণের জন্যে উৎপাদন শুল্ক-প্রভৃতি প্ররোক্ষ কর তেমনি বাড়ানো হচ্ছে, এবং আনন্দের বিষয়, যে কর আদায় করা হয়, আয়ের অনুপাতে ধনীদের তুলনায় সাধারণ মানুষদের ঘাড় থেকেই বেশি। সামান্য নমুনা—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হওয়ার সময় ১৯৫০-৫১ সালে ভারত সরকারের মোট ট্যাক্স বাবদ রাজস্বের শতকরা ৪৯.৯ (প্রায় অর্ধেক) ছিল প্রত্যক্ষ কর। তাকে কমাতে কমাতে ১৯৭০-৭১ সালে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে শতকরা ২৬.৮ ভাগে (প্রায় সিকিতে), এ বছরে টাকার অঙ্কে তার পরিমাণ ৭৯৯.২৪ কোটি টাকা, যেখানে ট্যাক্স ববাদ মোট রাজস্বের পরিমাণ মাত্র ২৯৮৬.৯৭ কোটি টাকা। অবশ্য বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ওপর এই ট্যাক্সের বোঝা অপেক্ষাকৃত কম চাপানো হয়েছে (না কমালে চলে ?)।

উৎপাদন শুল্ক ও পরোক্ষ কর বাবদ ভারত সরকারের রাজস্বের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ানো হয়েছে। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত সরকারের অর্থ দপ্তরের রিপোর্টে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে ভোগ্য পণ্য বাবত মোট ব্যয়ের শতকরা ২.৯ ভাগ পরোক্ষ কর ছিল ১৯৫৩-৫৪ সনে, ১৯৫৮-৫৯এ সামান্য বেড়ে হয় ৪.৪ ভাগ, আরো একটু বেড়ে

১৯৬৩-৬৪তে ৮ ভাগে দাঁড়ায়। তারপর ছয়-সাতটা বছরে আরো একটু নিশ্চই বেড়েছে! তবে ১৯৭০-৭১ সালের উৎপাদন শুল্ক বাবত রাজস্বের পরিমাণ হচ্ছে ১৬৭৯.৩৪ কোটি টাকা মাত্র।

অবশ্য দর বৃদ্ধির আর একটা সামান্য কারণ মুদ্রাস্ফীতি। মাথাভারী বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্যে বাজারে অতিরিক্ত পরিমাণে নোট ছাড়া হয় (না ছেড়ে উপায় কি, কেউ তো ঘাটতি পূরণ করবে না)। জিনিষ পত্রের দর চড়ে একটু লাফিয়ে (অবশ্য সৎ ব্যবসায়ীর দল অনুমান করেন আগে ভাগেই, বাজেটে নিশ্চই ঘাটতি দেখা দেবে। তাই প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের প্রায় শেষ থেকেই বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অনেক কিছুই উধাও হয়ে যায়। বিশেষ করে সিগারেটের আকাল ধরে। কিছুদিন হিসাবের বাইরে চলে বেচা কেনা। তারপর কাগজে বিজ্ঞাপন ছেপে বেরুবার পর সব ঠিক হয়ে যায়। বছরে ন্যায্য দামে বেচা কেনা চলে নয় মাস। সময়টা অল্প কি? অবশ্য ধর্মঘট-টট হলে তো সোনায় সোহাগা)। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৬১-৬২) সময় থেকে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২১৪৬ কোটি টাকা। আশা করা যাচ্ছে, চতুর্থ প্ল্যানের বাকি সময়ে (ভগবান না করুন) আরো ৮৫০ কোটি টাকা তার সঙ্গে যোগ দেওয়া হবে (অবশ্য ধরা হয়েছে, মাননীয় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরী থাকলে নিশ্চই সাফাই গাইতেন, মুদ্রা মূল্য হ্রাস করার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের বড় সুবিধা হবে ভারতের, আহা!)।

ছোট ছোট কৃষকের দল যে দিনের পর দিন জমি হারাচ্ছে, তা কি শুধু তাদের নিজেদের দোষে? স্বাধীনতা লাভের তেইশ বছর পরে গ্রামের মানুষের নিরাপত্তার কতটুকু ব্যবস্থা করেছেন সরকার? অথচ ভারতবর্ষের মত উপমহাদেশের বিপুল অংশ মূলতঃ কৃষি নির্ভর।

সামান্য একটু নমুনা (যদিও হিসাবটা পুরানো):

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫১-৫২ সালে তদন্ত রিপোর্টে জানিয়েছিল, সে-

বছর ঋণের পরিমাণ ৭৫০ কোটি টাকা। তার মধ্যে সরকার থেকে ৩.৩ ভাগ, সমবায় থেকে ৩.১ ভাগ, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে ০.৯ ভাগ, আর মহাজনেরা দিয়েছিল মাত্র ৯২.৭ ভাগ। অবশ্য তার মধ্যে পেশাদার মহাজনেরা দিয়েছিল মোট ঋণের শতকরা ৪৪.৮ ভাগ আর কৃষিগত মহাজনেরা ২৫ ভাগ, আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে (বিনাসুদে?) ১৪.২ ভাগ। ছোট কৃষকরা সরকার ও সমবায় থেকে তাদের মোট ঋণের শতকরা মাত্র ২ ও ১.৭ ভাগ পেয়েছিল। আর এই সব ঋণের সুদের হার ছিল শতকরা ২৫ থেকে ৫০, কোথাও তারও বেশি। সারা ভারতে গ্রামাঞ্চলের সমস্ত পরিবারের গড় ধরলে, পরিবার পিছু ঋণ ছিল ১৬০ টাকা। গড়ে প্রত্যেক কৃষক পরিবারের ২১০ টাকা এবং অকৃষক পরিবারের ৬৬ টাকা। আর শুধু ঋণগ্রস্থ পরিবারদের ধরলে প্রত্যেকের গড়ে ঋণ ছিল ৩০৯ টাকা, প্রত্যেক কৃষক পরিবারের গড়ে ৩৫৮ টাকা, অকৃষক পরিবারের ১৭১ টাকা।

দ্বিতীয় সার্ভে হয় ১৯৬১-৬২ সালে, সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ ও বিনিয়োগ সার্ভে। তখন মোট গ্রামীণ ঋণের পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল ২৪৮৯ কোটি টাকা। সারা ভারতে প্রত্যেক পরিবারের গড়ে ঋণের পরিমাণ, কৃষকদের ক্ষেত্রে ২০৫ টাকা, অকৃষকদের ১১২ টাকা। কেবলমাত্র ঋণগ্রস্থ পরিবারের হিসাবে গড়ে প্রত্যেক কৃষক পরিবারের ঋণের পরিমাণ ৩৯৫ টাকা, অকৃষক ৮০ টাকা।

এই সব ঋণের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য সংসার খরচ চালানো। যে পরিবার যত গরীব, তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন তত বেশি। পেট বড় বালাই।

মোট ঋণের সবচেয়ে বড় অংশ শতকরা ৩৬ ভাগ আসে কৃষিগত মহাজনী থেকে। পেশাদার মহাজনরা ১৩.২ ভাগ। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮.৭ ভাগ। অবশ্য প্রতিষ্ঠানগত ঋণের বেশি অংশ পায় উপরের স্তরের লোক। বড় ও মাঝারী কৃষকরা সমবায় ঋণের বড় অংশটা পেয়েছে। ছোট কৃষকদেব ভাগ্যে জুটেছে কম।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ঘোষণায়, কৃষকরা অল্প সুদে ঋণ পাবার সুবিধা হয়েছে, এ প্রচার, প্রচারই। ১০ই নভেম্বর ১৯৭০ অর্থমন্ত্রী রাজ্যসভায় বলেছেন, জুন ১৯৬৯ থেকে এপ্রিল ১৯৭০ এর মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ১০·৩ ভাগ। কৃষির জন্যে অতি সামান্য।

অভিযোগ: মহাজনী ঋণের সামন্তবাদী শোষণ অব্যাহত থাক, এই-ই আজকের ভারতের সমাজতন্ত্র!

এরপর আছে ক্ষেত-মজুর। অস্থায়ী চাকরী। ভাগ্য যাদের ভাল তারাই স্থায়ী। রোজ মজুর এবং মরসুমী মজুর হিসাবে কাজ করে এরা। কাজ করো, পয়সা নাও। কাজের জন্যে মজুর, মজুরের জন্যে কাজ নয়! এবং এই মজুরদের সংখ্যা বড় কম নয়। ১৯৬১ সালের সেন্সারে বেকার ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা দেখানো হয়েছিল ১৪ লক্ষ। অবশ্য সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতে ১৯৬১ সালে প্ল্যানিং কমিশনের আনুমানিক হিসাব—বেকার ক্ষেত-মজুতদের সংখ্যা ৭০ লক্ষ।

সেন্সারের হিসাবে ১৯৬১ সালে সারা ভারতে ১৫ বছর ও বেশি বয়েসের শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৫৬ লক্ষ, তার মধ্যে ১২ কোটি ৬০ লক্ষ স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে। ১৯৬৯ সালে ২১ কোটি ১০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ খেত-খামারের স্থায়ী অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত।

১৯৪৮ সালে যে নিম্নতম মজুরী আইন পাশ হয়েছে তা আইন-রূপেই সীমাবদ্ধ আছে। দর বেড়েছে, মজুরী বাড়ে নি। ১৯৬০ সালের পর কতকগুলি রাজ্যে দর বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে সংশোধন করা হয়নি।

সামান্য নমুনা—

কেরালা ৪·৫০, অন্ধ্র ১·৫০ থেকে ৩·০০, গুজরাট ১·২৫ থেকে ৩·০০, পাঞ্জাব-হরিয়ানা ১·৫০ থেকে ২·৫০, মধ্যপ্রদেশ ০·৯০ থেকে ১·৩৫, উড়িষ্যা-উত্তর প্রদেশ ১·০০ থেকে ১·০৮ টাকা।

১৯৬৪-৬৫ সালে যখন খেত মজুরদের মজুরীর হার অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল তখন সারা ভারতের গড় রোজ মজুরী ছিল ২.৯৭ টাকা। কয়েকটি রাজ্যে পুরুষ শ্রমিকের মজুরীর হিসাব ছিল এই: কেরালা ৫.১৯, পাঞ্জাব ৪.২০, গুজরাট ৩.১০, অসাম ৪.৮০, বিহার ২.৯৪, মহারাষ্ট্র-পশ্চিমবঙ্গ ৩.৪৮, জম্মু-কাশ্মীর ১.৯৩, মধ্যপ্রদেশ ২.৩৯ টাকা (তবে এ ছিল সাময়িক বৃদ্ধি)।

গ্রাম ভারতে জীবিকার নিম্নতম স্তর প্রত্যেকের জন্যে ১৯৬০-৬১ তে দ্রব্যমূল্যের হিসাবে মাসিক ১৫ টাকা। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের তথ্য অনুসারে ১৯৬০-৬১, ১৯৬৭-৬৮র মধ্যবর্তী কালে এই সর্ব নিম্নস্তরের নীচে যাদের আয়, সারা ভারতের গড়ে তাদের সংখ্যা বেড়ে যায় শতকরা ৪০ ভাগ (৩৮.০৩ থেকে ৫৩.০২)। বাড়ে আরো বেশি হারে পশ্চিমবঙ্গে (২২.১৪ থেকে ৬১.২৪) ও পাঞ্জাবের (১৩.৫৬ থেকে ৩২.৯২)। উড়িষ্যায় ছিল শতকরা ৬৮.৮৮, বেড়ে হয় ৭২.০৪।

আর বেকার সংখ্যা?

সরকারী হিসাব অনুযায়ী, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫৩ লাখ থেকে দ্বিতীয়তে ৭১ লাখে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে হল ৯৬ লাখ। পরিকল্পনা শূন্য ১৯৬৬ ৬৯-এ ১ কোটি ৫৬ লাখ। আশা করা যাচ্ছে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে হয়তো সব মিলিয়ে দাঁড়াবে ৩ কোটি ৮৬ লাখ (অবশ্য সরকারী হিসাবে, আর বেসরকারী?)।

এক একটা পরিকল্পনায় দেশের অগ্রগতি বাড়ে। আমাদেরও বেড়েছে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সব কিছুই: বেকার বাড়ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে, জন্মহার বাড়ছে, রাজনৈতিক দলাদলি বাড়ছে, সভ্যতার নামে ব্যাভিচার বাড়ছে, নিরাপত্তার অভাব বোধ বাড়ছে, বাড়ছে মিথ্যাচার, খুন রাহাজানি, কালোবাজারী বাড়ছে, পতিতালয়ে স্থান না হওয়ায় রাস্তা ঘাটে পতিতার সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে হিন্দী ছবির বেলেল্লাপনা, বাড়ছে যুব চিত্তের অস্থিরতা, অজন্তা ইলোরার গাত্রে খোদাই ভাস্কর্যের

জীবন্ত নিদর্শন, বাড়ছে ইয়াঙ্কি সভ্যতার চোঙা প্যান্ট, হিপি জুলপি, বাড়ছে কাফে রেস্তোরাঁ। বারে ভিড়, বাড়ছে আধুনিক কায়দার হোটেল-গুলিতে নর্তকীদের নগ্নত্বের প্রতিযোগিতা, সাহিত্যের নামে নগ্ন ছবি ভরা যৌনাঙ্গে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্যে পিন আঁটা কেবল মাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যে পত্রিকা, বাড়ছে দেশ সেবকদের মিথ্যাচার, ফাঁকা আওয়াজ ভরা প্রতিশ্রুতির প্লাবন, সেই সঙ্গে বাড়ছে শান্তি রক্ষকদের অবাধ নির্যাতন।

বাড়ছে না কি? সবই তো বাড়ছে। আমরা এগিয়ে চলেছি!

কোথায় চলেছি?

কোথায় চলেছি আমরা?

জানেন মাষ্টার মশাই, আমরা বড় বেশি অনুকরণ প্রিয়। অন্যে যা করে তাই করতে যাই আমরা। কিন্তু কেন করে, কি ভাবে করে, তার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টাটুকু করিনা। অন্যে করছে, অতএব আমাকেও করতে হবে, ব্যাস। বলেন পাশের বেডের ভদ্রলোক।

হঠাৎ কথাগুলো শোনার পর বিনোদ অনেকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এক সময় জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কার কথা বলছেন?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক যেন একটু বিস্মিত হলেন। বিনোদের কথাটা তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, কার কথা বলবো বলুন?

—কিন্তু কথাটা যখন বললেন······

তাকে থামিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, এ কথাটা আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

—ব্যতিক্রম কি নেই? হাসি মুখেই জানতে চাইলো বিনোদ।

—ব্যতিক্রম? একটু চিন্তা কলেন ভদ্রলোক। বললেন, আছে, কিন্তু তা না থাকারই সামিল। না থাকলেই বুঝি ভাল হতো, বুঝলেন? মন্দের ভিড় এতো বেশি যে, ভালরা হারিয়ে যাচ্ছেন। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভাল ভাল প্রচেষ্টাগুলি। শিব গড়তে বাঁদর গড়া বলে একটা কথা আছে জানেন তো, ঠিক যেন……

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো বিনোদের। ভদ্রলোকের কথাগুলো অনধিকার চর্চা বলে মনে হল তার। মনে হল ভদ্রলোক বড্ড বেশি হীনমন্যতায় ভুগছেন। অক্ষম-সমালোচক হয়ে পড়েছেন। সেই প্রথম সে ভদ্রলোকের নাম ধরে সম্বোধন করলো। বলল, দেখুন অমূল্যবাবু, কিছু মনে করবেন না, আমাদের সকলেরই নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কি কথা, কাজ করা উচিৎ।

বিনোদ এভাবে তাঁকে বলবে অথবা বলতে পারে, এ যেন তিনি আশা করেননি। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, তা তো বটেই।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সায় দিল বিনোদ। বলল, ভাল জিনিষকে মন্দ দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা উচিৎ নয়। জ্ঞানী-গুণী তপস্বী যাঁরা, তাঁদের কাজকে সব সময় মন্দভাবে সমালোচনা করবেন? দেশের চরম দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে ক্ষুধার কাব্য ছাড়া আর কিছু লেখা হবে না, হওয়া উচিত নয়, বলতে চান?

—আমি কি সে কথা বলেছি?

—মুখে বলেননি বটে, কিন্তু কটা দিন আপনার ব্যবহারে যেন তাই প্রকাশ পাচ্ছে। আমি ভেবে উঠতে পারছি না, আপনি আমাকে ঘৃণা করেন কিনা?

—ছিঃ ছিঃ। এ কি বলছেন আপনি?

—বলছি অনেক দুঃখে। বিশ্বাস যেন আজ খেয়ালের খেলা মাত্র। অবিশ্বাসের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে।

চুপ করলো সে। চুপ করে রইলেন অমূল্যবাবু। বিনোদের মনটা হঠাৎ যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছে,……

কথাটা চিন্তা করার আগেই অমূল্যবাবু ডাকলেন, মাষ্টার মশাই।

—বলুন। তাঁর দিকে চাইলো সে।

—আপনি কিছু মনে করবেন না মাষ্টার মশাই।

—আমি ব্যক্তিগত ভাবে কিছু মনেও করিনি।

—তাহলে ?

—আমাদের প্রতি আপনার কটাক্ষপাত মেনে নিতে আমার দুঃখ হয়।

—কিন্তু মাষ্টার মশাই………

—জানি আপনি কি বলবেন। আমি অস্বীকার করি না, আবার নির্দ্বিধায় মেনে নিতেও পারি না। কারণ, আমাদের সম্মান অসম্মানের প্রশ্ন জড়িত।

—সম্মান অসম্মানটাই কি বড় ?

—আজ আর হয়তো তা নয়। অভিযোগের অন্ত নেই, তাও জানি। কিন্তু কেন এমনটা হয়েছে, কাদের জন্যে হয়েছে সেটাও ভেবে দেখবার বিষয়। শিক্ষার পবিত্রতা শুধুমাত্র শিক্ষকদের জন্যেই কলুষিত হয়নি, শিক্ষা-নীতিও দায়ী। আর্থিক সমস্যাটা যে আজ বড় কম হয়ে দেখা দেয়নি জীবনে। জীবন যুদ্ধে লড়াই করার জন্যে আজ যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, শিক্ষকতা করেও বাঁচতে চান অনেকে। সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার অভাবই এর একমাত্র কারণ না হলেও, একটি কারণ নিশ্চই।

মনে পড়েছিল কবছর আগের কথা। পশ্চিমবঙ্গে সুলভ মূল্যের বই বিতরণের অব্যবস্থাটাকে। বই-ব্যবসয়ীদের মারফৎ সে সমস্ত বই বিলি-ব্যবস্থা ছিল। ফলে কালোবাজারী সুরু হয়েছিল সে

সমস্ত বই নিয়ে। কালোবাজারী কি ব্যবসাদাররা নিজেদের স্বার্থে করতো ? হ্যাঁ, নিজেদের স্বার্থেই করতে বাধ্য হোত—তবে সরকারী সৎ-কর্মচারীদের চাহিদা পূরণ করে লোকসান তোলার জন্যেই করতে বাধ্য হোত। কিশলয়ের দাম, ষাট পয়সা—বোধিকা তিনটাকা চল্লিশ পয়সা। আজও সেই ব্যবস্থা অব্যহত গতিতে চলছে।

পাঠ্য পুস্তক শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। পাঠ্য-অপাঠ্যের অনুমোদন দেন শিক্ষা পর্ষদ। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা স্কুল-পাঠ্য উপযুক্ত পুস্তকগুলিকে অনুমোদন করেন। চলে টাকার খেলা। শিক্ষা বিভাগের হোমরা চোমরার দল তাঁদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের লিখিত বই জেলায় জেলায় পাঠ্য করার ব্যবস্থা করেন। বিক্রী বাবদ সম্মান দক্ষিণা পকেটস্থ হয় তাঁদের। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বইখানি লেখানো হয় কোনো না কোনো পেশাদারী শিক্ষক লেখককে দিয়ে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে বইখানি লিখে দিয়েই তিনি দায়িত্ব-মুক্ত। কারণ প্রকৃত লেখকের নাম সে বইতে থাকেনা।

পাঠ্য পুস্তক নিয়ে চলেছে ব্যাপক কালো বাজারী। মাত্র তিনটি মাসের ব্যবসা। হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ টাকার লেন-দেন। যত তাড়াতাড়ি বই ছেপে বার করা যায়, লাভ ততই। ইঞ্চির স্কেলের ছবি ছাপা হয়, মাপ লেখা হয় সেন্টিমিটারের। দালালের দল বেরিয়ে পড়ে জেলায়-জেলায়, গ্রামে-গ্রামে।

গত বছর বার্ষিক পরীক্ষার পর এমনি দালালদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল বিনোদের। মাষ্টারমশাই খান পাঁচেক বিজ্ঞানের বই পড়তে দিয়েছিলেন তাকে। বলেছিলেন, বইগুলো ভাল করে পড়ো বিনোদ, যে খানা উৎকৃষ্ট মনে হবে, আমাকে বোলো।

বইগুলো পড়েছিল সে। প্রতিটিই প্রায় নিকৃষ্ট রচনা। অনেক দিন আগে পড়া কোন বিষয়ের যেন মিল খুঁজে পেয়েছিল একখানি বইতে। এমন কি ভাষাটা পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়নি। শুধুমাত্র বইয়ের নাম আর লেখকের নাম আলাদা।

এসেছিল ভদ্রলোক ক্যানভাসার। তখন মাষ্টারমশাইয়ের কাছে উপস্থিত ছিল সে। ভদ্রলোককে দেখে প্রথমটায় চিনতে পারেন নি তিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি চাই?

ভদ্রলোক বলেছিল, আমার বইটার জন্যে—মানে.........

চিনতে পেরেছিলেন মাষ্টারমশাই; গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনাকে তো আমি বলেই দিয়েছিলাম, বই যদি পড়ে ভাল লাগে নিশ্চই পাঠ্য করবো। কারণ যে বইখানা এখন পাঠ্য হয়ে আছে, বইটা সত্যিই ভাল বই।

ভদ্রলোক বলেছিল, কিন্তু স্যার, ও কোম্পানী তো উঠে গেছে। এবারও যদি ও বইটা পাঠ্য হিসাবে রাখেন তাহলে আপনার ছাত্ররা বই পাবে না।

চিন্তিত হয়েছিলেন মাষ্টারমশাই। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সত্যিই উঠে গেছে?

—আমি কি মিথ্যা কথা বলছি স্যার? অভিমান ফুটেছিল ভদ্রলোকের কথায়।

—না-না, তা নয়। বিব্রত হয়েছিলেন মাষ্টারমশাই। বলেছিলেন, বইটা যেমন ভাল ছিল তেমনি দামেও সস্তা। ওই প্রতিষ্ঠানের একখানা সংস্কৃত বই আর নোটও আছে আমাদের।

—আমি তো স্যার সংস্কৃত আর নোট বই দিয়ে গেছি। নোটটা অবশ্য গত বছরের ছাপা। এবার সামান্য কিছু দাম বাড়বে। বুঝতেই তো পারছেন, কাগজ, ছাপা সব কিছুরই দাম বেড়েছে। বই বেচে তো লোকসানই দিতে হয়, যা দু-চারটে পয়সা ওই নোট বেচে।

—ঠিক আছে, সংস্কৃত বইটার ব্যাপারে কি করা যায় পণ্ডিত মশাইয়ের পড়া হলে জানতে পারবো। তবে বিজ্ঞান বইটা চলবে না।

—কিন্তু ওই কোম্পানী তো উঠে গেছে।

মাষ্টারমশাই বলেছিলেন, তার জন্যে নয়, বইটা ঠিক আমাদের মনঃপুত হচ্ছে না।

—কিন্তু স্যার, বইটা তো ভাল। তিনটে জেলার অধিকাংশ স্কুলে পাঠ্য হয়েছে। সব মাষ্টারমশাই বলেছেন, বইটা সত্যি সুন্দর। হবে না কেন বলুন, কে লিখেছেন দেখতে হবে তো? ভদ্রলোক বর্তমানে যাদবপুরে রিসার্চ করছেন।

মাষ্টারমশাই বলেছিলেন, আজ্ঞে না, তবুও ওটা পাঠ্য করা যাবে না।

—দেখুন না একটু চেষ্টা করে।

—মাপ করবেন।

মাষ্টারমশাইয়ের কথা শোনার পর একটু ইতঃস্তত করেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর বলেছিলেন, যদি পাঠ্য করতেন তাহলে কিন্তু ...

—কি?

—শ-দুই......

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিল মাষ্টারমশাইয়ের। তাঁর শীর্ণ মুখমণ্ডল থমথমে আকার ধারণ করেছিল। অস্বাভাবিক শীতল কণ্ঠে বলেছিলেন, আমার কাজ আছে।

চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল ভদ্রলোক। মাষ্টার মশাইয়ের সেই গম্ভীর মূর্তি দেখে ভয় ভয় করেছিল তার। তিনি কিন্তু হেসে ফেলেছিলেন।

অবাক বিনোদ জানতে চেয়েছিল, হাসছেন যে?

—না হেসে পারছি না বলেই হাসছি। উত্তর দিয়েছিলেন তিনি। ভাবছি, যত দিন যাচ্ছে এ সমস্ত কি হচ্ছে? পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এ যে চোরাবাজার সুরু হয়ে গেল।

বিনোদ বলেছিল, এ কথা বলছেন কেন?

—বলছি অনেক দুঃখে। শিশু শিক্ষার যে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ,

দ্বিতীয় ভাগ পরিচয়-শূন্য হচ্ছে বর্তমানের শিশুর কাছ থেকে। এসেছে ছবি ছাপা বই। জল পড়ে—পাতা নড়ে নয়, রাম ভাত খায়—দাদা খুক খুক কাশে। কি সুন্দর ছন্দ, মিল বলতো? বুনিয়াদি ধারাপাত,শিশু ধারাপাত অবশ্য সচিত্র। ফার্ষ্ট-বুক অন্তিম শয্যায়। শিক্ষার মান বেড়েছে কি কমেছে, সে বিতর্কে না প্রবেশ করাই ভাল, তবে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় পাশ করলে অবিভাবকের রাত্রের ঘুম চলে যায়। একটু উঁচু ক্লাসের যদি গোটা তিনেক ছেলেমেয়ে থাকে, তাহলে এক মাসের মাইনের পুরো টাকাতে বই কিনতে কুলোয় না। তুমি নিজেও তো দেখেছো কত ছেলের বই নেই। কিন্তু বছর বছর বই পাল্টানো হচ্ছে।

—আপনি তো পাল্টাতে চান না?

—নিশ্চই চাই। তবে বছর বছর নয়। আর যদি দেখি যা আছে তার চেয়েও ভাল বই পেয়েছি, তবে। তবে যখন পাল্টাবার হুকুম হয় তখন পাল্টাতে বাধ্য। তবে·········

চুপ করে গিয়েছিলেন তিনি। বিনোদ বুঝতে পেরেছিল তিনি কি বলতে চান। অভিযোগ তারও কি কিছু কম? নিষ্ফল অভিযোগ আজ অবিভাবক কূলের। অক্ষর পরিচয়ের পর স্কুলের গণ্ডিতে পা দিলেই বইয়ের পাহাড়। কত ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে, ভালভাবে হাঁটতে শেখেনি, কথা বলতে শেখেনি, বইয়ের পাহাড় বয়ে স্কুলে চলেছে। স্কুলে চলেছে পড়ার জন্য নয়, পড়া দেওয়ার জন্য। অপরিণত বুদ্ধি, কচি-কাচা মনে অনু পরমাণুর বিশ্লেষণ। কারণ, শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র আমাদের দেশের তুলনায় আরো বিস্তৃত, পরিণত। শিক্ষা দপ্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তি সরকারী খরচে ছমাসের বিদেশ ভ্রমণে সেখানকার শিক্ষা ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে এসেছেন। দেখেছেন, আর নিজের দেশের শিক্ষার মানের সঙ্গে তুলনা করে লজ্জায় মরে গেছেন। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! এখানকার একটি ছোট ছেলে কত কি জানে, কত সুন্দরভাবে জ্ঞানের বিকাশ

ঘটছে। ছো-ছো, এই না হলে চলে। আন্তর্জাতিক মান কত সুষ্ঠ, সুন্দর।

মাথায় অজস্র পরিকল্পনা। প্রথম শ্রেণীর হোটেলে রাত্রের সুখ-শয্যায় ঘুম নামে না চোখের পাতায়। মনে মনে দুরন্ত প্রতীক্ষা, একটা কিছু করতে হবে। সরকারের পয়সায় বিদেশ ভ্রমণ ব্যর্থ হতে তিনি দেবেন না। ব্যর্থ হতে দেওয়া মানেই অজস্র অর্থের অপব্যয়।

ফিরে আসেন তিনি একদিন। ফিরে আসেন অজস্র কেনাকাটা করে। পরিচিত জনের উপহার সামগ্রী বিদেশ ভ্রমণের স্মৃতি বহন করে। বললেন, আহা, কি দেখলাম, কি সুন্দর, কি অপূর্ব, কি মনোমুগ্ধকর দেশ, সদ্য ফোটা ফুলের মত তাজা স্নিগ্ধ শিশু, কিশোর কিশোরী, জ্ঞানের খনি তরুণ তরুণী। দেখলাম, শিশু-শিক্ষা কত উন্নত, কত পরিণত। শিশু মনের খোঁজ খবরের জন্য কত সুন্দর পরিবেশ, সুষ্ঠ আয়োজন। শিশু মন কি চায়, কতটুকু গ্রহণ ক্ষমতা তার, সেদিকে কত সজাগ দৃষ্টি। কত সুন্দর স্বাস্থ্য সব। দেখে মনে হচ্ছিল দেব-শিশু যেন। হবে না কেন, শিশুরাই যে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

সেখানে আমাদের দেশের শিশুরা? ছিঃ-ছিঃ, লজ্জায় ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছা করে। আমাদের দেশের বাপ-মা গুলো বড় বজ্জাত। নিজেরা খেয়ে খেয়ে হজম করতে না পেরে ধুঁকবে, বাচ্চাগুলোকে খেতে না দিয়ে হাড় জির-জিরে করে রাখবে। আবার স্বপ্ন দেখবে, আমার ছেলে রবীন্দ্রনাথ হবে, মাইকেল হবে, বিদ্যাসাগর হবে!

কিন্তু, আমাদের দেশের ছেলেকে বিদ্যাসাগর করতেই হবে। শ'য়ে-শ'য়ে, হাজারে হাজারে বিদ্যাসাগর তৈরি করে তুলবো আমরা। বিদ্যাসাগরও খেতে পেতেন না, পড়বার জন্যে রাতে আলো পেতেন না। তাহলে আজ আমাদের দেশের ছেলেরা, বিদ্যাসাগরের দেশের ছেলেরা, কেন শ'য়ে শ'য়ে বিদ্যাসাগর তৈরি হবে না? নিশ্চই হবে। আমরা বিদ্যাসাগর তৈরি করবো। দশ কেলাস আজ এগারো হয়েছে,

বারো করব, চোদ্দ করব। ছেলেরা পারবে না, অস্বাভাবিক চাপ পড়বে ? পড়ুক। লেখাপড়া সাধনার জিনিষ। কষ্ট না করলে সাধনায় সাফল্য আসেনা। সাধনা করতে হলে সমুদ্রে সাঁতার দিতে হয়। সাঁতার দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। সাঁতার দেবে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা। পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে, নতুন নতুন বিষয়বস্তু সংযোযন করতে হবে। এখন যদি শিশু-শিক্ষার ছ খানা বই থাকে, তাকে ছত্রিশ খানা করতে ও কুছ পরোয়া নেই। কঠিন থেকে কঠিনতর করতে হবে শিক্ষাকে। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে হবে। শিক্ষার মিক্সচার বানিয়ে জোর করে গেলাতে হবে ছেলেমেয়েদের। অপুষ্টি, অর্দ্ধাহার, অনাহারের দোহাই চলবে না। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পাশ্চাত্য যদি এগিয়ে যেতে পারে, আমরা কেন পারব না ?

নার্স এসে দাঁড়াল বিনোদের সামনে। হাতে রাংতায় মোড়া বড়ি, জলের গ্লাস। সাদা পোষাকে পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। মুখে মৃদুহাসি। বললেন, হাঁ করুন।

—আমাকে দিন। বড়িটা চেয়ে নিল সে। জলের গ্লাস নিয়ে জল খেল। জিজ্ঞাসা করলো, আজ তো ডাক্তারবাবু এলেন না ?

—না, আজ ওনার অফ্‌ডে।

—আমার অফ্‌ডে কবে ?

—জানি না। তবে আগামীকাল আপনি কেবিনে যাচ্ছেন।

—কেবিন ?

—হ্যাঁ। কাল সকালেই একটা কেবিন খালি হচ্ছে।

—কেন ?

হেসে ফেললেন নার্স। বললেন, আপনার আত্মীয়রা প্রথমেই কেবিন চেয়েছিলেন। ভর্তি ছিল সবকটাই।

—ও! বলে একটু নীরব রইলো সে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। একা থাকতে হবে তকে। পাশে বেডের দিকে চাইলো। বেড শূন্য। কেউ নেই সেখানে। জিজ্ঞাসা করলো, ভদ্রলোক গেলেন কোথায়?

হাসলেন নার্স। বললেন, হয়তো বাথরুমে।

—হয়তো কেন?

—আমাকে তাই বললেন। দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন।

—কোথায় গেলেন?

—হসপিটালের পাশে দোকানগুলোতেও গিয়ে বসতে পারেন।

—সেকি! যাওয়া যায় নাকি?

—কেন যাওয়া যাবে না। অনেকেই তো যান। হসপিটালের খাবার খেয়ে অরুচি ধরা মুখটাকে বাইরের খাবারে একটু পালটে আসেন।

—আপনারা কিছু বলেন না কেন?

—আমরা? হাসলেন নার্স। বললেন, অনেক বলেছি আমরা। রোগী যাতে বাইরে না যান তার চেষ্টাও কিছু কম করিনি। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।

—কিন্তু রোগীরা যদি এভাবে বাইরে গিয়ে যা-তা খেয়ে আসে, তাতে রোগ বাড়বে ছাড়া কমবে না? এর জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তো।

—কিন্তু ব্যবস্থা নেবে কারা? আমরা? একটু নীরব রইলেন তিনি। বললেন, আমরা পেটের জন্যেই চাকরী করতে বেরিয়েছি বিনোদবাবু। আমাদেরও মান-সম্মান আছে। জানি, আমরা সকলেই ভাল নই। আমাদের অনেকের ব্যবহারই রোগীদের প্রতি

খুব একটা ভাল নয়। অনেকেই আমরা রোগীদের দয়ার পাত্র জ্ঞানে সেবা করি। হয়তো বা ডিউটি বজায় রাখি। কিন্তু সকলেই সমান নয়। সকলেই রোগীদের হেয় জ্ঞান করে না। অন্তরের তাগিদ অনুভব করে সেবায়। কিন্তু রোগীদের তরফ থেকে অনেক সময় অনেক কটূক্তি শুনতে হয়। বাইরে যেতে বাধা দিলে অপমানিত হতে হয়। প্রতিকার নেই।

—কিন্তু রোগীদের অভিযোগ…… ..

—হ্যাঁ, অভিযোগ আছে। অভিযোগ মিথ্যাও নয়। আমরা বড় অসহায়। চাকরী বাঁচাবার জন্যে অনেক কিছুই……আবার ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের অনেকেই রোগীকে অবহেলা করে। কারণ, সে জানে ……

হেসে ফেলল বিনোদ। বলল, তাহলে দেখছি অদ্ভুত আপনাদের জীবন। লঙ্কায় গিয়ে রাবণ যে না হতে পারবেন তাঁরই ভাগ্যে জোটে লক্ষণের শক্তিশেল? কিন্তু এসব কথা আমার কাছে আপনার প্রকাশ করা উচিৎ হল কি?

—লাভ অথবা লোকসানের ভয় নেই বলেই বললাম। হাসলেন তিনি। বললেন, আমাকে একটা সত্যি কথা বলবেন?

—বলুন কি জানতে চান?

—কারা আপনাকে এভাবে……

—আমি নিজেও ঠিক জানি না। একবার মনে হয়, আমি রাজনীতির শিকার, অবশ্য ঘটনা চক্রে। যদিও আমার জীবনের একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়, তা নয়। যেন সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের আভাস পাই আমি। কাগজে দেখি হত্যার রাজনীতি সুরু হয়েছে বাংলা দেশে। হিংসার উন্মত্ত প্রকাশ। সত্য সত্যই হিংসার উন্মত্ত প্রকাশ ঘটছে বাংলা দেশে। কিন্তু তাকি রাজনৈতিক কারণে? একজন বৃদ্ধ, একটা বাদাম ভাজাওয়ালা কি রাজনীতি করতো? বৃদ্ধকে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু বাদাম ভাজাওয়ালাকে?

হিংসা দমনে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের চেষ্টার ত্রুটি নেই। সি, আর, পির গুলি বর্ষণে নিহত হয় বাড়ির বারান্দায় বসা যুবক, আহাররত অফিস যাত্রী পিতা। কারণ, লক্ষভ্রষ্ট। সত্যই কি তাই? দেখি প্রকাশ্য দিবালোকে মুণ্ডহীন দহ জাতীয় নেতার। আশে-পাশে পাহারারত পুলিশ। দেখি সন্ত্রাস দমনের নামে পুলিশের নতুন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি। বাড়ি-বাড়ি অবাধ তল্লাসী। শান্ত নীরিহ ছেলেটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে অকথ্য নির্যাতন। একমাত্র যুক্তি, যেহেতু ছেলেটি বলিষ্ট স্বাস্থ্যের অধিকারী অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক সেই হেতু যে দুষ্কৃতকারী। অথচ দেখি প্রকৃত দুষ্কৃতকারীর দল অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশের লিষ্টে তাদের নাম ওঠেনি। বাংলার যুবশক্তিকে শেষ করে দেবার ষড়যন্ত্র। বাংলাকে···

······যাক, অতটা বলার দুঃসাহস আমার নেই। তবে আমার মনে হয় যা ঘটছে তার মধ্যে একটা গোপন কারণ নিশ্চই আছে। কিন্তু কি সে কারণ, আমি জানিনা। তবে আমার যতদূর মনে হয়, হিংসায় হিংসা বাড়ে। হিংসা আজ বাড়ছে সত্যি কথা, তবে হিংসা দমনের নামে হিংসাকে আজ আরো বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

—এর জন্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোই দায়ী।

—কিছুটা যে দায়ী তা অবশ্যই আপনি বলতে পারেন। মূলে ভুল বোঝাবুঝি। গোষ্টিস্বার্থ বড়। সাধারণ মানুষের জন্যে সকলে চিন্তা করেন না। তা যদি করতেন তাহলে সবাই মিলে-মিশে প্রকৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেন। ভেদনীতিবাদ এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো না।

নীরব হল বিনোদ। নার্সও একটু নীরব রইলেন। একসময় বললেন, আপনার কি মনে হয়?

—আমার?

—হ্যাঁ।

—আমার কিছু মনে হয়না। সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। প্রশ্ন জাগে, একি হচ্ছে ? কেন হচ্ছে এমন অবস্থা বাংলার ? শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে কি ? অন্য কোন ষড়যন্ত্র লুকিয়ে নেইতো ?

চোখ বুজলো বিনোদ। বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে তার নিজেকে। ধীরে ধীরে চলে গেলেন নার্স।

পরক্ষণে চোখ মেলল সে। বাইরে বেলা শেষের রোদ্দুর। হলঘরটা রোগীতে ভর্তি থাকলেও শান্ত-নীরব। খানিক পরেই ভিজিটারদের আসা যাওয়া সুরু হবে। গুঞ্জন উঠবে হল ঘরটার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

বুঝলে মাষ্টার, তুমি রাগই করো আর যাই করো, তুমি হচ্ছো সংকীর্ণতাবাদী। সব সময় ঢাক-ঢাক। নগ্ন সত্যটা প্রকাশের বড় ভয় তোমার।

কথাগুলো বলেছিল কমল। মনে পড়লো বিনোদের। অভিযোগ জানিয়েছিল, তুমি একচক্ষু হরিণ।

হেসেছিল সে। বলেছিল, তোমার অভিযোগ অস্বীকার না করেও আমি বলছি আমি সত্য শিব ও সুন্দরের পূজারী। আমি দেশ-দশের ভাল কামনা করার সঙ্গে নিজেরও ভাল চাই।

—তুমি স্বার্থপর।

—কিন্তু আত্ম সর্বস্ব নই। আমি শান্তি চাই।

—তুমি কি বলতে চাও, অশান্তি সৃষ্টি করছি আমরা ? আমাদের দল অশান্তি করছে ?

হেসেছিল বিনোদ। বলেছিল, সেকি, তুমি না কথায় কথায় বল, তুমি কোন দল করো না ?

—তবু আমি সমর্থন করি। দলবাজি না করলেও সমর্থন করা যায়। আমি একজন সমর্থক। সেই জন্যেই বলছি, তোমার

—না কমল, নষ্ট বলে কোন কথা নয়। আমি চাই মানুষ বাঁচার প্রকৃত অধিকার ফিরে পাক। তুমি আমাকে বলেছো, আমাকে বলে দাও, আমাদের ভুল কোথায়। তেমনি তোমরা, যারা মানুষের ভাল চাও—কোথায় ভুল সেটুকু মিটিয়ে নাও। সত্য পথকে গ্রহণ করো।

—তুমি কি করবে?

—আমি? হেসে ফেলেছিল সে। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, শুধু আমি কেন কমল, প্রতিটি সাধারণ মানুষ তোমাদের সঙ্গে—একসঙ্গে। কিন্তু তার আগে মিলিয়ে ফেল তোমাদের দলাদলির রাজনীতি।

অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে ছিল কমল। বলেছিল, তুমি দাদাল!

—দাদাল?

চিন্তা করলো বিনোদ। সত্যিই কি সে তাই?

দুঃখ হতাশা ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তার বুকের মধ্যে। মানুষের বাঁচার লড়াইকে সেও সমর্থন করে। রক্তের পঙ্কিল আবর্ত দেখে সন্দেহের ছায়া উঁকি দেয় তার মনে। প্রশ্ন জাগে, কোন্ দুষ্ট চক্র এসব ঘটাচ্ছে?

সন্দেহ, শুধু সন্দেহ। দেখা দেয় সংশয়। আতঙ্ক জাগে। মনে পড়ে যায় অতীত। দুঃস্বপ্নের রাত্রি প্রভাতে নবজীবনের অরুণোদয় তো হয়নি। তা যদি হবে তাহলে কেন আজ হিংসা আর রক্ত-খেলার মাতন। কেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সংকীর্ণতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, ভেদনীতির প্রাধান্য দেখা যায়? সাম্প্রদায়ীকতার তাণ্ডব লীলা জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে মারাঠাদের উপর শিব-সেনারা চালায় অবাধ গুণ্ডামী। প্রশ্রয় পায় বড় তরফের কাছ থেকে। আসামের 'বাঙ্গাল খেদাও' প্রদেশ আর কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন লাভ করে। শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশে কর্তব্যের শেষ। সুস্থ প্রতিকার স্বার্থ বিরোধী।

কেন? কেন? কেন?

ভারতবর্ষ সেকুলার ষ্টেট। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে সব মানুষের সমান অধিকার।

সত্যই কি তাই? সত্যই কি সমস্ত মানুষ এখানে সমান মর্যাদা সম্পন্ন? এতটুকু পক্ষপাতিত্ব নেই? নেই মানুষকে হীনতায় মানে ফেলে রাখার গভীর চক্রান্ত?

সত্য কথায় বিপদ অনেক। সত্য প্রকাশে পদে পদে লাঞ্ছনার আশঙ্কা। আইনের নাগপাশে ঘিরে ধরার জন্তে ওৎ পেতে আছে সব সময়। সত্য প্রকাশে যে বিপদ, বন্ধু সেখানে নেই। মিথ্যার বেসাতিতে হাজার অংশীদার।

বাংলা মরছে, বাঙ্গালীকে মারা হচ্ছে। বাংলা আর বাঙ্গালীকে শেষ করার জন্তেই বাংলা ভাগ করা হয়েছিল। বাঙ্গালী চিন্তা নায়কদের মূল্যবোধকে অস্বীকারের ষড়যন্ত্র। সুরাবর্দির আপত্তি, শরৎচন্দ্র বসুর বারবার আবেদন ব্যর্থ হয়েছিল স্বাধীনতা লাভের কালে। সংকীর্ণতাবাদে বিশ্বাসী, সাম্প্রদায়ীকতাবাদী মুসলিম লীগ পাকিস্তানের প্রশ্নে স্বার্থের হিসাব কষেছিল মনে মনে।

কমল একদিন বলেছিল, পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের উপনিদেশ।

বিনোদ মেনে মিতে পারেনি কথাটা। প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তার আকাঙ্খার শেষ নেই। সে আশা করে। সে কামনা করে শান্তি।

কমল বলেছিল, মাষ্টার, নিষ্ঠুর সত্যটাকে মেনে নিতে তোমার বড় ভয়। মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে তোমার দ্বিধা। তুমি জানো, কেন্দ্র যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তার অর্দ্ধেকের বেশি এই পশ্চিম বাংলা একাই এনে দেয়। কিন্তু কি পায়, কতটুকু পায়? ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ দিনের পর দিন পুষ্ট হচ্ছে, আর যত দিন যাচ্ছে, ততোই নানান সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। 'ক্রিসিটি' কলকাতা। ইংরেজের অবাধ সহরের ফতোয়া বাঁচিয়ে

রেখে শোষণ করা হচ্ছে কলকাতাকে। কলকাতার নগর জীব আজ বিপর্যস্ত। মাড়োয়াড়ী সম্প্রদায় আজ কলকাতার ভাগ্য নিয়ন্তা। কলকাতার উন্নয়ন শুধু কাগজে-কলমে। শুধু টাল-বাহানা। এখন অবশ্য সামান্য কাজ হচ্ছে। এ সেই ইংরেজের সোহাগ যেন।

—এসব তুমি কি বলছো কমল? প্রতিবাদ জানিয়েছিল বিনোদ।

—বলছি একজন বাঙ্গালী হয়ে। বাংলার প্রতি কেন্দ্রের এই অবজ্ঞা, অবহেলা অসহ্য। এতে হয়তো আমাকে কেউ কেউ প্রাদেশিকতার দোষে দুষ্ট বলবে। বলুক। কিন্তু প্রাদেশিকতা ভারতবর্ষে কোথাও নেই? ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশ আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে। বাংলার কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। বেকার সমস্যা আজ ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশেই। অবাঙ্গালী শিল্পপতি বাংলায় শিল্পক্ষেত্র গড়ে তোলে। অবাধ কর্মসংস্থান হয় অবাঙ্গালীদের। বাঙ্গালী যুবকের দল শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখে। প্রদেশ গভর্ণমেণ্ট ঠুঁটো জগন্নাথ। কোনো ক্ষমতা নেই তার। তোমার মনে আছে মাষ্টার, বাংলার জনদরদী মহান সর্ব ভারতীয় নেতা একদিন ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বাংলার যুবকরা কর্ম-বিমুখ। কিন্তু মাষ্টার, সত্যই কর্ম-বিমুখ নয়, কর্মহীন করে রাখার ষড়যন্ত্র হয়েছে বাংলার যুব-সম্প্রদায়কে। যেহেতু তুমি বাঙ্গালী, সেই হেতু চাকরীর দ্বার সব সময় রুদ্ধ। আজ যদি তুমি হাওড়া ষ্টেশনে কুলিগিরি করতে যাও সেখানে তোমার প্রবেশের অধিকার নেই।

—কিন্তু কুলিগিরি করতে যাবে কি কেউ?

শুধুমাত্র জানবার জন্যেই জিজ্ঞাসা করেছিল বিনোদ। কমল যেন মারতে এসেছিল তাকে। বলেছিল, তুমি কি বিদ্রূপ করছো মাষ্টার? তুমি অবজ্ঞা করছো বাঙ্গালী ছেলেদের?

—না-না, আমি········

—বাঙ্গালীর কাছে আজ বাঁচার প্রশ্নটাই বড়, কাজের প্রশ্নটা নয়।

বাঙ্গালী যে-কোন ভাবে বাঁচতে চায়। শিক্ষার অভিমান তার নেই। তা যদি থাকতো, তাহলে সে বি, এ পাশ করে হকারী করতো না, রেল লাইনে পাথর সরানো কুলির কাজ করতে এগিয়ে যেত না, মাসিক পঁচাত্তর টাকা মাইনের বিনিময়ে ক্যাজুয়াল লেবারের কাজ করতো না। আরো শুনবে মাষ্টার? বাঙ্গালী ছেলে তার বংশ মর্যাদা, শিক্ষা আর বর্ণত্বের অভিমানকে মুছে ফেলে ঝাড়ুদারের কাজও করছে।

—সত্যি?

—আমি একটি বর্ণও মিথ্যা বলছি না। মিথ্যা বলেন আমাদের ভাগ্য বিধাতার দল। মিথ্যা বলেন বিশিষ্ট শিল্পপতিরা, রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে এতটুকু চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করেন না তাঁরা। ভারতবর্ষের অবাঙ্গালীর দল বাঙ্গালীর চরিত্র বিশ্লেষণে আজ অথরিটি। বাঙ্গালী সংকীর্ণচেতা, বাঙ্গালী প্রাদেশিকতায় রুগ্ন।

মনে পড়লো বিনোদের। ১৯৬৯ সালের ৬ই এপ্রিলের ঘটনা। রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে এক জলসাকে ঘিরে হাঙ্গামা ঘটেছিল। সমাজ বিরোধীর দল সদা প্রস্তুত। প্রস্তুত পুলিশও। লাঠি গুলি টিয়ার গ্যাস। দক্ষযজ্ঞ ঘটেছিল ষ্টেডিয়ামে। আহত হয়েছিল বেশ কিছু নর নারী। নিহত কজন। বসেছিল বিচার বিভাগীয় তদন্ত। উদ্যোক্তাদের অব্যবস্থার ফলেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। যদিও তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর উদ্যোক্তারা দুর্ঘটনায় দায়ী হয়ে শাস্তি লাভ করেছিল কিনা, সে জানেনা। দুর্ঘটনা ঘটে, দোষী প্রমাণীত হয়, কিন্তু শাস্তির রেওয়াজ নেই।

সেই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ভারতবর্ষের সংবাদপত্র-গুলো সরব হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন পত্রিকার তরফ থেকে বিভিন্ন দাবী জানানো হয়েছিল। প্রকাশ করা হয়েছিল মতামত।

ঘটনা ঘটার দুদিন পরে বড় বড় হেড লাইনে সংবাদ বেরুলো: রবীন্দ্র সরোবরে ব্যাপক নারী নির্যাতন হয়েছে। হাজার হাজার নারী উলঙ্গ অবস্থায় রাজপথে ছোটাছুটি করেছেন।

ছুটে এলেন শ্রদ্ধেয় নেতা রাজনারায়ণ। বিবৃতি দিলেন, ঘটনার পরদিন ছ লরি ব্রেশিয়ার ধাপায় পাঠানো হয়েছে।

ধন্য রাজনীতি! ধন্য আজকের রাজনৈতিক নেতারা! মাতাল অথবা পাগল রাজনারায়ণের পক্ষেই একথা বলা সম্ভব (অবশ্য যদি তিনি ভিন্ন উদ্দেশে স্বাভাবিক বুদ্ধিতে কথা না বলে থাকেন)।

আরো অনেক কথাই বললেন বাংলা দেশের অনেক গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। বাঙ্গালীর নৈতিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরা হল সমস্ত পৃথিবীর কাছে। ভারতবর্ষ জুড়ে সুষ্ঠভাবে প্রচারিত হতে লাগলো বাঙ্গালী-বিদ্বেষ। বাঙ্গালী যুবকদের হীন পশুত্ব প্রমাণের চেষ্টা চলল সুপরিকল্পিত ভাবে।

একজন বাংলার মহিলা নেত্রী কংগ্রেসের Woman on the March পত্রিকায় এপ্রিল সংখ্যায় লিখলেন,—

"No 'bandh' was thought necessary when the most inhuman atrocities took place at the Rabindra Sarabar on 6th April 1969 evening. No U. F. Minister had visited the houses of the women who were not only divested of their jewels, but stripped of their clothes by the antisocial elements, Naxalites who believe that rape, loot and arson are part and parcel of their movement fed by china.

"The lake has been found strewn with saris and womens' underwears stripped bodies have been recovered from the lake. People living opposite the stadium and nearabouts have, in some cases, given clothes, to the women to save them from uttar shame and humiliation.

লিখেছিলেন,

"Over 50 women are, it is said, missing and they have not beed traced so far. During the congress regime any incident like this was unheard of. Will the men of Bengal tolerate this ?

"From new onwards men who want to be called men must observe the Rabindra Sarabar day on Chaitra Sankranti—and certainly demand :

(a) A public expression of regret from those in power.

(b) Compensation for those who have been worse than killed—the women—who were humiliated in the most barbarous manner known.

"Serely Bengal is not dead—and this molestation of women—their shame and humiliation is shared today by all the women of India. What compensation can there be for dishonour and hnmiliation of the worst type imaginable ? These acts Probably ruined many women for life !"

রাজনারায়ণের বিবৃতি, কংগ্রেস নেত্রীর লেখা, বোম্বাইয়ের একখানি হিন্দী কাগজের প্রচার—বাঙ্গালী তরুণেরা দলবদ্ধভাবে মাড়োয়াড়ী (স্থূলাঙ্গীবাদে) স্ত্রীলোকদের ধর্ষণ করেছে। কলকাতায় বেরুতে পারে না মেয়েরা।

বাঙ্গালী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সেদিন কিছু বিশিষ্ট বাঙ্গালী অপপ্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ; বিনোদের অপপ্রচার মনে হয়েছিল এই কারণেই, সভ্যতার আইনে, মানবতার খাতিরে আজ সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও দুঃখজনক অথবা অন্যায়কর ঘটনা

ঘটলে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হয়। সত্য উদ্ধারের তদন্ত চলে। প্রকৃত সত্য উদ্ধার হয়। দোষী, নির্দোষী প্রমাণ হয়।

ভারতবর্ষের তেইশ বছরের স্বাধীনতা কালে তদন্ত কমিশন গঠনের ঘটনা নেহাৎ কম নয়। সরকারী বেসরকারী বহু তদন্ত কমিশন গঠন হয়েছে। বহু অর্থের অপচয় ঘটেছে। পরিণতি প্রায় ক্ষেত্রেই হাস্যকর। প্রকৃত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর শাস্তি পেয়েছে কিনা, তেমন ঘটনা তার জানা নেই। অথবা ছিঃ, লক্ষ্মী ছেলে, অমন করতে নেই।

সুভাষ চন্দ্রের মৃত্যু রহস্যকে নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন হয়েছে। যা ছিল স্বাধীন সরকারের নৈতিক দায়িত্ব, তা জনমতের চাপে পড়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন পণ্ডিত নেহেরু। সরকারী উদ্যোগে বিদেশ ভ্রমণ করে এসেছিলেন কিছু দেশপ্রেমিক। শাহ নওয়াজ খানের তদন্তকারী দল বিদেশে স্বাস্থ্যোদ্ধার করে এসে জানিয়েছিলেন—নেতাজী মৃত।

নেতাজী মৃত?

মেনে নিতে পারেনি মানুষ। সন্দেহের ছায়া দূর হয়নি মন থেকে। মানুষ যেন জানতো, ভ্রমনকারীর দল এই কথাই বলবে। নেতাজী মৃত, একথা বলতে তাঁরা বাধ্য। কারণ নৈতিক কারণে, কর্তব্যবোধে নয়, জনমতের চাপে অনিচ্ছা সত্বেও যাঁরা তদন্ত করতে স্বীকৃত হন, তাঁদের কাছ থেকে মানুষ এর বেশি কি আশা করতে পারে?

কারণ? কারণ কি একটা! সুভাষ চন্দ্র দেশের শত্রু, সুভায় চন্দ্র জাতির শত্রু, তার চেয়েও বড়, তিনি ছিলেন কংগ্রেসের নীতির শত্রু। শত্রুর জন্যে কিছু করা উচিৎ নয়। তার মৃত্যু ঘটুক অথবা তিনি বেঁচে থাকুন, কি এসে যায় তাতে দেশের ভাগ্য বিধাতাদের।

কি করেছেন সুভাষ চন্দ্র দেশের জন্যে? জাতির জন্যে? ভারতমুক্তির জন্যে?

সুভাষ চন্দ্র যুদ্ধাপরাধী! সুভাষ চন্দ্র ফ্যাসিষ্ট! গণতন্ত্রের মাঝে

সুভাষ চন্দ্রের ফ্যাসিবাদের কোন স্থান নেই। সুভাষ চন্দ্রের নামে যুদ্ধাপরাধীর পরোয়ানা ঝুলুক। তিনি জীবিত অথবা মৃত যাই হোননা কেন, ভারতে ফেরার নির্ভয় প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ থাক তাঁর।

কিন্তু বড় বদ ভারতবর্ষের মানুষের একটা অংশ। তারা বুঝেও বোঝেনা। তারা মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে জানেনা, তারা সত্য জানতে চায়। তারা নেতাদের সমালোচনা করে। সুভাষ-ভয়ে ভীত নেতাদের ধিক্কার জানায়।

জনমতের চাপে বাধ্য নেহেরু, বংশবদদের দিয়ে দায়সারা তদন্ত করালেন। জানালেন, দেখলে তো, মিছি-মিছি আমাকে দোষারোপ করেছিলে তোমরা, লোকটা মরে ভূত হয়ে গেছে।

সুভাষ চন্দ্র ভাল লোক ছিলেন। একজন মানুষকে স্বীকৃতিদান। অস্বীকার করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর মহান মুক্তি প্রচেষ্টাকে। কারণ কি জার্মানীর সাহায্য গ্রহণ ?

ভিয়েতনাম জুড়ে আজ আমেরিকার বর্বরতা। ফরাসীদের কবল-মুক্ত করার জন্যে আমেরিকার সাহায্য গ্রহণে দ্বিধা করেননি সেখানকার মুক্তিযোদ্ধারা। আমেরিকার কাছে দাসখত লিখে দেয়নি তো ভিয়েৎনাম। অন্যায়কারীদের আঘাত হানতে আজ তাঁরা এতটুকু দ্বিধাগ্রস্থ নন। সুভাষের সাহায্য গ্রহণ কি দাসত্বের অঙ্গীকারে ? তাঁর ব্যক্তিত্বে কি কালিমা লেপন নয় ?

সুভাষ চন্দ্র মৃত।

তাহলে আজ আবার কেন তদন্ত কমিশন বসেছে ? কেন কমিশন ছুটে যাচ্ছে জাপানে ?

মিথ্যাবাদী শাহ নওয়াজ খান ? ভ্রষ্ট চরিত্র পণ্ডিত নেহেরু ? মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে পূর্বের তদন্ত ? জীবিত মৃতের প্রশ্ন নয়, তদন্তকারীর দল আপন স্বার্থে সত্যের অপলাপ করেছেন ? তাঁরা নৈতিক দায়িত্ব পালন করেন নি ? অথবা তাঁদের তা না করার

নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কি ? সত্য কোনটা ? কোন্ স্বার্থ লুকিয়েছিল নেতাজী তদন্তের অন্তরালে ?

রবীন্দ্র সরোবরের তদন্ত শেষে বিচারপতি শম্ভু ঘোষ রায় দিয়েছিলেন, ব্যাপক নারী নির্যাতনের কোন ঘটনার প্রমাণ তিনি পাননি।

বিচারপতি নারী নির্যাতনের প্রমাণ পাননি। কিন্তু বিনোদের মনে হয়েছে, নারী নির্যাতনের ঘটনা একেবারে যে ঘটেনি তা নয়। সমাজ বিরোধীদের সুযোগ সন্ধান ব্যর্থ হয়নি। সুযোগ সন্ধান চলছে তো আজ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে। শুধুমাত্র সমাজ বিরোধী নয়, প্রভাবশালী ব্যক্তির দলও পশুর ক্ষুধা নিয়ে ওৎ পেতে আছে। ওৎ পেতে আছে ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের দলও। ক্ষমতা যাঁর করায়ত্ব, নারীর যৌবন তাঁর হাতের মুঠোয়। তোমার চাকরী আমার হাতে—তোমার পেটের ভাত বন্ধ করে দিতে পারি আমি,—অসৎ ওপরওয়ালাদের চাহিদা মেটাতে বাধ্য আজ অনেকেই। তা কি নারী নির্যাতন নয় ? কোথায় তার প্রতিকার ? অনেক দেশসেবক সুরায় নারীতে, দেশসেবার ব্রত উদ্‌যাপন করছেন, কালোবাজারী চালাচ্ছেন, আত্মজনের মাধ্যমে ব্যবসার বোল বোলাও বাড়াচ্ছেন—ধরা পড়লে সাতখুন মাপ, আইন কেশাগ্র স্পর্শ করতে সাহসী হয় না, প্রতিবাদ জানালে হতে হয় সমাজ বিরোধী। দেশের মানুষ, অন্ধত্ব বরণ করো তোমরা, আমাদের রাজ্যপাট, তোমরা আমাদের অধীনস্ত দাস।

শাসকশ্রেণী গণতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকারী। শাসনক্ষমতা হস্তচ্যুত হলেই গণতন্ত্রের করায়ত্ব লাভ ঘটে। গণহত্যা চলে গণতন্ত্র রক্ষা করার নামে।

১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের প্রতিরোধে গণহত্যা করেনি কংগ্রেস ?

সংখ্যালঘু পি, ডি, এফ সরকারের গান্ধীবাদী নেতা প্রফুল্ল ঘোষ

গণহত্যা করান নি? নারীর ইজ্জৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন নি? উত্তরপাড়া কলেজে সি, আর, পি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পেটান নি? ছাদ থেকে নীচে নিক্ষেপ করান নি বেয়ারাকে?

না, স্বাধীন ভারতবর্ষে শান্তি রক্ষকের দল যতই অশান্তি ঘটাক না কেন, কোন দোষ হয়না তাদের। শান্তিরক্ষা করা তাদের কর্তব্য। তারা অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে শান্তিরক্ষা করে। দোষী নির্দোষীর বিচার করে না। অস্ত্রের ব্যবহারই তাদের কাছে যথেষ্ট।

হায় রে গণতন্ত্র, তন্ত্রের ধারক বাহক তুমি। গণহত্যাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বাংলাদেশে গঠিত হয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকার। হয়েছে জনগণের রায়ে। শোষণ শাসনের অবসান কল্পে বাংলার মানুষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। কিন্তু কাদের পাঠিয়েছে শাসন পরিষদে?

একবার বসেছে কেনা-বেচার হাট। বাজারের পণ্য হয়ে, 'কে নিবি নে' বলে, আপন স্বার্থসিদ্ধি করেছে বিশ্বাসঘাতকের দল। দ্বিতীয়বার বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে মানুষ। চেয়েছে শান্তি-স্বস্তি। চেয়েছে শোষণের অবসান। মিথ্যার বেসাতি হটিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে সত্যকে।

সত্য আবার মিথ্যার রূপ নিয়েছে। মানুষের প্রত্যাশা অপূর্ণই থেকেছে। সেই খেলা—ক্ষুদ্র স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, কালোবাজারীর দলের অবাধ লুণ্ঠন—কেন্দ্রের 'গেল গেল' রব, সেই গেল একদিন।

কিন্তু কেন গেল? কিসের জন্যে গেল? কাদের জন্যে গেল?

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কথা চিন্তা করে দলীয় কোন্দল কি বন্ধ করা যেত না?

সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে জঘন্য চক্রান্ত সুরু হয়েছিল রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, তার প্রতিকারে কি করেছে যুক্তফ্রন্ট সরকার? কিছু কি করার ছিল না?

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে মানুষের সমান অধিকার। সেই অধিকার হরণের চেষ্টা, একটা জাতির নামে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টাকে রোধ করার দায়িত্ব সেদিন গ্রহণ করেন নি যুক্তফ্রন্ট সরকার।

সাম্প্রদায়িকতা, ভেদনীতি, প্রাদেশিকতা মহাপাপ। আজ যদি বাঙ্গালী বলে, বাংলা বাঙ্গালীর—তাহলে অন্যায় করবে বাঙ্গালী। বাঙ্গালী তার আপন দেশে অধিকার হারা। বাঙ্গালীর নিরাপত্তা নেই, বাঁচার অধিকার নেই। বাঙ্গালী ভারতীয়।

বাঙ্গালী চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা, বাঙালীকে অধিকার হারা করে রাখার ষড়যন্ত্র আজ মিথ্যা নয়। ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে আজ কম-বেশি বাঙ্গালী বিদ্বেষ নেই? আর সে বিদ্বেষ প্রচারে অংশ গ্রহণ করে থাকেন রাজনৈতিক নেতারা।

১৯৬৯ সালে বাঙ্গালী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা কম হয়নি। সেই প্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন পার্লামেন্টের দুজন সদস্য—ইলা পাল চৌধুরী এবং সোস্যালিষ্ট রাজনারায়ণ। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার ফৌজদারী আদালতে এঁদের সোপর্দ্দ করেনি। আত্মকলহে মত্ত সদস্যরা সে কথা চিন্তা করেননি সেদিন। মেনে নিয়েছিলেন বাঙ্গালীর অধঃপতনের অভিযোগ।

অভিযোগ?

চমকে উঠলো বিনোদ। সেকি অভিযোগ জানাচ্ছে? বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে?

না, অভিযোগ নয়—আবেদন। বাঙ্গালী বাঁচতে চায়। বাঙ্গালী সুস্থ জীবন কামনা করে। দল নয়, মানুষ—মানুষের বলিষ্ট নীতিই বাঁচাতে পারে বাংলাকে—বাঙ্গালীকে, ভারতবর্ষের নিপীড়িত,

নির্যাতীত মানুষকে। আমরা সবাই সমান। আমরা মানুষ চাই মানুষের অধিকারে বাঁচতে।

আমরা বাঁচতে চাই।

ভাতরবর্ষের মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছিল। বাঁচার অধিকার। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরমুহূর্তে আর্তনাদ হাহাকারে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল ভারতের আকাশ বাতাস। রক্তের বন্যা বহে গিয়েছিল। মিথ্যা প্রমাণীত হয়েছিল গান্ধীজীর রয়টারের সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদ। আমরা ভাইয়ে-ভাইয়ে আলাদা হইনি। ব্রিটিশ চক্রান্তে আমরা পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়েছি। দুর্বল-স্বার্থপর নেতার দল আমাদের অমানুষ করে তুলেছিল। ইংরেজের মহত্বের দ্বারে মাথাকুটে বলেছিল, আমরা অক্ষম –প্রভু রক্ষা কর আমাদের। আমরা অক্ষম পঙ্গু, নেতৃত্বের গর্ব অহঙ্কার আমাদের ধুলায় লুটোতে বসেছে। তুমি আমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তোমার ইংরেজ চরিত্রের উদারতার পরিচয় দাও। আমাদের সাবালকত্ব প্রাপ্তির সুযোগ দাও।

বরাভয় দান করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। গ্রহণ করেছিলেন দায়িত্বভার। মাত্র দু তিন ঘণ্টার মধ্যে সঙ্কটের স্বরূপটা বুঝে নিলেন। প্রস্তাব দিলেন জরুরী কামিটি-গঠনের। সঙ্গে সঙ্গে নেহেরু, প্যাটেল সম্মত হয়ে গেলেন। আহা, প্রভুর কি মহিমা, সঙ্কটের স্বরূপ বুঝতে দু তিন ঘণ্টার বেশি লাগলো না। আমরা কি গাধা, দেশ-ভাগের জন্যে কামড়া-কামড়ি করলাম, শিখ আর মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখলাম দিনের পর দিন, তবু দেশ ভাগ হওয়ার পর কি হতে পারে সেটুকু একবারও বুঝতে পারলাম না। আমাদের

কুকীর্তিতে হাজার-হাজার মানুষের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে সেটুকু চিন্তা করা, ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় একবারও ভাবলাম না। বলিহারি আমাদের অযোগ্যতা। যে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার ভিত্তিতে লীগের জন্ম, যারা ঘোষণা করেছে, তারা আগে মুসলমান তারপর ভারতীয়, তাদের চরিত্র যে কি হতে পারে, তারা হিন্দু নিধনের জন্যে কি করতে পারে, আমরা একবারও চিন্তা করলাম না। অথচ প্রভু আমাদের ঠিক বুঝতে পারলেন। নিশ্চই তিনি আগে থেকেই চিন্তা করেছিলেন। আমরা ছেলেমানুষ, ভয় পাব, তাই বলেন নি। প্রভুহে, তুমি সত্য—তুমি মহৎ, তোমার তুলনা মেলা ভার।

প্রভুর মহিমায় বিগলিত পণ্ডিত নেহেরু ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালের অপরাহ্ণে গভর্ণমেণ্ট হাউসের কাউন্সিল চেম্বারে জরুরী-কমিটির বৈঠকে কর্ম পদ্ধতি সম্বর্কে আলোচনার উদ্বোধন করতে গিয়ে মাউন্টব্যাটেকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনার উপদেশ গ্রহণ করব, কিন্তু একটি সর্তে। সর্ত হলো, আপনাকে এই কমিটির সভাপতি হতে হবে।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন,—আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হলাম, কিন্তু একটি সর্তে। সর্ত হলো, এ সংবাদ কখনই বাইরে প্রকাশ করা হবে না যে, আমি কমিটির সভাপতি হয়েছি।

অহো! জীবন সার্থক। ধন্য-ধন্য প্রভু, ধন্য ভক্ত। দোঁহা দোঁহে না ছাড়িতে চায়। গঠিত হল কমিটি। একজন ইংরেজের ওপর ভার দেওয়া হল কমিটি আর পাক-গভর্ণমেণ্টের মধ্যে সংযোগ রক্ষার। দিল্লীকে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে কমিটিতে সঙ্কল্পের দীক্ষা গ্রহণ করা হল।

চলল শান্তি স্থাপনের কাজ। চলল পাঞ্জাবে হানাহানী। দিল্লীতে গুপ্ত হত্যার মহড়া। কলকাতাকে তাঁর অলৌকিক প্রভাবে শান্ত করে দিল্লী ফিরে গেলেন গান্ধীজী। পাঞ্জাবে তারা সিং চালাতে লাগলেন জোর প্রচার। যুদ্ধ চলছে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে।

নতুন সরকার এই অপপ্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সে সাধ্য নেই। নেহেরু দিয়ে চলেছেন তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ। বিদেশীদের করছেন নিঃশঙ্ক। দিল্লীর মুসলমানদের অস্ত্রশস্ত্র বার করে নেবার প্রস্তাব প্যাটেলের, মাউন্টব্যাটেনের বাধাদান। ছিঃ, ওসব করেনা। অবশ্য শিখদের কৃপাণ কাড়ার ব্যাপারে ধর্মের দোহাই পেড়েছিলেন প্যাটেল।

জিন্নার সাফ কথা, এখন তিনি ক্রমেই বুঝতে পারছেন যে, ভাল করে লড়ে এ ব্যাপার (দাঙ্গা) শেষ করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কথাটা এসে জানিয়ে ছিলেন ইস্‌মে, সংযোগ রক্ষক। করাচীতে তিনি মোট আটচল্লিশ ঘণ্টা ছিলেন (১৪ই সেপ্টেম্বর, ৪৭)। জিন্নার সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করতে সময় গেছে তাঁর মাত্র এগারো ঘণ্টা। জিন্না তাঁকে ভাল লোক বলে প্রশংসা করেছেন। ইচ্ছে হলেই, দেখা করার আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন।

ভাইয়ে ভাইয়ের বিবাদে, সংবাদের আদান-প্রদানকারী ইস্‌মে। সাগর পারের বেণীয়া ইংরেজ একজন।

যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য ১৫ই আগষ্টের মধ্যে ভারত-ভূক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেনি তার মধ্যে জুনাগড়ের নবাবের পাকিস্থান-ভূক্তির সংবাদ পাওয়া গেল। অথচ ১৫ই আগষ্টের মধ্যে আপন আপন সিদ্ধান্ত ঘোষণার অনুবোধ ছিল মাউন্টব্যাটেনের। তলে তলে ছিল সংকট সৃষ্টির মতলব।

সেই সংকট সৃষ্টি হতে খুব বেশি দেরি হলনা।

১৯৪৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষণদান কালে পণ্ডিত নেহেরু বললেন, ভারতের কোন ব্যাপার, অবস্থা ও ঘটনায় আমি 'সন্তুষ্ট' হতে পারছি না। বস্তুত আমি গত ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনও যথার্থ সন্তুষ্ট হতে পারিনি। অবশ্য বর্তমানের এই অবস্থা ও অবস্থার অবনতি প্রতিরোধ

করবার জন্য আমাদের সবদিক দিয়েই চেষ্টা করতে হবে। এ চেষ্টার কিছুটা হবে লোকের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টায় এবং কিছুটা হবে জোর করায়। আজ চোখের সম্মুখে যে ধরণের ঘটনার আলোড়ন দেখতে পাচ্ছি, সেটা বস্তুত দেশের নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আলোড়ন। সমাজের এই শ্রেণীই হিটলারকে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছিল। সমাজে যখন কোন ঘটনার সংঘাতে প্রচলিত ব্যবস্থায় ওলট-পালট হতে দেখা যায়, তখন সেই পরিবর্তনের আবর্তে নানা অদ্ভুত ধরণের এক একটা শ্রেণীগত স্বার্থবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করে। এই সব স্বার্থবাদী শ্রেণীর প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি হয় সম্পূর্ণ ভাবেই ফ্যাসিস্টপন্থী, নয় ফ্যাসিস্টপন্থার কাছ-ঘেঁসা। এরাই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে।

পণ্ডিত নেহেরুকে সমর্থন জানিয়েছিলেন পাকিস্থানেব প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী। পশ্চিমী চিন্তাধারায় অভিষিক্ত-প্রতিভা দুই প্রধান মন্ত্রী নিম্ন-মধ্য শ্রেণীকে দোষারোপ করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের অপরাধী করেননি। বলেননি, দেশভাগ করে স্বাধীনতা নিয়ে আমরা ভুল করেছি। আমাদের অন্যায়, পাপ, স্বার্থপরতা মানুষকে হানাহানীর মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমরা ভ্রষ্ট চরিত্র, বিশ্বাসঘাতকতা করেছি মানুষের সঙ্গে। ছলনায় ভুলিয়েছি তাদের।

পণ্ডিত নেহেরুকে সেই সম্মেলনে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, বৈদেশিক সাহায্য ভারতে আহ্বান করতে তিনি রাজি আছেন কিনা?

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ের জন্য বিদেশের পুঁজি এবং কারিগরী সাহায্য আমার দেশে খাটতে দিতে অবশ্যই আমি রাজি আছি। কিন্তু বিদেশের কোন কায়েমী স্বার্থ এখানে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দেবনা।

লিয়াকৎ বলেছিলেন, আমারও এই বক্তব্য।

কেনা বেচার হাট বসেছিল রাজা রাজড়াদের সঙ্গে। ইংরেজ

বংশবদের দল তখন স্বার্থ গুছাতে মত্ত। দর চড়িয়ে চলেছে তারা। নাজেহাল হচ্ছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্যাটেল।

পাঞ্জাবের দাঙ্গা ভয়াবহ হয়ে উঠছে ক্রমশ। ভারতীয় বাহিনীর ব্রিটিশ অফিসারের দল কলকাটি নাড়ছে সেখানে। দাঙ্গা থামার পরিবর্তে বাড়ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ হচ্ছে পথের ভিখারী। পাকিস্থান-হিন্দুস্থান দাঙ্গার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করছে। তারই মাঝে ২৬শে সেপ্টেম্বর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী গান্ধীজী বললেন,—পাকিস্থান যদি তাঁদের আচরণের সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ক্রটিগুলিকে সর্বদাই অস্বীকার করতে থাকেন এবং নিজেদের ক্রটিগুলিকে সামান্য ও লঘু বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে থাকেন, তবে ভারত গভর্ণমেণ্টকে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধই করতে হবে।

ওধারে পাকিস্থানের যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টার ক্রটি নেই। জুনাগড় হয়েছে পাশার ছক। উদ্দেশ্য, কাশ্মীরে দাবী প্রতিষ্ঠার দরাদরির সুবিধা। কিন্তু কাশ্মীর অথবা জুনাগড় পাকিস্থানকে দেওয়ার উপায় নেই। কারণ কাশ্মীর যেমন পণ্ডিত নেহেরুর হৃদয়ের ধন, গুজরাটী প্যাটেলের জুনাগড়ও তেমনি।

দূরদর্শী ভারতীয় নেতার দল জানতেন (?) ভারত ভাগ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, বরং নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। ভারতের রাজন্যবর্গের অযথা কালহরণ তাঁদের বহু পূর্বেই সাবধান করে দিয়েছিল। তবু তাঁরা যেন বুঝেও বোঝেননি। 'আমি কি হনুরে' নীতিতে তড়িঘড়ি ক্ষমতা নিয়ে নিলেন: হয়তো বলা যায়, নিতে বাধ্য হলেন। ফলে যুদ্ধ। আক্রান্ত হল কাশ্মীর। স্বার্থপর কাশ্মীরের মহারাজা শেষ মুহূর্তে সাহায্যের আবেদন পাঠালেন ভারতের কাছে। অথচ তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি স্বাধীন থাকেন। ইংরেজের দাস হয়ে রাজ্যপাট ভোগ করেন।

কাশ্মীরে হানাদার পাঠিয়েছে জিন্না। হানাদারীতে অস্থির কাশ্মীরের মহারাজা ভারত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। বেধেছে

কাশ্মীরের সঙ্গে যুদ্ধ। কাশ্মীর-মুক্ত সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে। কেন হয়েছে? কোন্ স্বার্থে হয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষ বহন করছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা পাকিস্থানের দেউলিয়া। মাত্র দু কোটি টাকা তার সম্বল। পঞ্চান্ন কোটি টাকা তার প্রাপ্য ভারতের কাছে। কিন্তু প্যাটেলের কঠোর নির্দেশ, পাকিস্থান যদি কাশ্মীরের হানাদারীতে সাহাষ্যদান করা বন্ধ না করে তাহলে পাকিস্থানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি অর্থ সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও চুক্তি ভারত গভর্ণমেন্ট পালন করবে না। প্যাটেলের যুক্তি—কেন পাকিস্থানকে টাকা দেব, যে টাকা দিয়ে পাকিস্থান অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করবে, আমাদেরই সৈনিকদের মারবার জন্য?

কিন্তু তাকি হয়। হয়না, হতে পারে না। ইংরেজ কোন্ প্রাণে তা সহ্য করবে, সহ্য করবেন মহাত্মা গান্ধী, তাঁর কুলীনভক্ত পণ্ডিত নেহেরু? 'মেরেছো কলসীর কাণা, তা বলে কি প্রেম দেবনা?' প্যাটেলের অজ্ঞাতসারে অনেক কিছুই করা হল। গান্ধী পালন করলেন তাঁর আমরণ অনশন। তিনি বলেছিলেন,—এই অনশন ব্রত আমি তখনই ভঙ্গ করবো যখন দেখব যে, সকল সম্প্রদায়ের মন থেকে বিদ্বেষ দূরীভুত হয়ে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাইরের কোন শাসনের বা ভয়ের চাপে নয়, সকলের মনের ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন এই সৌহার্দের ভাব একটা কর্তব্য বোধের মতো জাগ্রত হয়েছে দেখতে পাব, তখনই আমি সন্তুষ্ট হতে পারব। অন্য কারও পরামর্শে নয়, একমাত্র ঈশ্বরকেই আমার একমাত্র ও পরম উপদেষ্টা বিবেচনা করে আমি এই ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প করেছি।

সে সময় (১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪৮) প্যাটেল অভিযোগ করেছিলেন, এই সময় অনশন করা গান্ধীজীর উচিৎ হয়নি। গান্ধীজী অত্যন্ত শোচনীয় ও ভুল সময়ে অনশন আরম্ভ করেছেন। এই

অনশনের দ্বারা গান্ধীজী যে পরিবর্তন ঘটানো যাবে বলে আশা করছেন, কার্যত ঠিক তার বিপরিত ফল হবে।

খুশি হয়েছিলেন নেহেরু। অবশ্য তাঁর খুশি হওয়ার অন্য কারণও আছে। প্যাটেল-নেহেরু তখন কংগ্রেসের দুই শিবিরে বিভক্ত। নেহেরু-নীতি প্যাটেলের কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়। আবার প্যাটেলের মনোভাবও নেহেরু সমর্থন করতে পারেন না। গান্ধী প্যাটেলও তখন দুই—একে অন্যের পরিপূরক মন।

দিয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্থানের পঞ্চান্ন কোটি টাকা। দিল্লীর মেঘলা আকাশে রোদ উঠতে অনশন ভঙ্গ করেছেন গান্ধীজী। কারণ তাঁর অনশনের জন্যে আকাশে রোদ ওঠেনি। অনশনে যখন দিল্লীর মানুষের হৃদয় পরিবর্তন হল, রোদ উঠলো। অবশ্য কিছু দুষ্ট শিখ কালো পতাকা নিয়ে বিড়লা ভবনের সামনে দিয়ে চিৎকার করতে-করতে গেছে,—'গান্ধীকে মরতে দাও।' তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি গান্ধীজীর। হয়তো দেশভাগের রক্তাক্ত পঙ্কিলতার আবর্তে হৃদয় নামক বস্তুটি মরে গিয়েছিল।

ঘরের ঝগড়া ঘরে মেটেনি। রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারস্থ হয়েছে ভারত। বুদ্ধি ইংরেজের। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের বক্তব্য যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্ব লাভ করেনি। বিশ্বের অভিমত ভারতের অনুকূলে হয়নি। কারণ কথার তুবড়ি ফোটাতে না পারলে সেখানে কিছুই হয়না।

পাকিস্থান হানাদার পাঠিয়েছে কাশ্মীরে, জুনাগড় নিয়ে করেছে শয়তানী, তবু সেই পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ করেছে। কংগ্রেসকে ষড়যন্ত্রকারী বলেছে। ভারতীয় প্রতিনিধি অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করে নি। তিনি, 'দাদাগো ছাদিনতা পেনু, তাই কত বিদেশী মানুষ একসঙ্গে দেখনু' হয়ে বসেছিলেন।

অবশ্য চীনা প্রতিনিধি ডঃ সিয়াং "যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব সম্মত পন্থায়" বিরোধ সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

কিন্তু হয়নি কিছুই। পাকিস্থানের দাবী গণভোট। কাশ্মীরের অধিবাসীরা স্থির করবে তাদের ভাগ্য। থাকবে হানাদার। থাকবে যুদ্ধ বিরতির আগের অবস্থায় পাকিস্থানের ভূখণ্ড অধিকার।

কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি অসম্পূর্ণ। জাল-জাতিয়াতিতে ভরা। জুনাগড়ের পাকিস্থান-ভুক্তি সম্পূর্ণ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে রাজা-রাজড়ার দল কাদের নির্দেশে চাতুরীর খেলায় মেতেছিল?

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়নি। রাষ্ট্রপুঞ্জ মেটায় নি সে ঝগড়া। মেটানো রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজও নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ ঝগড়া জিইয়ে রাখার জন্যেই সৃষ্ট।

কারণ?

কারণ কি একটা। অসংখ্য কারণ। সবচেয়ে বড় কারণ, পশ্চিমের স্বার্থরক্ষা করা।

আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের বড় তরফ আমেরিকা, রাশিয়া। চীনের আজ আর কোন স্থান নেই রাষ্ট্রপুঞ্জে। কারণ, আজ সে আপন শক্তিতে শক্তিশালী।

কাশ্মীর ভারতের অভিশাপ না আশীর্বাদ তার বিচার এখানে নয়। কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে বহু জল ঘোলা হয়েছে। যে শেখ আবদুল্লা ছিলেন ভারতের বন্ধু, আত্মার আত্মীয়, সেই শেখ আবদুল্লাই আজ পরম শত্রু ভারতের। শের-ই-কাশ্মীর যেমন কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি একদিন সমর্থন করেছিলেন, পণ্ডিত নেহেরুর অতি বিশ্বস্ত হয়ে কাজ করেছিলেন, অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে (শ্যামাপ্রসাদ-জননীর সন্দেহ পণ্ডিত নেহেরু সেই মৃত্যু রহস্যের মধ্যে জড়িত ছিলেন), তেমনি পাকিস্থানের স্বার্থে একদিন উল্টো গাইতে সুরু করেছিলেন তিনি। স্থান হয়েছিল কারাগারে।

তোষণনীতিতে কিছু হয়না। নেহেরুর তোষণনীতির ফলে পাকিস্থান, ভারতের আকাশে কালো মেঘ হয়ে জমে উঠেছে দিনের

পর দিন। হানাদার পাঠিয়েছে। ভারত শুধু অভিযোগ করে গেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারে। হানাদারী বন্ধ করতে সাহসী হয়নি।

কেন?

পাকিস্থান আক্রমণ করেছে কাশ্মীর। আমেরিকার প্যাটন ট্র্যাঙ্ক, স্যাবার জেট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারতের ওপর। যদিও ওইসব সাহায্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যেই (বিশেষত চীনকে) পাকিস্থানকে দেওয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে মৃত্যু উৎসবে মেতে উঠেছিল সে।

মার খায়নি ভারত। পাল্টা মার দেওয়া সুরু করেছিল সে। লাহোর প্রায় অধিকৃত। হৈ-হৈ করে উঠেছিল পশ্চিমী গোষ্ঠী। রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনারেল সেক্রেটারী উ থাণ্টের রাতের নিদ্রা ছুটে গিয়েছিল। পশ্চিমী প্রভুদের মান বাঁচাতে গলদঘর্ম হয়েছিলেন তিনি।

যুদ্ধ বন্ধ করেছিল ভারত। ফিরে এসেছিল অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে। হয়েছিল তাসখণ্ড চুক্তি। ভারত ফিরিয়ে দিয়েছিল পাকিস্থানের অধিকৃত সম্পত্তি। কিন্তু পাকিস্থান? তা কি দেয় কেউ? ভারত ভাল ছেলে, তাই দিয়েছে, পাকিস্থান নীলামে চড়িয়েছিল লুঠের মাল।

দাদাঃদিচ্ছেনা। শুধু কান্না অনুযোগ। বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেওয়া।

জনাব ভুট্টো রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিদের কুকুর সম্বোধন করেছিলেন, প্রতিনিধিরা যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন কি? দেননি। দিতে পারেননি। দাদাগো, ভুট্টো ছায়েবের কি বুদ্ধি, কত তাবড়-তাবড় কথা বলে। হাজার বছর যুদ্ধ করবে। শুনলে ভয় করেনা?

রাষ্ট্রপুঞ্জ পদ্মিনী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার আখড়া। বিরোধ মীমাংসা হয়না, বিরোধ বজায় থাকে, অস্ত্র বিক্রির বাজার সৃষ্টির মতলবে।

নয়া উপনিবেশের শক্ত ঘাঁটি। মুখে শান্তির বুলি। শান্তি রক্ষার নামে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে আপন আপন স্বার্থে। এক-চেটিয়া অধিকার রক্ষা করে চলে। স্বাবলম্বী হওয়ার অন্তরায় সৃষ্টি করে গোপন ধমকানিতে। পশ্চিমী শক্তির আজ্ঞাবাহী ভৃত্য উ থাণ্ট।

মিথ্যে কথা?

মিথ্যে কথা। বিশ্বমানবতা রক্ষার দায়িত্বভার রাষ্ট্রপুঞ্জের, পৃথিবীর শান্তি বাণী বহন করছে রাষ্ট্রপুঞ্জ, মিটিয়ে দিচ্ছে বিভেদ-বিরোধ, কিন্তু সত্যই মেটাচ্ছে কি? শান্তিপূজারী, রাষ্ট্রপুঞ্জের সর্ব্বময় কর্তা উ থাণ্টের বলবার সাধ্য আছে, আমেরিকা তুমি ভিয়েৎনামে নর-হত্যা বন্ধ কর? রাশিয়া তোমার চেকশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করা অন্যায় হয়েছে। তোমরা ঘাতক, তোমাদের স্থান নেই রাষ্ট্রপুঞ্জে। তোমাদের সভ্যপদ কেড়ে নেওয়া হল।

পারেন না? সে ক্ষমতা তাঁর নেই?

আছে কার? আজ পৃথিবীর কোন্ শক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে? তেমন ক্ষমতায় আসীন কে আছে রাষ্ট্রপুঞ্জে? কেউ নেই। কেউ নেই আজ পৃথিবীর অন্যায়কারী শক্তি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে, প্রতিবাদ করতে। সব ঠুঁটো জগন্নাথ, ভীরু কাপুরুষের দল। শুধু নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাধায়, অন্যের স্বার্থের বিবাদ বাধাতে বাধ্য করা হয় তাদের।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যেই পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দিয়েছে আমেরিকা, রাশিয়া। এশিয়াতে কম্যুনিজম রোধ করার জন্যই তাদের খয়রাতি। সেই অস্ত্রে ভারতকে গ্রাস করার জন্যে আক্রমণ চালিয়েছে পাকিস্থান। নীরব দর্শক আমেরিকা। শুধু মৃদু অনুযোগ। কেড়ে নেওয়ায় সাধ্য তাদের হয়নি। বরং আরো অস্ত্র বিক্রীর সুযোগ ঘটেছে তাদের, লাভবান হয়েছে তারা।

আর আজ?

পাকিস্থানের জঙ্গী চক্র মনুষ্যত্বহীনতার চরম পরিচয় দিচ্ছে আজ। চীনকে ঠেকাতে আমেরিকা রাশিয়ার আহার নিদ্রা নেই। সেই চীনের সঙ্গে দোস্তি করে অস্ত্র সংগ্রহ করেছে জঙ্গীচক্র। ভারত চীনের শত্রু। বিরোধের মিমাংসা আজও হয়নি; ভারতের শক্ত নীতি (?) শত্রুকে শত্রু করেই রেখেছে। পরস্পরের আলোচনায় শুভ-বুদ্ধির উদয়ে হয়তো বিরোধ মিটলেও মিটতে পারতো। 'হিন্দী চীনী—ভাই-ভাই' আর বোধ হয় সম্ভব নয়?

.পশ্চিম পাকিস্থানের জঙ্গীচক্র আজ পূর্বে মেতেছে গণহত্যার উন্মত্ত তাণ্ডবে। মানুষের বাঁচার অধিকারকে সে আজ অস্ত্রের আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম, সেই ধর্মের মিথ্যা দোহাই সে ভুলে গেছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে যে অস্ত্র, সেই অস্ত্রই সে হানছে দেশের মানুষের বুকে।

আমেরিকা নীরব দর্শক। বিশ্বমানবতা রক্ষার আখড়া রাষ্ট্রপুঞ্জ নীরব। সুযোগ সন্ধানী রাশিয়া ওৎ পেতে আছে।

আর ভারত?

সমবেদনার অন্ত নেই তার। কিন্তু সেও ঠুঁটো জগন্নাথ। ভয়, না দ্বিধা তার মনে?

অন্যায় কার, ইয়াহিয়ার পাঞ্জাবী চক্রের?

মুজিবর রহমানের?

না, বাঙ্গালীর সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে মৃত্যুপণ সংগ্রাম?

"অহিংস রাষ্ট্রেও পুলিশের দরকার হতে পারে। এটা যে আমার অহিংসার অপূর্ণতার লক্ষণ তা স্বীকার করি। সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে আমার যে সৎসাহস আছে, পুলিশবাহিনী বিনাই আমরা কাজ চালাতে পারব, একথা বলবার সৎসাহস ততটা নেই। অবশ্য আমি এমন রাষ্ট্রের কল্পনা করতে পারি এবং করিও, যেখানে পুলিশের দরকার হবেনা। কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত করতে পারা যাবে কিনা তা ভবিষ্যতেই দেখা যাবে।

পুলিসের যে ধারণা আমার মনে রয়েছে, বর্তমানের পুলিসবাহিনী থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এর বিভিন্ন স্তর অহিংসায় বিশ্বাসীদের দ্বারা গঠিত হবে। তারা জনগণের সেবক হবে, প্রভু নয়। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশৃঙ্খলা সহজেই দমন করবে। বিশৃঙ্খলার পরিমাণ এমনিতেও তখন কমে আসবে। পুলিসবাহিনীর কাছে কোন-না-কোন ধরণের অস্ত্র থাকবে এবং নিতান্তই যদি দরকার হয় তবেই কেবল তা ব্যবহার করবে। কার্যতঃ পুলিস হবে সংস্কারক। তাদের কাজ, ডাকাত ও দস্যুদের ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকবে। অহিংস রাষ্ট্রে শ্রমিক ও মালিকের বিবাদ ও ধর্মঘট কালেভদ্রে হবে। কারণ, অহিংস সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভাব এত বেশি থাকবে যে তাতে সমাজের প্রধান প্রধান স্তরের লোকেদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। তেমনি সেখানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগেরও কোন অবকাশ থাকবেনা।"
—মাহাত্মা গান্ধী।

—দেখুন বিনোদবাবু, আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে এই মুহূর্তেই আপনাকে অ্যারেষ্ট করতে পারি।

দারোগা সাহেবের কথাটা শুনে এতটুকু চমকাল না বিনোদ। শুধু কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

ভদ্রলোক একটু নড়েচড়ে বসলেন টুলটায়। জিজ্ঞাসা করলেন, কি, কথাটা বিশ্বাস হলনা আপনার ?

—না, তা নয়। রহস্য করার ইচ্ছা জাগলো তার মনে। বলল, অবিশ্বাস এতটুকু নেই। তবে হঠাৎ এতদিন পরে এ কথাটা বলার কারণ ?

—কারণ ? একটু চিন্তা করলেন যেন তিনি। বললেন, আপনার খুনোখুনীর ব্যাপারটায় তদন্ত করতে গিয়ে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার মত অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়েছে। আপনি একজন সমাজ বিরোধী। আপনার ঘর তল্লাসী করে অনেক কিছু প্রমাণ আমার হাতে এসেছে। আপনার ঘরে সংগ্রহ করা বইগুলোর মধ্যে অনেক আপত্তিকর বই আমরা পেয়েছি। পেয়েছি আপনার ডাইরী। সেই ডাইরীতে আপনি সরকারের বিরুদ্ধে, আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই লিখেছেন। লিখেছেন, ভারতবর্ষের কংগ্রেস শাসন ব্যবস্থা আজ বিদেশী রাষ্ট্রের তাঁবেদারী করছে, ভারতের নীতি আজ দ্বিধাগ্রস্থ, ধনীদের অনুকূলে তার পক্ষপাতিত্ব, বিদেশী রাষ্ট্রের বিনা অনুমতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার নেই। লিখেছেন, এই কি সেই ভারত, যে ভারত একদিন সুভাষের বলিষ্ট ব্যক্তিত্ব-নীতির সুষ্ঠ রূপায়ণে আপোষহীন সংগ্রামের পথে মুক্তি চেয়েছিল ? লিখেছেন, এই কি সেই ভারত, যে ভারত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল ?

বিনোদ শুনছে। দারোগা ভদ্রলোকের তার ডাইরীর পাতা মুখস্ত রাখার আশ্চর্য স্মরণ শক্তি দেখে বিস্মিত হচ্ছে। সে সমাজ বিরোধী। তার ঘরে আপত্তিকর বই পাওয়া গেছে। আপত্তিকর বই বলতে রাজনৈতিক গ্রন্থ। দেশ বিদেশের অনেক রাজনৈতিক গ্রন্থ সে সংগ্রহ করেছে। পড়েছে। বিভিন্ন মত এবং পথের নির্দেশ আছে সে সমস্ত গ্রন্থে। আছে সমাজ গঠন, রাষ্ট্র গঠনের সুস্থ-সুষ্ঠ চিন্তাধারার প্রকাশ। তেমনি আছে বঙ্কিম রবীন্দ্র, মাইকেল,

শরৎচন্দ্র, মানিক আর গিরীশ রচনাবলী। আছে গান্ধীর রচনাবলী। আছে আধুনিক লেখকদের বই। সাধ্যমত সংগ্রহ করেছে সে। সাহিত্য তো সমাজের দর্পণ-ইতিহাস। মুঘল যুগে ইতিহাস লেখা হয়েছে, লেখা হয়েছে ইংরেজ আমলে, স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসও লেখা হয়েছে—লেখা হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস সত্য হলেও—সরকারী আনুকূল্যে যা লেখা হয় তাতো শুধুমাত্র শাসন ব্যবস্থার গুণগান। লেখকের স্বাধীনতা সেখানে সীমাবদ্ধ। গণ্ডি ছাড়াবার উপায় সেখানে নেই। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, বঙ্কিমের রচনাবলী, রবীন্দ্র লেখনী, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী কি ইতিহাস নয়? ইতিহাস নয় অতীত বর্তমানের বহু লেখকের রচনা?

মন্দ দেখবো না, শুনবো না, চিন্তা করবো না। জীবনের শপথ। মানুষ তো সুষ্ঠ জীবন কামনা করে, সুন্দরের পূজারী মানবাত্মা। কিন্তু অসুন্দরের কালো ছায়া, ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠিস্বার্থে সমাজ এবং মানুষ যখন দুর্দশার চরম সীমায় নেমে আসতে বাধ্য হয়, যখন মানুষের সঙ্গে পদে পদে বেইমানী করে রাষ্ট্র-যন্ত্রের চালকরা, অত্যাচার অবিচার অনাচারে পূর্ণ করে তুলতে দ্বিধা করে না তাদের ওপর নির্ভরশীল শত সহস্র লক্ষ কোটি মানুষের জীবন—বিদেশী দস্যু মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ যখন বাঁচার অধিকার পায় না, একমুঠো অন্নের প্রত্যাশায় নারী যখন তার নারীত্ব বিলিয়ে দিতে বাধ্য, তখন কি মনে হয় আমরা স্বাধীন—মুক্ত, বাঁচার অধিকার আমরা ফিরে পেয়েছি?

জীবনের কাব্য শুধু ক্ষুধার কাব্য নয়, সৃষ্টি মানুষের ধর্ম—সে ধর্ম পালন করে মানুষ। লেখা হয় অত্যাচার অবিচারের মর্মান্তিক কাহিনী। বিদ্রোহ আর বিপ্লবের কথা বাঁচার পথ সন্ধানে। এগিয়ে যেতে হবে। ফিরে যাওয়ার উপায় নেই তার। মহাভারতের যুগ সৃষ্টি আর কি সম্ভব? সে যুগের কুরুক্ষেত্রের শ্মশানভূমি কি শুধুমাত্র ধর্মের জন্য? কেন তাহলে ধর্মরক্ষার পর হাহাকার

আর্তনাদ স্বজন বিয়োগের মর্মজ্বালা। কেন শান্তি প্রয়াসে মহাপ্রস্থান যাত্রা? কোন্ অর্থে মহাপ্রস্থান? কেন সমাজ সংসার ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি?

বিনোদের মনের অস্থির চিন্তা স্থায়ীত্ব লাভ করেছে দিন লিপির পাতায়। পথ সন্ধান করেছে সে। একান্ত নিজের চিন্তাধারাকে সে হারিয়ে যেতে দেয়নি। পালিয়ে গেলে চলবে না। দাঁড়াতে হবে। লড়াই করতে হবে। বাঁচতে হলে, বাঁচার মত বাঁচতে হবে। শ্রেণীহীন সমাজ আদিম যুগের সাক্ষ্য। আধুনিকতা মহাপাপ। অগ্রগতিকে রুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এগিয়ে যেতে হবে, ভুলতে হবে বিভেদ, ভালবাসতে হবে—শ্রদ্ধা করতে হবে পরস্পরকে। ভালবাসার কাঙাল-মন মানুষ ভুলে যাচ্ছে জীবন ধর্ম।

কিন্তু কেন ভুলে যাচ্ছে মানুষ? কেন ভুলতে বাধ্য হচ্ছে?

সে যা ভেবেছে তা সত্যি নয়? চিন্তাধারা মিথ্যা? অযথা দোষারোপ করছে মানুষকে? সেই মানুষের দলে সে নিজেও একজন। একজন শিল্পপতি, একজন মজুর অথবা একজন অতি তুচ্ছ লোক।

সমকালীন রাষ্ট্র দর্শনে বিভিন্ন ধারায় দেখেছে, আদিম যুগে মানুষের মধ্যে ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধ তখনও মানুষের মধ্যে জাগেনি। পরস্পরের সহযোগিতা, নির্ভরশীলতাই ছিল জীবনের ভিত্তি। ছিল সমবায় ভিত্তিক গোষ্ঠী জীবন। এই যুগকে অনেকে Primative Communistic age বলে থাকেন।

তারপরের যুগ ভূমি-দাস যুগ। এই যুগেই আত্মস্বাতন্ত্র্য বোধ, স্বার্থপরতা ও নিজের জন্যে পৃথক ব্যবস্থার প্রবৃত্তি। প্রকৃতির সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল। সুরু হল মানুষে-মানুষে বিভেদ, জন্ম হল শোষক এবং শোষিত শ্রেণীর। শোষক ভূ-স্বামী, শোষিত

কৃতদাস। শোষিত মানুষের জীবনের কোন মূল্য ছিল না। মানুষ ছিল পণ্য সমগ্রী।

বহুদিনের অবিচার অত্যাচারের পরিণতি বিদ্রোহ। লোপ হল ক্রীতদাস প্রথা। পত্তন হল নতুন সমাজ ব্যবস্থার সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্রের যুগে ভূ-স্বামীরা প্রজা এবং কৃষি মজুরদের অবাধ শোষণ করে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মালিক হন। অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক শোষণ মূলক।

বিজ্ঞানের উন্নতি ও শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি হল শিল্প ভিত্তিক। এই সময় শোষক—শোষিত, মালিক—শ্রমিক নামে পরিচিত এবং এই যুগে শ্রমিক শ্রেণী অধিকতর সংগঠিত। মার্কসের মতে এই যুগের নাম ধনতান্ত্রিক যুগ। ধনতন্ত্রের বি:ভদের মধ্যেই, ধ্বংসের বীজ নিহিত। ধনতন্ত্রের মৃতদেহ থেকেই 'সমাজতন্ত্রের' উৎপত্তি।

ব্যক্তিগত মুনাফা ও শোষণ প্রবৃত্তিই ধনতন্ত্রের ভিত্তি। ধনতন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানায় শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা। ধনতন্ত্রে শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর সহাবস্থান সূচীত করে। ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান, উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। ধনতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী। তারা প্রতিযোগীতা মূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তাদের মতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যক্তির বিকাশের অনুকূল ও সমাজের বৈষয়িক উন্নতির বি:শেষ সহায়ক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ফলশ্রুতি বিপরীত। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ মূল্যের সামান্য একটা অংশ শ্রমিক শ্রেণীকে পারিশ্রমিক হিসাবে দিয়ে বাকিটা নিজেরা আত্মসাৎ করে। শুধু তাই নয়, ধনতন্ত্রে মালিকরা অর্থনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রভাবান্বিত করে। ফলে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় ধনিক ও মালিক স্বার্থে। এই ব্যবস্থার ফলে দেশের আইন-কানুন ধনিক স্বার্থে প্রণয়ন

করা হয়—প্রশাসন যন্ত্র তাদেরই স্বার্থে নিয়োজিত হয়। খেটে খাওয়া মানুষ সমাজে শোষিত, অবহেলিত হয়ে সহজ আত্ম বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালী জার্মানীতে ফ্যাসীবাদ নাৎসীবাদের উৎপত্তি। এই মতবাদ দুটি প্রায় সমধর্মী, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে। ব্যক্তিস্বার্থ স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় আদর্শের বিরোধী হলে কঠোর ভাবে খর্ব করতে বদ্ধ পরিকর। তবে এই মতবাদ উৎপাদন ও বিনিময় বিষয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের বিরোধী নয়, শুধু উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোর নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। ব্যক্তি স্বার্থ অপেক্ষা সমাজের স্বার্থ এই ব্যবস্থায় প্রাধান্য লাভ করে। রাষ্ট্রের সর্বপ্রাধান্যই হল ফ্যাসীবাদ নাৎসীবাদের ভিত্তি। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। শাসকের যোগ্যতার ওপরই দেশের সুশাসন ও মঙ্গল নির্ভর করে। সুতরাং এমন লোক সমূহের ওপর শাসন কর্তৃত্ব থাকা দরকার, যারা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও নৈতিক চরিত্রে শ্রেষ্ঠ। যদি সংখ্যা গরিষ্ঠের প্রতিনিধি নাও হয়, ক্ষতি নেই।

অহিংসা ও নৈতিকতার ওপর গান্ধীবাদ প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজীর মতে, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রেণী সংগ্রাম অপ্রয়োজনীয়। ধনিক ও মালিক শ্রেণীকে নৈতিক শিক্ষার প্রভাবে, শোষণে নিস্পৃহ করে ধনসাম্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। গান্ধীজীর মতে, মালিকরা হবেন শ্রমিক শ্রেণীর 'অছি' স্বরূপ। শ্রেণী সংগ্রামে ঘৃণা ও হিংসা বর্তমান। সুতরাং ধনসাম্য ও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় শ্রেণী সংগ্রাম বর্জনীয়। যন্ত্র শিল্পের বিরোধী। এই মতবাদ ক্ষুদ্রশিল্প এবং পাঞ্চায়েতের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। এই ব্যবস্থার নাম সর্বোদয় প্রথা। এরই নাম গান্ধীবাদ।

আর সমাজতন্ত্র?

সমাজতন্ত্র মূলতঃ একটা অর্থনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করবার

গুরুদায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকে বলে 'সমাজতন্ত্র' একটা রাজনৈতিক মতবাদ বলে পরিগণিত।

অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ফলে যে ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয় তারই প্রতিক্রিয়া রূপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব। ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের উদ্দেশে পরিচালিত সম্পদ-উৎপাদন ও বন্টনের যে ব্যবস্থা বর্তমান সমাজে প্রবর্তিত আছে, সমাজতন্ত্রবাদীরা তার পরিবর্তে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব প্রবর্তিত করে ধন বৈষম্য, শোষণ ও ভেদবুদ্ধি দূর করতে প্রয়াস পায়। এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক জীবনে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হবে যার ফলে সমাজের সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্বার্থের বদলে সামাজিক স্বার্থেই নির্দ্ধারিত হবে। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণাধীন একটা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সমিতি সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। ফলে, প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন, মূল্য-হ্রাস-বৃদ্ধি, ব্যবসাচক্র, বেকার সমস্যা, জীবন ধারণের নিম্নমান প্রভৃতি ব্যক্তিগত মালিকানা পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ত্রুটিগুলি দূরীভূত হবে।

সমাজতন্ত্রবাদেরই একটা রূপ মার্কসবাদ। মার্কসবাদ প্রধানতঃ তিনটি সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম, উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্র (Theory of Surplus value); দ্বিতীয়, ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা; তৃতীয়, শ্রেণী সংগ্রামবাদ (Theory of class Struggle)।

মার্কসের মতে, একটি সামগ্রীর (দ্রব্যের) মূল্য নির্ভর করে তার উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করা হয় তার ওপর। কিন্তু শ্রমিকরা যে পরিমাণ মজুরী পায় তা তাদের প্রদত্ত শ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম অর্থাৎ একটি সামগ্রী বাজারে যে মূল্যে বিনিময় হয় তদপেক্ষা শ্রমিকেরা অনেক কম হারে মজুরী পায়। সামগ্রীর বিনিময় মূল্য, যা প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা নির্দ্ধারিত এবং শ্রমিককে প্রদত্ত মজুরীর পরিমাণ—এই উভয়ের পার্থক্যকেই মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্য আখ্যা দিয়েছেন। এই উদ্বৃত্ত মূল্য অর্থাৎ মুনাফা, মালিকগণ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে শ্রমিকগণকে বঞ্চিত করে। এই অন্যায়

মুনাফা লোঠাকে মার্কস মালিকদের আইনসিদ্ধ চৌর্য্যবৃত্তি বলে অবিহিত করেছেন।

এই আইনসিদ্ধ চৌর্য্যবৃত্তিই চলেছে আজ···

কি মশাই, চুপ করে কেন? যেন ধমকে উঠলেন দারোগা সাহেব। বললেন, এখন বলুন আপনাকে অ্যারেষ্ট করা যায় কিনা।

বিনোদ তাঁর মুখের দিকে চাইলো। কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলো। মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইলো, আমার কাছে জানতে চাইছেন?

—নিশ্চই। নড়েচড়ে বসলেন তিনি। বললেন, আপনি আমাকে অযথা হ্যারাস করেছেন। জানতে চেয়েছিলাম সন্দেহ জনকদের নাম,—বলেন নি। বলবেন কি করে, আপনি নিজেই যে একজন অপরাধী।

আর সহ্য হলনা তার। বলল, আপনাদের চোখে?

বিনোদের প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায় একটু থতমত খেলেন ভদ্রলোক। সামলে নিয়ে বললেন, আমরা প্রমাণ পেয়েছি।

—ক'খানা রাজনীতির বই?

—আপনার ডাইরীটাও কাজে লাগবে। তাছাড়া···

বাধা দিল বিনোদ। বলল, বাকিটা সাজিয়ে নেবেন? চমৎকার।

দারোগা সাহেব কথা বললেন না। চোখ বুজলো বিনোদ।

পুলিশের চোখে সে অপরাধী, অর্থাৎ আইনের চোখে। তার অপরাধ, সে গুপ্তহত্যার মাঝে পড়ে আহত হয়েছে। পুলিশের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসেছে। প্রকৃত অপরাধীদের সন্ধান করে খুঁজে বার করার বদলে কৃতিত্ব প্রমাণ করতে তাকে নিয়েই উঠে পড়ে লাগবার চেষ্টা। অদ্ভুত আজকের রক্ষকদের ভূমিকা।

শাসক পাল্টেছে, শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়নি শান্তি রক্ষকদের চরিত্র। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ইংরেজ প্রভুদের মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে অত্যাচারের বন্যা বহিয়েছে। কায়েমী স্বার্থ-শাসনব্যবস্থা অটুট রাখতে এরাই নির্বিচারে হত্যা লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, বলাৎকার—কি করেনি ? পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সমাজের সঙ্গে—দেশের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে। একমাত্র যুক্তি চাকরীর মর্যাদা রক্ষা।

যাঁরা চাকরী বজায় রেখেও স্বাধীনতার আন্দোলনে সাহায্য করেছেন তাঁরা নিশ্চই নীতি-ভ্রষ্ট ? তাঁরা নিশ্চই বেইমানী করেছিলেন ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে ?

নিশ্চই তাই। অন্ততঃ এই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরদের চোখে এদের সংখ্যাই বেশি। স্বাধীন ভারতবর্ষে এদের চরিত্রের পরিবর্তন আজও ঘটেনি। এরা তেমনি অত্যাচারী, আত্মসর্বস্ব, দাম্ভিক, হিংস্র বিচার বুদ্ধি বিবেক রহিত। এরা ক্ষমতামদে মত্ত, স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন। এরা ভাবে, যেহেতু তারা আইন রক্ষক, সেই হেতু সমাজ এবং মানুষের সেবক নয়—প্রভু।

এই প্রভুর দলই বর্তমানের প্রকৃত শাসক। সমাজ বিরোধীর দল এদেরই কৃপায় দিনের পর দিন স্ফিত হচ্ছে। এদের অপকৌশলে কি না হচ্ছে। গুণ্ডা বদমাসের দল খুন জখম করলে, দিব্যি নির্দ্ধিধায় এরা বলে দেয়, এটা রাজনৈতিক হত্যা কাণ্ড। আঘাতের ক্ষত পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি ভঙ্গিতে ঠিক বলে দেয়, এটা কোন্ দলের কাজ। অমুক দলের মারের কায়দা এই, অমুক দলের এই, কিন্তু হত্যাকারী ধরা পড়েনা। অতিবৃদ্ধ একজন মানুষ হত্যাকারীর আঘাতে মারা গেলে দিব্যি বলে দেয়, এটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

আজ পশ্চিমবঙ্গে হত্যাকাণ্ড যেন ছেলেখেলা। জীবন এখানে মূল্যহীন। একটা পশুরও প্রাণের মূল্য আছে—নেই মানুষের। দিনে-রাতে সমানে চলেছে হত্যালীলা। প্রশাসকের দম্ভ অহঙ্কারের

বড়াই। পুলিশ, মিলিটারী, সি-আর-পি বাহিনীর সতর্কতা। তবু হত্যাকাণ্ড ঘটছে। কোন্ অদৃশ্য লোক থেকে যেন হত্যাকরীরা এসে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েই ফিরে যাচ্ছে। সাধ্য হচ্ছে না তাদের টিকি ছোঁয়ার।

কিন্তু সত্যিই কি তাই, না ভেতরে আছে কোন গুপ্ত রহস্য? উৎস সন্ধানে নগ্ন চরিত্র আত্মপ্রকাশ করবে কোন্ কায়েমী স্বার্থের?

এই যে হত্যাকাণ্ড, একি শুধু রাজনৈতিক কারণে? হত্যাই কি রাজনীতির একমাত্র অবলম্বন?

হত্যাকারী কি শুধুমাত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো?

সমাজ-বিরোধী দুর্বৃত্তেরা আজ যেন সব সাধু হয়ে গেছে। সমাজে আজ তারা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুন জখম লুঠ রাহাজানী সব ভুলে গেছে তারা।

যত গণ্ডোগোলের মূলে রাজনৈতিক দলগুলো। ওরাই খুন জখম চালাচ্ছে। সমাজের সাধারণ মানুষকে ওরা পশুর মত খুন করছে।

পাড়ায়-পাড়ায় হানা দিচ্ছে পুলিশ। বাড়ি-বাড়ি তল্লাসী চলছে। সংসারের সব চেয়ে নীরিহ শান্ত ছেলেটা, রাজনীতি করার চেয়ে অন্নচিন্তা অথবা নিজের পড়াশুনা নিয়েই যে থাকে, ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। জেরার পর জেরা। মার ধোর। একটি মাত্র প্রশ্নের সদুত্তর চায়, পাড়ায় যখন বোমা ফাটছে সে তখন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল কেমন করে?

শান্তি ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে অশান্তির আগুন দিনের পর দিন বাড়িয়ে তুলছে পুলিশের অত্যাচার। ভয়, ভয় আর ভয়। গুপ্তঘাতকের ছুরির ভয়। পুলিশের অত্যাচারের ভয়। ভয় সম্মানহানির। ভয় নির্যাতনের।

শুধু ভয়, ভয় আর ভয়।

উঠে দাঁড়ালেন দারোগা সাহেব। বললেন, আপনাকে আমি সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি বিনোদবাবু।

বিনোদ আস্তে বলল, আমি কি কোন অন্যায় করেছি?

—করেন নি?

—আমার তো মনে হয়……

—নিশ্চই করেছেন। যারা আপনাকে অ্যাটাক করেছিল, তাদের চিনতে পারা সত্ত্বেও আপনি তাদের পরিচয় গোপন করতে চেষ্টা করেছেন।

—শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়েই……

বাধা দিলেন তিনি। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, আপনি তাদের সমর্থন করেন?

—নিশ্চই করিনা। অহেতুক হত্যাকাণ্ডকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি।

—তার অর্থ হত্যাকে আপনি সমর্থন করেন?

—না করিনা।

—তাহলে অহেতুক কথাটা ব্যবহাব করছেন কেন?

—আজকের হত্যাকাণ্ডগুলো দেখে তাই মনে হয় আমার।

—কিন্তু যারা হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে, এর পেছনে নিশ্চই কোন না কোন যুক্তি আছে তাদের।

—আপনি বলছেন এ কথা?

—দেখেশুনে তাই তো মনে হচ্ছে।

—তবু আপনারা এসব বন্ধ করতে পারছেন না?

—পারি। যদি সাধারণ মানুষ আমাদের সহযোগিতা করে। কেউই আমাদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসছে না।

—ভয়ে।

—আমরা তো ভয়-মুক্ত করতেই চাই।

—ভয়টা যে আপনাদেরই।

—বিনোদবাবু। যেন ধমকে উঠলেন তিনি।

হাসল বিনোদ। বলল, সত্য কথাটা বললেই কেমন চিৎকার করে ওঠেন, দেখছেন তো?

—জানেন, আপনাকে আমি এই মুহূর্তে অ্যারেষ্ট করতে পারি। রাগে কাঁপছেন তিনি।

—ওই জন্যেই তো কেউ সাহসী হচ্ছে না। বিশ্বাস জিনিসটা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ বিশ্বাস করবে কাকে? কিসের জন্যে বিশ্বাস করবে? কেন অমর্যাদা ঘটছে আজ বিশ্বাসের? কেন আজ এই হানাহানি, অস্থিরতা, মানুষকে মানুষের ঘৃণা-অবজ্ঞা? বলতে পারেন? কেন?

তুমি ভুল করেছো বিনোদ। তুমি……, মাষ্টারমশাই তাঁর কথাটা শেষ করতে পারলেন না। অস্থির পদক্ষেপে তিনি ছোট্ট কেবিনটার মধ্যে ঘোরাফেরা সুরু করলেন।

বিনোদ কিছুক্ষণ তাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখল। দারোগা সাহেব তার ব্যবহারে রেগে গেছেন। হয়তো একটা কিছু করতেন। করেননি, শুধুমাত্র তার জানাশোনা পরিচিত মানুষগুলির জন্যে।

পক্ষকাল গত হয়েছে। অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। হাসপাতাল থেকে চলে যাবার ইচ্ছা ছিল তার, ডাঃ সান্যালকে একটু ধরাধরি করলেই মত দিতেন। বিনোদ তাঁকে বলেও ছিল। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, অসুবিধেটা কি হচ্ছে?

অসুবিধা? না কোন অসুবিধা তার নেই। এতগুলো দিনে কোন মন্দ-ব্যবহার অযত্ন সে লাভ করেনি। কোন দুঃখজনক ঘটনা ঘটেনি তার সামনে। যদিও অমূল্যবাবুর অভিযোগের অন্ত

ছিলনা। তিনি তো একদিন স্পষ্টই মুখের ওপর বলেছিলেন, আপনার আর কি মশাই, ভেতরে লোক আছে, দেদার টাকা খরচ করছেন, সত্যকারের দুঃখটা আপনি জানতে পারবেন কি করে? যদি কেউ না থাকতো, তাহলে হয়তো অপারেশনের সময় ডাক্তাররা ভুল করে পেটের মধ্যে তোয়ালে রেখে দিতেন।

বিনোদকে চুপ করে থাকতে দেখে মুচকি হেসে বলেছিলেন, চাই কি ছুরি কাঁচিও থাকা অসম্ভব ছিল না।

চতুর্দিকেই অভিযোগ। অভিযোগের অন্ত নেই আজ। মালিক শ্রমিকদের সম্পর্কে অভিযোগ করছে। শ্রমিকরা অভিযোগ জানাচ্ছে মালিকের শোষণ-নীতির বিরুদ্ধে। মালিক তাদের খাটিয়ে নিচ্ছে—শোষণ করছে। মালিক বলছে, শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য শ্রম ফাঁকি দিচ্ছে। শুধুমাত্র তাদের চাহিদা পূরণ করো, তারা কাজ করুক অথবা না করুক। মালিককে জব্দ করার জন্যে কাজে তাদের অবহেলা। দলে থাকা, দল-ছাড়া একদল শ্রমিক বলছে, দাদারা তাদের দলের শক্তি জাহির করার জন্যে কথায় কথায় ধর্মঘট ডাকছে। বলছে, তোমরা তোমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মালিককে বুঝিয়ে দাও তোমরা না হলে মালিকের মুনাফা লোঠা যায়না। আমাদের চোদ্দ দফা দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালাবো। এ আমাদের বাঁচার লড়াই। এ লড়াইয়ে জিৎতে হবে। জিৎ শ্রমিকদের হয়। ঘনঘন বৈঠক, শেষে মালিক শ্রমিকদের বারো দফা দাবী মেনে নেয়। লিডাররা বলে, আমরা জিতেছি, আমাদের জয় হয়েছে। দলে থাকা শেয়ানা শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, আসল দাবীতো আমাদের দুটোই ছিল। চোদ্দর ধাঁধাঁয় সেই দুটোই মিটলো না। কেন?

শ্রমিকের অভিযোগ। কাপড় মিলে ধর্মঘট হবে পুজোর আগে। মালিক গোডাউন ক্লিয়ার করে নিয়ে মিল খুলবে। অভিযোগ, ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়ার পর মালিককে সব দিক দিয়ে গুছিয়ে

নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। অভিযোগ, সরকার মালিক পক্ষকে সাহায্য করে। শ্রমিকের স্বার্থে নয়, মালিকের স্বার্থে যখন-তখন পুলিশ পাঠায়। বে আইনী লক্‌-আউট, ক্লোজারের কোন জবাব-দিহির বালাই নেই। একটা রাজ্যে মালিকের অন্যায়কে সমর্থন করতে অন্য রাজ্য শিল্প স্থাপনের আহ্বান জানায় নির্লজ্জ ভাবে।

অভিযোগ, সরকারের সমাজতন্ত্র নীতির মাধ্যমে ধনতন্ত্রের কায়েমী ব্যবস্থাকে পাকা করা। গণতন্ত্র যে কত মিথ্যা তাতো আজ প্রতি পদক্ষেপে প্রমাণীত।

অভিযোগ আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে। অভিযোগ সাধারণ মানুষের। প্রতিকার কি নেই ?

প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিক বৈষম্যের বড় সমর্থক কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে সমান ভাবে শিল্প সমৃদ্ধ করার দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন না। যদিও শিল্পনীতি প্রস্তাবে সেরকম নীতিগত উদ্দেশ্যের কথা বলা আছে, কিন্তু ভারত সরকার সে প্রস্তাব কার্যকর করার চেষ্টা করেন নি। লাইসেন্স কমিটির সামনেও কোন স্পষ্ট নির্দেশ রাখা হয়নি। রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ রাজ্যে মূলধন আকৃষ্ট করার প্রয়াসী হন, কিন্তু কেন্দ্রীয় ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলি অনুন্নত রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্যে বিশেষ সুবিধাজনক সর্তে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেননি।

১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে যত শিল্প লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে তার শতকরা ষাট ভাগ মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু আর পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়েছে। অন্ধ্র, বিহার, কেরল, মহীশূর, পাঞ্জাব আর উত্তরপ্রদেশ পেয়েছে উনত্রিশ ভাগ। বাকি এগারো ভাগ পেয়েছে অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি। লাইসেন্স কমিটির এমন ক্ষমতা নেই যে শিল্পপতিদের অনুন্নত রাজ্যে শিল্পস্থাপনে বাধ্য করে। তাছাড়া অনুন্নত রাজ্যগুলিতে শিল্প স্থাপনের দরখাস্ত আসে খুব কম। উপরোক্ত দশ বছরে আসামে এরকম দরখাস্ত

এসেছে মাত্র ১২৫ খানি, অথচ মহারাষ্ট্রে এসেছে ৩৬৪৫ খানি। এতেও কেন্দ্রীয় সরকার পক্ষপাতিত্ব করেছেন। আসামের দরখাস্তের মাত্র ৬০ ভাগ অর্থাৎ ৯০টি দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন (বছরে গড়ে নয়টি) আর মহারাষ্ট্রে শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থাৎ ২৭৩৬টি (বছরে গড়ে ২৭১টি)। এই নীতির ফলে আজ মহারাষ্ট্রে ঘটেছে অতি-শিল্পায়ন, গুজরাট, মহীশূর আর তামিলনাড়ুও হয়েছে সমৃদ্ধ। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, কাশ্মীর, কেরল শিল্পহীন। আর পশ্চিমবঙ্গ? পশ্চিমবঙ্গ বেকারের দলে ভরা।

আবার আসাম, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গে যে কটা লাইসেন্স দেওয়া হয়, সেকটা যে শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় তাও নয়। মূলধন বিনিয়োগ-কারীরা ভেবে চিন্তে পিছিয়ে যায় অনেক সময়।

লাইসেন্স দেবার ক্ষেত্রে ভারতে অঞ্চলগত বৈষম্য দূরীকরণের কথা বিবেচিত হয়নি, তেমনি ঋণ দেবার বেলায়ও। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (I. D. B. I), ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন (I. F. C), ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট ও ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া (I. C. I. C. I)—এই তিনটি কেন্দ্রীয় ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণদানের ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করেছে। এবং ঋণদানও ঘটেছে…

ভারতে যত শিল্প লাইসেন্স দেওয়া হয় তার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ পায় মহারাষ্ট্র, ঋণ—এক-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের বড় এবং ভারী শিল্পের সংখ্যা বেশি। মহারাষ্ট্র একা যত ঋণ পেয়েছে, তামিলনাড়ু, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ একত্রে তাই পেয়েছে। এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। পেয়েছেন কোন্ সব শিল্পপতিরা, সে আলোচনা এখানে নিরর্থক।

গুজরাট, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, বিহার, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সবাই ঋণ পেয়েছে। পায়নি আসাম এবং উড়িষ্যা। আবার কবছর

পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে চলেছে গভীর ষড়যন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মূলধন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মহীশূর, মহারাষ্ট্র, দিল্লী আর উত্তর প্রদেশে।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হেড কোয়ার্টার্স ছিল কলকাতায়। একদিন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মহারাষ্ট্রে। ফলে সব চেয়ে বেশি সুফল লাভ করেছে মহারাষ্ট্র। ভারতীয় সমাজতন্ত্রের সার্থক রূপায়নের পর মাথা তুলেছে উগ্র প্রাদেশিকতা বোধ। 'মহারাষ্ট্র বাঁচাও' সঙ্কল্প নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছে শিবসেনার দল। হত্যা-লুণ্ঠন গৃহ-দাহ। গণতন্ত্রের সুযোগ্য পূজারীর দল জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে বাহুবলে।

মহারাষ্ট্র দিন দিন শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে—ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারত সরকার অবহেলা করেছে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, কেরল, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কাশ্মীরকে। সারা ভারতের টাকা নিয়োগ করা হয়েছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ুতে!

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছিল স্বাধীনতা লাভের আগে, কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে নয়, ভৌগলিক কারণে বাঙ্গালীদের নিজস্ব উদ্যোগের ফলে। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি হয়নি, পশ্চাদপসরণ ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গ আজ নানান সমস্যায় জর্জরিত। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' নীতি এখনও পশ্চিমবঙ্গের। এখানে ভারতের প্রতিটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। প্রাদেশিকতাবাদ এখনও মাথা চাড়া দেয়নি। কিন্তু দিনের পর দিন যদি বঞ্চিত, জর্জরিত হয়,—তখন? যদি প্রাদেশিকতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার জন্যে দায়ী হবে কে? পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সংকীর্ণতা, আত্মস্বাতন্ত্র বোধ, না সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্রবাদের ফুলঝুরি?

শুধু কি পশ্চিমবঙ্গ? প্রাদেশিকতাবাদ কি ধীরে ধীরে মাথা

বলি, বোঝেনা বলে কি চলবে না? চলবে বৈকি। যারা চালায় তারাই চালাবে। ব্যবসায় মালিক কিছু না বুঝলেও লাভ লোকসানটা বোঝে। লাভ হলে আরো লাভ চায়। তখন তার মাথা দিব্যি খুলে যায়। তোর মন্ত্রীরা হল চেয়ারের শোভা, লাভ লোকসানে কি এসে যায়? চাকরীটাতো পাঁচ বছরের।

কলকাতায় বড় বাজারে রিক্সা-ঠেলা। পথের দুপাশে সার সার মোটর। ফুটপাতে হকারের বেচা কেনা। ট্রাম বাস ট্যাক্সিতে জ্যাম। বাসে তিন ঘণ্টায় হাওড়া থেকে শিয়ালদহ। ব্যবসার জায়গা। মোটরে ড্রাইভার ঘুমাচ্ছে। আশপাশের কোন-না-কোন বাড়ি থেকে মা জননীরা সেজেগুজে নেমে এসে মোটরে চড়বেন, নিউ মার্কেটে যাবেন—নয়তো আত্মীয়ের বাড়ি। ব্যবসার জায়গায় মোটর নিশ্চই থাকবে।

রিক্সা-ঠেলা পাশ দিয়ে চলবে যে, জায়গা কোথায়? ট্রামের লাইন সারাতে সাতদিন আগে পাথর সরানো হয়েছে। ঠেলার চাকা ভেঙ্গে পথ আটকায়। হকারেরা ফুটপাত জুড়ে দোকান সাজানোর জন্যে পুলিশের হল্লা গাড়ি আসে; সাবধান করে দেয় ডিউটিরত পুলিশ, এ্যাই হুঁশিয়ার হো যাও। দু-চার আনার বাট্টার প্রতিদান। বাড়িভাঙা ইঁট কাঠ। পথচারীর চলার জন্যে লরি, মোটর, ট্রাম-বাসের মিছিলে ভরা রাস্তা আছে। দুর্ঘটনা? কপালে থাকলে ঘটবেই।

শেয়ালদার মোড়? রাস্তা নয়, বাজার ওটা। হাওড়া ব্রীজ বাবু বাজার। পোস্তার মোড় বন্দর, জাহাজ ভিড়েছে মাল খালাস করতে। ধর্মতলা বিদেশী বাজার। চীন, আমেরিকা, জার্মানী, জাপান—বিদেশী মালের পণ্যসম্ভার থরে থরে সাজানো। কিছু আসছে নেপালের পথ থেকে সৎ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে; কিছু দেশী-বিদেশী নাবিকদের কৃপায়। কলার উল্টে জামার ভেতর আত্মীয়ের মাধ্যমে জার্মানীর টেরিলিনের সার্ট দিব্যি আসে। বিদেশী জিনিসের

তুলনা হয়? ইণ্টার ন্যাশানাল স্মাগলিং বিজনেসের মত বিজনেস আছে নাকি?

কি হবে এক কেজি সরষের তেলে চোদ্দ কেজি ভেজাল মিশিয়ে? কি হবে বেবী ফুড আউট-অফ মার্কেট করে? নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে? ওতে তো শুধুমাত্র হাত খরচ হয়। লাভের মত লাভ যাতে হয় তার সন্ধান করতে হবে।

রেশনের জিনিসে পেট ভরে না সপ্তায়। বাইরে থেকে চাল কিনতে হয় ডবল দামে। না কিনলে চলবে কেন? যারা চালের চোরা কারবার করছে, পেটের জন্যেই তো করছে?

রেশনের ব্যাবসায় সরকারের লোকসান। গমের দাম বাড়াতে হয়, আমেরিকার গম আমেরিকার জাহাজে নিয়ে আসবার বাধ্যবাধকতা আছে বলে। চিনির চাহিদা মেটাতে হয় খোলা বাজার থেকে। বৈদেশিক মুদ্রার জন্যে বিদেশে কত দামে চিনি রপ্তানী করতে মালিকরা বাধ্য। লোকসানটা ঘর থেকে তো দেওয়া যায় না? আতপ চালের মণ্ড? বেঙ্গল ফাইন যায় কোথায়? আশপাশের প্রদেশগুলো অখাদ্য সরবরাহ করে? খেতে হবে বৈকি। দিচ্ছে তাই খাচ্ছ—না দিলে?

বরানগরে বাড়ি হলে, জানাশুনা থাকলে অভাব কি? ওখানে সরকারী গুদাম। রক্ষীরা বড় ভাল সব। সামনে দিয়ে মালপাচার হলেও কিচ্ছুটি বলে না।

অভিযোগ? মাথা খারাপ। যারা পায়না তাদেরই গাত্রদাহ।

রেশনিংটা নাকি কমিউনিষ্টদের আমদানী। রেশনিংয়ের জন্যে বাংলাদেশটা ছারে-খারে গেল। বড় বদ ব্যবস্থা।

অথচ সেই কবে, মধ্যযুগে ভারত সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজী মূল্য নিয়ন্ত্রণ, মজুত-বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। সাম্রাজ্য লিপ্সু সম্রাট ক্রমবর্ধমান সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করার জন্যেই

ব্যবস্থাটা অবলম্বন করেছিলেন। স্বল্প বেতনভুক্ত সৈন্তদের কষ্ট লাঘব হয়েছিল, লাভবান হয়েছিল জনসাধারণ।

অবশ্য সম্রাটের দোষেই মুদ্রা-স্ফীতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। কারণ দেবগিরি থেকে লুঠ করা সোনা রূপো সম্রাট শুধুমাত্র জনসমর্থনের আশায় দু'হাতে বিলিয়েছিলেন। আর তারই ফলে বাজারের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য অগ্নিমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। অর্থনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে সম্রাট মূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ দিলেন।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। রাষ্ট্র মুনাফার মাত্রাও নির্দিষ্ট হল! অবশ্য সেই সঙ্গে বাজারে নিয়মিত খাদ্যশস্য আমদানীর প্রতিও সম্রাট পূর্ণ দৃষ্টি রাখলেন। একমাত্র নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের কড়া হুকুমজারী করলেন।

খাদ্যশস্যের দাম নির্দিষ্ট করার পর সম্রাট রাষ্ট্র পরিচালিত খামার ও বাজার প্রতিষ্ঠিত করলেন। যেখান থেকে জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী উভয়ই প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয় করতে পারবে। সাধারণত শস্যের বাজার এতদিন আড়তদারদের (ঐ সময়ে ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী বলে পরিচিত) কর্তৃত্বে ছিল। কিন্তু মুনাফার হার নির্দিষ্ট করে নতুন বিধি জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট ও রাষ্ট্রকে বিপদে ফেলবার জন্যে ব্যবসায়ীরা বাজারে কৃত্রিম ঘাটতির অবস্থা সৃষ্টি করল। বাজারে শস্য আসা বন্ধ হয়ে গেল। সৈন্য ও জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো।

এই অসহনীয় অবস্থায় সম্রাট কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। ব্যবসাদারদের কাছে নতি স্বীকার করা তাঁর ধর্ম নয়। ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ব—সেই ক্ষমতাই তিনি প্রয়োগ করলেন। আদেশ দিলেন সমস্ত আড়ৎদারদের নিজেদের নাম বাজারে রেজিষ্ট্রী করতে। বাজার-অধ্যক্ষ, আড়ৎদারদের নেতৃস্থানীয়দের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করলেন।

সরকারী নিয়মকানুন মানা এবং নিয়মিত সরবরাহ অব্যাহত রাখার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরই কেবল মুক্তি দেওয়া হল তাদের। ব্যবসায়ীদের বলা হল, পরিবারবর্গসহ রাজধানীর কাছে বাস করতে। বাজার-অধ্যক্ষ প্রতিভূ হিসাবে পরিবারবর্গের উপর খবরদারী করবেন। ফলে বাজারে কৃত্রিম ঘাটতির আশঙ্কা দূর হল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দেওয়া হল, উচিৎ মূল্যে কৃষকদের নিকট হতে কর হিসাবে শস্য সংগ্রহ করতে: বিত্তশালী কৃষকদের উদ্বৃত্ত শস্য আড়ৎদারদের নিকট সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করার হুকুম দিলেন রাজস্ব কর্মচারীরা সরকারী নিয়মকানুন পালনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। কারণ, নিয়ম কানুন লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধীর সাথে সাথে তাদেরও কঠোর শাস্তি পেতে হবে। দেখা গেল বাজারে শস্যের আমদানী অব্যাহত রয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় খামারে জমার পরিমাণ সন্তোষজনক। কালোবাজারীর সম্ভাবনা চিরতরে দূর হলো। জনগণকে ইচ্ছামত শোষণ করে মুনাফা লুণ্ঠন বন্ধ হলো।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিনে অনাহার থেকে বাঁচানোর জন্যে তৈরি হলো রাষ্ট্রীয় খামার বা শস্যাগার। খামারগুলোতে শস্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত ছিল।

ঐতিহাসিক বারাউনির মতে, দিল্লীর এবং তার আশে-পাশে খুব কম পাড়া ছিল যেখানে একটি বা দুটি রাষ্ট্রীয় খামার ছিল না। শস্য সংকটের দিনে আড়ৎদারদের এই সমস্ত খামার থেকে শস্য সরবরাহ করা হত। আড়ৎদাররা ঐ শস্য বাজারে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করার জন্য নিয়ে যেত। সংকটের হাত থেকে মুক্তির জন্য রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। ঘাটতির দিনে একটি বা দুটি দান সমেত প্রতি পরিবার পিছু আধ "মণ" (খুব সম্ভবত ছ-সাত সের) শস্য রোজ দেওয়া হত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অসাধু উপায়ে সংগ্রহ করলে পরিনাম ছিল ভয়াবহ। কিন্তু তখনকার দিনে রেশনিং কার্ড চালু

ছিল না,- -তাই যারাই বাজারে যেত তাদেরই প্রয়োজনীয় শস্য দেওয়া হত। ঘাটতির দিনে অসহায় দরিদ্র লোকেরা শস্য ক্রয়ের আশায় ভীড় করতো। ঠেলা ঠেলিতে দু'একজন মারাও যেত। এবং তার জন্যে বাজার কর্মচারীদের কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হত। এমন কি বাজার-অধ্যক্ষের মত পদস্থ কর্মচারীকেও কর্তব্যে অবহেলার জন্যে চরম শাস্তি লাভ করতে হত।

বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্যে সম্রাট প্রচুর দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। মালিক কাবুল নামে একজন অভিজ্ঞ সৎ কর্মচারী বাজার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তাঁর হাতে। বাজারে নিয়মিত পর্যাপ্ত শস্য সরবরাহ এবং নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয়ের দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন তিনি। কালোবাজারী, মজুতদারির বিরুদ্ধে সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অধীনস্ত কর্মচারীরা তাঁকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করতেন। বাজার-অধ্যক্ষ নিয়মিত সম্রাটকে বাজারের সাধারণ অবস্থা মূল্যমান সম্পর্কে রিপোর্ট দিতেন। এছাড়া বাজারে বিভিন্ন ধরণের গুপ্তচর ছিল। যারা সম্রাটকে বাজার সম্বন্ধে গোপনে বিবরণ দিত। এদের অবস্থিতি সম্বন্ধে বাজার-অধ্যক্ষ কিছুই জানতেন না। সম্রাট সত্যতা যাচাই করতেন। বিন্দুমাত্র ত্রুটিতেই ভোগ করতে হত চরম শাস্তি। মালিক কাবুল দারুণ ঘাটতির সময় একবার সম্রাটকে শস্যের মূল্য সামান্য হারে বৃদ্ধি করতে অনুরোধ করেছিলেন। বিনিময়ে সম্রাট আদেশ দিয়েছিলেন কুড়িবার বেত্রাঘাতের।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্ট করার পর তালিকা প্রকাশ্যে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে লটকে দেওয়া হত। মুনাফার মাত্রা ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে রাষ্ট্র নির্দিষ্ট করে দিত। মূল্যের তালিকা তৈরি করার পর বাজারে চালু করার জন্যে দিওয়ান-ই-রিয়াসত অথবা বাজারের ইনসপেক্টর জেনারেলের কাছে পাঠানো হত। বাজারের বিভিন্ন পণ্যের পৃথক-পৃথক তালিকা তদারকির জন্যে বহু সংখ্যক

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইনসপেক্টর জেনারেলদের কাজের সুবিধার্থে কাছে রাখতেন। গোপনে সংবাদ নিতেন ক্রেতাদের কাছে, কি দামে তারা জিনিস কিনছে।

অসাধুতার খোঁজ পেলেই তাঁরা ব্যবসায়ীদের ভয় দেখাতেন, গ্রেপ্তার করতেন—কখনো বা প্রকাশ্যে চাবুক লাগাতেও ইতঃস্তত করতেন না।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারাউনির মতে, ব্যবসায়ীরা ছিল ধূর্ত এবং নির্লজ্জ। জিনিস পত্তরের দাম বাড়িয়ে মুনাফা অর্জন এদের মজ্জাগত। মূল্য নিয়ন্ত্রণের আগে দালালরা মূল্য নির্দ্ধারণ করতো, নির্দোষ ক্রেতা ও সরল উৎপাদন কারীদের নানাভাবে প্রবঞ্চনা করত।

অর্থনীতির ওপর বিশেষ জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও অশিক্ষিত স্বৈরাচারী সম্রাট যে স্বল্প ক্ষেত্রে (দিল্লী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে) সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা বিস্ময়কর। তবে তিনি প্রথম থেকেই ব্যবসাদারদের ওপর নির্মম ছিলেন না, ব্যবসাদাররাই তাঁকে নির্মম হতে বাধ্য করেছিল। ব্যবসাদারদের প্রতি নির্মম শাস্তি প্রদান (ঢালাও চাবুক মারা ও ওজনে কম দিলে সম-পরিমাণ শরিরের মাংস কেটে ক্ষতিপূরণ দিতে হত) সমালোচনার উদ্রেক করতে পারে কিন্তু এছাড়া কালোবাজারীর হাত থেকে পরিত্রাণের কোন পথ ছিলনা। তিনি, ব্যবসাদার নয়, জনগণের দুর্দশা মোচন করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু আজ ?

আজ কালোবাজারী মুনাফাখোরের দলও মাঝে মধ্যে ধরা যে পড়েনা তা নয়, শাস্তিও পায়। কিন্তু ধরা পড়ার থেকে ধরা না পড়ার সংখ্যাই বেশি। মধ্যযুগে আইন ছিল, সাম্রাজ্য লোভি আলাউদ্দীন খিলজীর নিজস্ব, সেই আইনের প্রয়োগ সম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় তা বুঝি সম্ভব নয়। কারণ

দুর্নীতি দূর করা যাঁদের কাজ, আজ তাঁরাই সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি-গ্রস্থ।

অভিযোগ?

অভিযোগটা কি মিথ্যা? প্রমাণ কোথায়? কিন্তু প্রমাণ দেওয়ার পরেও কি কোন সুফল ফলবে? দূর হবে দুর্নীতি, কালো-বাজারী, মুনাফাখোরী?

পণ্ডিত নেহেরু ব্যবসাদারদের সাবধান করে একসময় বলেছিলেন, ল্যাম্প পোষ্টে বেঁধে চাবুক মারা হবে। কিন্তু কজন ব্যবসাদারকে আজ পর্যন্ত চাবুক মারা হয়েছে? তারা কি দুর্নীতি করেনি— না, অসৎ ব্যবসাদারদের চেয়ে ল্যাম্প পোষ্টের সংখ্যা কম?

আদালতে বিচার চলে দোষী নির্দোষীর। সভ্যতার আইন সেখানে। সাক্ষী তামা-তুলসী গঙ্গা জল হাতে নিয়ে শপথ করে, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না—যাহা বলিব সত্য বলিব। সত্যই বলে সাক্ষী। সত্য সাক্ষ্য দেয়। সাক্ষীর মূল্য দশ টাকা। দিনে তিনটে কেসের সাক্ষী হলেই তিরিশ টাকা। খয়চ খরচা বাদ দিয়ে অন্ততঃ পনেরোটা টাকা নিজের। গড় হিসাবে ধরলে পাঁচ টাকা করে, দেড়শো টাকা ইনকাম। পেটের জন্যে—বাঁচার জন্যে।

আইনের সতেরো ঠেলায় নিরপরাধী শাস্তি ভোগ করে। অসহায় অবলম্বন হারায়। টাকার খেলা। যার টাকা আছে, আইনের রায় তার দিকে। আইন সভ্যতার মাপকাঠি। আইনজ্ঞের দল টাকার জন্যে, মিথ্যার জন্যে লড়াই করেন। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে জয়ী হন। জানেন, সত্য নয়, মিথ্যাকে সত্যরূপেই প্রতিষ্ঠা করছেন। কিন্তু টাকা?

ওই টাকার জন্যেই ব্লাড-ব্যাঙ্কে রক্ত বিক্রী করে মানুষ। নিরুপায় বাঁচার চেষ্টা। টাকা চাই। পেটের জন্যে—বাঁচার জন্যেই রক্ত বিক্রী।

আর দেহ বিক্রী?

সেও পেটের জন্যে—বাঁচার জন্যে। কোথাও বা বাঁচানোর জন্যে। নিরুপাও অবলম্বন। রাষ্ট্র-সমাজ ব্যবস্থা বাঁচার পথ করে দেয়নি। নিজের চেষ্টায় বাঁচতে হবে। ক্ষুধার কাছে কি বড় ?

ভুল করেছো, বিনোদ তুমি ভুল করেছো। কতকটা নিজের মনেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন মাষ্টার মশাই।

বিনোদ শুনলো কিন্তু উত্তর দিল না।

মাষ্টার মশাই বসলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন। বললেন, ইন্‌সপেক্টরকে ওভাবে তোমার বলা উচিৎ হয়নি।

বিনোদ প্রশ্ন করতে পারতো। জানতে পারতো, কোথায় তার ভুল। জিজ্ঞাসা করতে পারতো, কি অন্যায় সে করেছে। অন্যায় নয়, ভুল করেছে সে। মাষ্টার মশাইয়ের বিচারে অন্ততঃ তাই। কিন্তু কোন কথা না বলে এবারও সে নীরব রইলো।

মাষ্টার মশাই তার নাম ধরে ডাকলেন।

সে বলল, আপনি যখন বলছেন···

—না বিনোদ। বাধা দিলেন তিনি। বললেন, আমি বলছি বলে নয়। তোমার কি মনে হয় ?

—আমার ? চিন্তা করলো সে। কি মনে হয় তার ? সেকি সত্যই ভুল করেছে ? কোথায় তার ভুল ?

না, ভুল সে করেছে। ভুল করেছে ইচ্ছা করেই। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেনি। সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। সে তো তার ভুল করাই।

—বিনোদ, তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে। ইলেকসনে

রমেশবাবুর হয়ে ক্যানভাস করতে হবে। নেবুতলা বস্তির অনেক ছেলেমেয়ে তোদের স্কুলে পড়ে। গার্জেনরা তোকে ভাল করে চেনে, আমরা জানি তোকে ভালবাসে—শ্রদ্ধা করে। রমেশবাবুর হয়ে তুই যদি বলিস কেউই না করবেন না। রমেশবাবুও বলছিলেন সে কথা। তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন উনি।

—কিন্তু…। বেলেঘাটার ঘটনা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল সে।

—প্লিজ, কোন কিন্তু নয় বিনোদ। একাজ তোকে করতেই হবে। এবার বিধানসভায় রমেশবাবুকে যেতেই হবে।

—কেন? তবু প্রশ্ন করেছিল সে।

—কেন কি? বলছি না এবার রমেশবাবুকে বিধানসভায় যেতেই হবে। তুই ওনার কাছে চল—উনি তোর সঙ্গে কথা বলবেন। আমিও কথা বলেছি। উনি বলেছেন জিৎতে যদি পারেন তাহলে…

—আমার উন্নতির ব্যবস্থা করে দেবেন? মৃদু হাসিমুখেই কথাটা জানতে চেয়েছিল সে।

—নিশ্চই।

—কিন্তু জেতার পর কি সেকথা ওঁর মনে থাকবে?

—কেন থাকবে না। আমি রয়েছি কি জন্যে? রমেশবাবুকে তুই চিনিস না। ওঁর মত লোক হয়না।

সত্যই চিনতো না। শুধু শুনেছিল কিছু-কিছু। মদ, মেয়েছেলে, রেস, জুয়া সবেতেই উনি আছেন। আছে অঢেল পয়সা। সেই পয়সায় ওঁর বাড়বাড়ন্ত ব্যবসা। কত অনুগত শিষ্য। সব সময় যেন ব্রজের কৃষ্ণ। কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে শিষ্যের দলই যথেষ্ট।

বেশ আছেন। কোন অভাব, অভিযোগ, দুঃখ নেই। নিজের দুঃখ নেই বলেই অন্যের দুঃখ বোঝেন। সেবাব্রত নিয়েছেন তিনি। দূর করবেন দুঃখ। যেতে হবে ক্ষমতায়। প্রয়োজন বিনোদদের সাহায্য।

অর্থের জন্যে চিন্তা নেই। দলের মনোনীত প্রার্থী তিনি। দলের

কাছে প্রমাণ করতে হবে যোগ্যতা। বিনোদদেরও তিনি বঞ্চিত করবেন না।

বিনোদ তাঁকে সাহায্য করতে পারেনি। বিবেকে বেধেছিল তার। রমেশবাবু কিন্তু জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর নিকটতম প্রার্থীকে একশত ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন। ব্যবধান যতই কম হোকনা কেন, তিনিই তো জয়ী। মন্দ লোকে অনেক কথাই বলে। ওসবে কান দিলে চলে না। তিরিশ হাজার ভোটারের মধ্যে পনেরো হাজার একশত জনের সমর্থন তিনি লাভ করেছেন। একি কম কৃতিত্ব তাঁর। কি বিপুল জনসমর্থন তাঁর পিছনে। তিনি এবং তাঁর দল কত প্রিয় জনগণের কাছে।

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে বলেছিল, বড় ভুল করলি বিনোদ। দেখলি তো রমেশবাবু জিতে গেলেন। হেলায় সুযোগটা হারালি?

সুযোগ হারিয়েছে অনেকবার। ভুল করেছে। ভাগ্য অযাচিত ভাবে ধরা দিতে চেয়েছে, ধরেনি।

—মাষ্টার মশাই এই টিকেটটা আপনার জন্যেই রেখেছি।

—কিসের টিকেট?

—লটারীর। পরশু খেলা। এইটাই এ খেলার শেষ টিকেট আমার।

—কিন্তু……

—কিন্তু কি মাষ্টারমশাই। কোন কিন্তু করবেন না। এখন না হয় পরে দেবেন। মাত্র একটা টাকা তো দাম।

—কিন্তু আমি ওসব টিকেট কিনি না।

—কিন্তু কিনছে আর সবাই। এস, পালের দোকান যান না, এক ঘন্টা লাইন দিয়ে একটা টিকেট কিনতে হবে আপনাকে। আমি নিয়ে এসে বিক্রী করছি। গরীব লোক পেটটা চালাতে হবে তো।

—না, থাক। ও লটারীর টিকেট আমি নেব না।

—নেবেন না? হতাশ হয়েছিল বিক্রেতা। বলেছিল, নিলে বড় ভাল হোত মাষ্টারমশাই। বিক্রী না হলে টাকাটা লোকসান যাবে আমার। বড় আশা করেছিলাম।

নেয়নি সে। কদিন পরে বিক্রেতার আনন্দ আহ্বান, মাষ্টারমশাই, শুনুন।

দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে।

—আমার সেই টিকেটটা লেগেছে মাষ্টারমশাই। এক হাজার টাকা পুরস্কার উঠেছে।

—বাঃ খুব ভাল। এবার তাহলে ওই টাকায়·· ···

—কোন্ টাকায় মাষ্টারমশাই? ওঃ হো, না মাষ্টারমশাই, আমি পাইনি। টিকেটটা বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। পরমা মুচিকে ওটা জোর করে গছিয়ে ছিলাম।.. একেই বলে কপাল মাষ্টারমশাই। আপনার আমার দুজনেরই সমান ভাগ্য। ও বেটাও নিতে চায়নি। আর টাকা পাওয়ার পরও ব্যাটা কি বললে জানেন মাষ্টারমশাই, না লাগলে তো একটা টাকাই গরীবের যেত। আরে বেটা গরীব-গরীব করছিস। আমি না হয় সংসার চালাবার জন্যে টিকিট বিক্রী করছি। ব্যাঙের ছাতার মত লটারীগুলো গজিয়ে উঠেছে বলেই না বাজারে আনাজ বিক্রী ছেড়ে লটারীর টিকিট বিক্রী করছি। কিন্তু মাষ্টারমশাই হিসাব নিলে বুঝতে পারতেন, সমস্ত রাজ্যে যত লটারীর টিকিট বিক্রী হয় তার তিন ভাগের বেশি গরীবরাই কেনে। ওই যে ছেলেটা বই কেনার বদলে লটারীর টিকিট কিনে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেল। টাকাটা পেয়ে শুধু বই কেন, মোটর চড়ে হয়তো স্কুলে যাবে। কিন্তু যদি না পেত? পায় কজন মাষ্টার মশাই?

—বিনোদ। ডাকলেন মাষ্টারমশাই। সে তাঁর দিকে চাইতে বললেন, দেখ, কথাটা তোমাকে পরে জানালেও চলতো। কমল অবশ্য বলছিল, তোমাকে কিছু জানানোর দরকার নেই। ব্যবস্থাটা ওরই—আমরাও তাই চাই। আর সপ্তা খানেকের মধ্যেই তোমাকে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয়।

—কমল কেমন আছে?

—ভালই আছে। ওর মা বলছিল, দুদিন পরে পথ্য দেবেন বলেছে ডাক্তার।

—আমাকে বলেছিল প্রায় ছ' সাত বছর পরে অসুখ করলো ওর।

বলেছিল আরো অনেক কথাই। সেদিন প্রায় ঘণ্টা তিনেক ছিল ওর কাছে। বলেছিল, অসুখে দুর্বল শরীর নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে বড় খারাপ লাগে বিনোদ। শুধু চুপচাপ শুয়ে শুয়ে চিন্তা। বড় অসহায় বোধ করি। মনে হয় আমি বড় একা। আমার কেউ নেই।

বিনোদ সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলেছিল, সবাই আছে তোমার। কে বললে তুমি একা?

—আমার মন বলে। অসুখে দুর্বল শরীরে মনটা যেন পঙ্গু হয়ে যায়। সব যেন কেমন এলোমেলো। বাঁচার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। ভয় করে। কারণ বাঁচার ক্ষমতা নিজের হাতে নেইতো।

—কে বললে? বুঝিয়েছিল বিনোদ। মনটাই তো সব। মনের ইচ্ছাটাই আসল।

—না মাষ্টার। ম্লান হেসে মাথা নেড়েছিল কমল। এখানে ইচ্ছাটাই সব নয়। ইচ্ছা থাকলেই বাঁচা যায়না। শ্রমিক আমরা, সুস্থ সতেজ মন নিয়ে লড়াই করতেই আমরা অভ্যস্ত।

সেখানে মনের জোরেই লড়াই। একমাত্র লক্ষ্য, আমাদের জিৎতে হবে।

—যদিও···

থামিয়ে দিয়েছিল কমল। বলেছিল, জানি। মালিকের স্বার্থে অনেক সময় লড়াই সুরু করা হয়। আসল নয়, নকল বুঁদির গড় রক্ষার ছলনা। কিন্তু যারা সৈনিক তাদের কাছে সম্মানের প্রশ্নটা বড় কম নয়।

—বটে।

—মাষ্টার, যত দিন যাচ্ছে তত বেশি দলাদলি বাড়ছে। বলতে পারো, দলাদলি বাড়ানো হচ্ছে। দলাদলি বাড়ানোর ষড়যন্ত্র চলছে। ছত্রির দলের হরিহর ছত্রের মেলা যেন আজ। অতীতের কুখ্যাত মুসলিম লীগের নব সংস্করণও দেখা দিয়েছে। ধর্মান্ধতা অথবা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আজ লীগের জন্ম কিনা আমি জানিনা। কিন্তু দলগুলো গজাচ্ছে কেন, ক্ষমতা দখলের জন্যে?

হেসেছিল বিনোদ। বলেছিল, সেটাতো তুমিই ভাল জান।

—আমি কিছু বললেই তো বলবে নিজের দলের হয়ে কথা বলছি। কিন্তু মাষ্টার, সত্যি কথাটা শুনে রাখ, হ্যাঁ আমি বলছি, সাধারণ মানুষের কোন-না-কোন দল না হলে চলেনা সত্যি কথা— তবে দলের প্রতি অন্ধত্বর থেকে নীতির প্রতিই সমর্থন। কথা নয়, কাজ।

—কে করবে?

—সেইখানেই তো কথা। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ফাঁকা আওয়াজে আর কতদিন ভুলবে মানুষ?

—তুমিও বলছো?

—বলছি তোমার কাছে। কিন্তু তখন আমি···

সেদিন কমলদের বাড়ি থেকে এক সময় বেরিয়েছিল সে।

আগামী দিনে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল। কিন্তু যাওয়া সম্ভব হয়নি তারপক্ষে। সে···

—বিনোদ আমরা চাই কমলদের বাড়িতেই তুমি থাকবে। একটু নীরব থেকে মাষ্টার মশাই বললেন, তোমাকে একলা থাকতে হবেনা। পথ্য পাওয়ার পরেও কমলকে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে।

মাষ্টার মশাইয়ের দিকে চাইলো বিনোদ। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, শুধু কি একলা থাকার জন্যে ?

প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠলেন তিনি। উত্তর দিতে গিয়েও পারলেন না। শুধুমাত্র তাঁর ঠোঁট দুটি বারেক কেঁপে উঠলো।

হাসল বিনোদ। মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনি কেন ওকথা বলছেন, আমি জানি মাষ্টার মশাই। আমাকে মেরে যদি কারো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহলে তা হবে শুধু মিথ্যা নয়, ভুল। তবে অন্যায় করার একটা মোহ আছে। মোহ মুক্তিই আমার কামনা। আমিও বাঁচতে চাই।

বাঁচতে চেয়েছিল মানুষ : সে বাঁচা শুধুমাত্র বিদেশী শাসকের শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি নয়, স্বাধীনতাই তার একমাত্র এবং শেষ লক্ষ্য ছিল না। অনেক—অনেক আশা করেছিল সেদিন মানুষ। দারিদ্র, অনাহার, অশিক্ষা আর ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিল। নিরাপত্তা কামনা করেছিল জীবনে।

নেতার দল রাজনীতি করেন। জন সমর্থন তাঁদের অবশ্য কাম্য। সেইজন্য সমর্থন আদায়ে কর্মীরা অক্লান্ত। নেতার গুণগানে, দলের আদর্শ প্রচারে, সত্য মিথ্যার রামধনু গড়ে তুলতে এতটুকু দ্বিধা নেই

তাঁদের। প্রতিশ্রুতি আশ্বাসে তাঁরা মানুষের মন ভোলান। প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্বভার কতটুকু পালন করলেন, সেটুকু চিন্তা করার প্রয়োজন খুব বেশি মনে করেন না বলেই মনে হয়। অন্ততঃ তেইশ বছরে তাঁরা তা কতটুকু করেছেন তা আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ট-উজ্জ্বল।

যদি বলা হয় তাঁরা কিছুই করেননি, তাহলে সত্যের অপলাপ করা হয়। নিশ্চই করেছেন। কিন্তু তাঁদের আকাশ ছোঁয়া ইমারত গড়ার আকাশ কুসুম কল্পনা দেশকে-জাতীকে কতটুকু স্ব-নির্ভর, স্বাবলম্বী করেছে? কেন মুষ্টিমেয়র দল হয়েছে ঐশ্বর্যশালী, অসংখ্য মানুষ বিদেশী শাসন কালের চেয়েও চরম দুর্দশাগ্রস্থ নিরপত্তা হীন হয়ে পড়ছে?

অথচ, দেশকে জাতীকে আত্ম নির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাগাড়ম্বর কম হয়নি। মানুষের জীবন দারিদ্র মুক্ত করার প্রচেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু সত্য সত্যই কি সাধারণ মানুষকে অভিশাপ মুক্ত করার আন্তরিকতা নিয়ে নেতারা, ভারতের ভাগ্য বিধাতার দল তাঁদের দায়িত্ব পালন করে, মানুষের দেওয়া সম্মান, ক্ষমতার মর্যাদা রক্ষা করেছেন?

না, করেন নি।

দেশ নয়, মানুষ নয়—দল। দলীয় ক্ষমতা লাভই সত্য। দল যদি ক্ষমতা লাভ করতে পারে, আর ভয় কি। মানুষ? সাধারণের কথা চিন্তা? ছোঃ ছোঃ, কি এসে যায় তাতে। মাত্র একটি ভোট। মানুষের একটি ভোটের মূল্য কতটুকু? ভোটের মূল্য অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত ভারতবর্ষের মানুষ বোঝে কতটুকু? তাদের সমর্থন আদায় করার জন্যে শ্লোগান-মিছিল, রঙ তামাসা, পোষ্টার, সাহায্য-সভা করে জ্বালাময় ভাষণ, প্রতিশ্রুতির বন্যাই যথেষ্ট। খেল্ মজাদার বাবু—খেল্ মজাদার, এই খেল্ই তো তাদের প্রদত্ত ভোটের মূল্য স্বরূপ যথেষ্ট। তারপর তো নিজেদের রাজ্যপাট। একান্ত নিজেদের

ব্যাপার। সে ব্যাপারে দল ভাঙাভাঙি, ক্ষমতা নিয়ে কামড়া কামড়ি, শরিকী সংঘর্ষ, মন্ত্রী সভার ওলট পালট,—সে তো শুধু নিজেদের। সাধারণ মানুষের কি যায় আসে তাতে? সাধারণ মানুষ শুধু ভোটের সময় ভোট দেবে। ভোটের মধ্যেই তার অধিকার সীমাবদ্ধ। সেই অধিকার টুকুই সে শুধু দিনের পর দিন পালন করে যাবে। আর কিছু নয়, স্বাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের কোন অধিকারই স্বীকৃত নয়।

মানুষের আশার শেষ নেই। আশা করা তার ন্যায় কি অন্যায় সে প্রশ্ন থাক। কিন্তু সে আশা করে, তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। সে কামনা করে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হোক। অন্যায় অত্যাচার অসত্য দূর করার আন্তরিকতা, আকাঙ্খা তাকে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

দীর্ঘ কুড়ি বছরের অন্যায় অত্যাচার অপশাসন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণকে ক্ষুব্ধ বিরক্ত মুক্তি-কাঙাল করে তুলেছিল। মানুষ শান্তি চেয়েছিল, স্বস্তি চেয়েছিল। চেয়েছিল অন্যায়ের অবসান, দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে বাঁচতে। খাদ্যের বদলে গুলি, বিচারের বদলে অবিচার, নিরাপত্তার বদলে পীড়ন চালিয়ে যারা মানুষের জীবনকে করে তুলেছিল অস্থির তাদের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিল বাংলার মানুষ।

কিন্তু কাদের কাছে তাদের মুক্তির প্রত্যাশা?

কি দিয়েছে বাংলার মানুষকে যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলো?

মানুষ নয়, দল। দলই একমাত্র সত্য। দলে দলে শুরু হয়েছিল ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থের সংঘাত। বত্রিশ দফা কার্য-সূচীর চোখ ধাঁধানো রামধনু শুধু চোখই ধাঁধিয়েছে মানুষের। দল-মতের ঊর্দ্ধে উঠে সাধ্য হয়নি তাঁদের মানুষের জন্যে কিছু করা। কারণ দলীয় সংকীর্ণতার ওপরে উঠে মানুষের অধিকার বোধকে স্বীকৃতি দেওয়ার মত মনোবল তাঁদের ছিল না। মানুষ নয়, দলই

তাঁদের কাছে বড়। দলের আদর্শই--আদর্শ। দলীয় আদর্শ রক্ষা করতেই [যদিও আদর্শের পরিপন্থী অভিযোগ বড় কম নয়। সর্বহারার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনেক দলই (তাঁদের নীতিতে বুর্জোয়া—সামন্ত শ্রেণী) প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদের নানা ভাবে সাহায্য করেছে। শত-শত বিঘা জমির মালিক হয়েছেন সর্বহারা, বণিক শিল্পপতিও তাই। যুক্তির অভাব হয়তো নেই। ধনতন্ত্রের পূজারীর মনটাতো সর্বহারা হতে পারে! চা-বাগানের মালিকের অন্যায় ভাবে দখল করা জমির স্বার্থ সর্বহারা নেতার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। অতএব ওঁরা সর্বহারার দলভূক্ত।] মানুষের আশা আকাঙ্খার সংগ্রামকে জলাঞ্জলী দিতে একটুকু বাধেনি তাঁদের। মানুষ নয় দল, দলই একমাত্র সত্য।

এই সত্যের খেলা চলেছে আজ সমস্ত ভারতময়। ব্যক্তি স্বার্থের পূজারীর দল সর্বনাশা খেলায় মত্ত! শুধুমাত্র আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা। সংকীর্ণতাবাদ। দ্বিধা বিভক্ত রাজনীতি। বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে লড়াইয়ের ময়দান গরমের মহড়া সকলেরই আদর্শ, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, কিন্তু মানুষের জন্যে এক হতে তাঁরা পারেন না।

এক সময় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন :

> "বিশ্বজোড়া চলিয়াছে নানান মতবাদের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা। এদের মধ্যে কোন্‌টা টিকিয়া থাকিবে আর কোন্‌টা অবলুপ্ত হইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। আগে ভাগে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের কাছে আমাদের মস্তিষ্ক বন্ধক রাখিতে আমি নারাজ। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কোন নীতিই শেষ কথা নয়। মানবের অপার, অগাধ সৃজনী শক্তি আছে। তার প্রজ্ঞারও ইতি নাই। প্রত্যেক জাতি বা দেশ তার পারিপার্শিকতা, তার অতীত ইতিহাস, তার কৃষ্টি ও

সংস্কৃতি অনুযায়ী তার সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও সংস্থা গড়িয়ে তোলে। মানব জীবনের ক্রমবিকাশের ন্যায় উহারও পরিবর্তন আসিতে পারে এবং আসেও। সুতরাং বর্তমান জগতের প্রচলিত মতবাদের মধ্যে যাহা সুন্দর বা যাহা ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর, যাহা কার্যকরী তাহাই আমরা গ্রহণ করিব।"

কোন মতবাদের প্রতি অন্ধত্ব নয়, ভারতের মঙ্গলই ছিল তাঁর চিন্তা ও ধ্যান।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী যুগে পৃথিবীতে দুটি মতবাদ বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। ফ্যাসীবাদ-নাজিবাদ ও সাম্যবাদ। কারণ, দুটি মতবাদ অনুসরণ করে ইতালী-জার্মানী ও রাশিয়া নিজ নিজ দেশের উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র এই মতবাদ দুটির মধ্যের শুভকর ও কার্যকর উপাদান-গুলি বেছে নিয়ে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নতুন এক মতাদর্শ উপস্থিত করেন। এই মতাদর্শের নামই "সমন্বয়-বাদ"। নাজিবাদ-ফ্যাসীবাদ থেকে জাতীয়তাবাদ এবং মার্কস্‌বাদ থেকে সমাজবাদ নিয়েই তাঁর সমন্বয়বাদ। সুভাষ চন্দ্র প্রদত্ত নাম, সাম্যবাদ।

তিনি বলেছিলেন, "জাতীয় মনোভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে ব্যবস্থা জন সাধারণের সমাজিক প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ, ভারতবর্ষে এইরূপ একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই। তাহা হইবে জাতীয়তাবাদ-সমাজবাদেরই একটা সমন্বয় স্বরূপ।"

বলেছিলেন, "ন্যাশানাল সোস্যালিজিম ও কমিউনিজিমের সমন্বয়ই আমাদের রাষ্ট্রদর্শন হওয়া উচিৎ। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার যে দ্বন্দ্ব, মহত্তর কোন সমন্বয়ের মধ্যেই তার নিবৃত্তিসাধন করিতে হইবে। দ্বন্দ্ব-নীতি সেই কথাই বলে।"

বলেছিলেন, "স্বাধীনতা উত্তর-কালে শ্রমিক স্বার্থে গঠিত এই

দলের নেতৃত্বে শ্রেণী সংগ্রাম সুরু হইবে। সংগ্রামের সেই পর্যায়ে সকল বিশেষ সুবিধা, অবস্থার পার্থক্য ও কায়েমী স্বার্থের বিলোপ ঘটাইতে হইবে যাহাতে দেশে পূর্ণ সাম্যের অবস্থা (রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক) প্রতিষ্ঠিত হয় ”

সুভাষচন্দ্রের সমাজতন্ত্র, কোন্ সমাজতন্ত্র ?

এ সমাজতন্ত্র কি পণ্ডিত নেহেরু গৃহীত মধ্য-ভিক্টোরিয় গণ-তান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ?

তিনি বলেছিলেন, “অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে সুষ্ঠভাবে সমাজ-তান্ত্রিক ভিত্তিতে দ্রুত বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহা কোন মতেই সম্ভব নহে।”

বলেছিলেন, “গান্ধীবাদ সামাজিক পুনর্গঠনের কোন নতুন কর্ম-সূচী দেয় নাই। তাহা ছাড়া ইহা যন্ত্র-সভ্যতার বিরোধী, কুটির-শিল্পের পুরাতন জগতে প্রত্যাবর্তনের পক্ষপাতি, স্বরাজের তত্ব ব্যাখ্যার সময়ে তিনি মধ্য-ভিক্টোরিয় গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলেন এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধীতা করেন না। শিল্পপতিরা সেই কারণেই তাঁহার অনুগত। বর্তমান সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ পরিবর্তনের পক্ষপাতী তিনি নহেন। কারণ মূলে তিনি সংস্কারবাদী, বিপ্লববাদী নহেন। ক্ষমতা পাইলে তিনি বর্তমান ধনতান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থার কাঠামোর পরিবর্তন না করিয়া দেশে যন্ত্র-শিল্পের সর্বাত্মক বিস্তারের বিরোধীতা করিবেন।”

তাঁর মতে :

“India will be called upon to play an important role in world history in the near future. We all know that in the seventeenth century England made a remarkable contribution to world civilization through her ideas of constitutional and democratic

government. Similarly in the eighteenth century, France made the most wonderful contribution to the culture of the world through her ideas of liberly, equality and fraternity. During the nineteenth century Germany made the most remarkable gift through her Markian philosophy. During the twentieth century Russia had enriched the culture and civilization of the world through her achievement in proletarian revolution, proletarian government and proletarian culture. The most remarkable contribution to the culture and civilization of the world, India will be called upon to make."

সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "আমরা ভারতবর্ষের জন্যই সংগ্রাম করছি না, মানবতার জন্যও আমাদের সংগ্রাম। ভারতের মুক্তি—মানবতার ত্রাণ।"

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের সমস্যার কথা, স্বাধীনতাকে সার্থক করার পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আদায় করে নেওয়ার ওপরই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, প্রগতিশীল শক্তির সমাবেশ কংগ্রেসের মধ্যে ঘটুক। শুধুমাত্র কংগ্রেসের মধ্যের সোস্যালিষ্ট গ্রুপ নয়, বাইরের শক্তিগুলির সঙ্গেও কংগ্রেস হাত মেলাক—সমর্থন করুক। কারণ, কংগ্রেসের আহ্বানে যে আপামর জন সাধারণ সমবেত হয়েছে, তারা

এসেছে স্বাধীনতার প্রেরণায়,—যে স্বাধীনতা ধনিকদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বেশি কিছু নয়। তিনি চেয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও যাতে মানুষের জীবনে আসে, এবং সে স্বাধীনতা আনা সম্ভব বামপন্থী প্রগতিপন্থী শক্তিগুলির সহায়তায়।

স্বাধীন ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক হবে, কিন্তু ইংরেজ প্রবর্তিত পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চলতে পারে না, সে বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। কারণ, পরাধীন ভারতে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব নেওয়ার পরে কি ভাবে ব্যুরোক্র্যাসির দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত বা মোহগ্রস্থ হয়েছিল, তা তিনি কয়েক মাসের অভিজ্ঞতাতেই দেখেছিলেন। আমলাতন্ত্রকে বাদ দিয়ে শাসন চলেনা, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের প্রতিরোধে প্রগতিকর্ম অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে তিনি পার্টির ওপরে পার্টির পার্লামেণ্টারী শাখার প্রাধান্যের সম্ভবনাও দেখেছিলেন। মন্ত্রীসভার মূল নীতি নির্ধারণের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ব্যুরোক্র্যাসির জাত বদলের প্রয়োজনীয়তার কথা।

ব্যুরোক্র্যাসি সম্পর্কে ইতিহাসের নজির তুলে ধরেছিলেন তিনি। ব্যুরোক্র্যাসি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে জার্মানীতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে এবং ১৯২৪ ১৯২৯ সালে গ্রেট ব্রিটেনে লেবার পার্টিকে কোন কাজ করতে দেয়নি।

ব্যুরোক্র্যাসি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—

The first thing to do is to change the compostion and character of the Bureaucracy. If this is not done, the congress party may come to grief. In every country, the ministers come and go, but the steel frame of the permanent services remains. If that is not altered in composition and character

the governmental party and its cabinet are likely to prove inettective in putting their principles and practice."

সুভাষ চন্দ্র সেদিন তাঁর সভাপতির ভাষণে যা বলেছিলেন তাকি খুব মিথ্যা বলেছিলেন? স্বাধীন ভারতবর্ষের অধিকাংশ আমলাদের মনোভাবের কি খুব বেশি একটা পরিবর্তন ঘটেছে?

অভিযোগ?

অভিযোগ, কিন্তু এ অভিযোগের কোন প্রতিকার বোধহয় নেই।

অভিযোগ একটা নয়, অসংখ্য। সবচেয়ে বড় অভিযোগ, অর্থ এবং প্রতিপত্তির জোরই স্বাধীন ভারতবর্ষের যোগ্যতা নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি। অর্থ এবং প্রতিপত্তি স্বাধীন ভারতে মণিকাঞ্চন যোগ। প্রতিটি ভারতবাসীর সমান অধিকার স্বীকৃত নয়। স্বাধীন ভারতে এখনও বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত। বিশেষ-বিশেষ সুযোগ-সুবিধায় অনেক কিছুই বিভক্ত।

ভারতবর্ষে আমলা সৃষ্টি করা হয়। হয় অর্থানুকূল্যে, না হয় বিশেষ ব্যবস্থায়। নিম্ন বিত্ত, গরীবের সেখানে স্থান নেই। পেটে ভাত জোটে না, লেখা পড়ার পাঠ সাঙ্গ করতে হয় মাঝ পথে, ছুটতে হয়, দু মুঠো খেতে পাওয়া যায় এমন কোন কাজের সন্ধানে—সেখানে I. A. S.—W. B. C. S হবার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা ছাড়া আর কি? অর্থ এখানে সব। বিশেষ ব্যবস্থার অধিকারী হলেও কথা ছিল।

সেদিন সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতবর্ষের সামনে, কতগুলি সমস্যা প্রধান হয়ে দাঁড়াবে তার কথা বলেছিলেন। দেখিয়ে ছিলেন সমস্যা সমাধানের পথ। দারিদ্র, অশিক্ষা, ব্যাধি, অন্যদিকে সংখ্যালঘু সমস্যা সহ আভ্যন্তরীণ বিভেদের প্রতিকার কল্পে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন, বিদেশী শাসন

আমাদের নীতি-মান এবং সংহতি বোধকে বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে, সেই জন্যে প্রথমেই সর্বোচ্চ তৎপরতা দেখাতে হবে—আত্মত্যাগে, ভারতের ঐক্য বোধে, স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশে।

সেদিন দেশরক্ষার ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কারণ গান্ধীবাদের অহিংসার আসরে সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা বলার বাধা ছিল তাঁর। অহিংসার বেসাতিতে গান্ধীভক্তের দল সেদিন টলমল। তাই তিনি ঐক্যবোধের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি যেন সেদিন আগামীর ভারতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু অন্ধ এবং আয়েসী গান্ধীভক্তের দল ভবিষ্যতের স্পষ্ট ছবিটা চাক্ষুষ করতে পারেন নি। দেশের মানুষের ন্যায্য দাবীকে, অহিংসার মন্ত্রে আত্মহারা হয়ে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করেছেন, ধনিকের স্বার্থরক্ষায় পাঠিয়েছেন সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। লাঠি, টিয়ারগ্যাস, গুলি—শুধু এই ভারতের মানুষের প্রাপ্য। কিন্তু অহিংসা দিয়ে ইংরেজ হঠিয়েছে, এই গর্বে তাঁদের অহিংসার সামনে হিংসা হারিয়ে ফেলবে তার হিংসা। স্বাধীনতা লাভের পনেরো বছর পরে অহিংসাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার নির্বুদ্ধিতা দেখাতে এতটুকু বাধেনি তাঁদের। সব দোষের দায়ভাগী হয়েছিলেন বেচারা কৃষ্ণমেনন। মাঝে মাঝে শুধু অভিযোগ শোনা যায়, দেশরক্ষাবাহিনীর বড়কর্তার দল নাকি সব জেনেও খানাপিনার মত্ত আসরে মগ্ন ছিলেন। কর্তব্য পালন করছিলেন, নাচের আসরে মদমত্ততার মাঝে।

আর জাতীয় পতাকা ?

জাতীয় পতাকা আজ শুধু একখণ্ড কাপড়ের টুকরো ছাড়া আর কি ? কি মূল্য আছে আজ জাতীয় পতাকার ?

আছে। জাতীয় পতাকা একটা সমগ্র জাতির গর্ব-সম্মান। সেই সম্মান আজ ধূলুণ্ঠিত। সেই সম্মানের বস্তুকে জাতীয় নেতার দল অসম্মানের নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করেছেন। সাধারণ মানুষ জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাতে ভুলে গেছে। জাতীয় পতাকা

যেখানে অপমানিত লাঞ্ছিত হয়, সেখানে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণের বালাই নেই। উৎসবে আনন্দানুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা ওড়ে। দিনে রাতে সমানে ওড়ে পতাকা। ওড়ে কোথাও ছিন্ন অবস্থায়, কোথাও বা উল্টোভাবে। অভিযোগ উঠেছে। প্রতিকার হয়নি। প্রতিকার করবে কে? জাতির উত্তোলিত আন্দোলিত চেতনার প্রতীক উৎসবের আর পাঁচটা সাজ-সজ্জা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। কিন্তু কেন?

কেন আজ ভারতবর্ষের জনগণের এক অংশ সময়ে-সুযোগে 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে সাহসী হয়? তারা কি ভারত-রাষ্ট্রের নাগরিক নয়? ভারতবর্ষ কি তাদের জন্মভূমি নয়? আপন জন্মভূমির অমর্যাদা—সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে কেন প্রশ্রয় দেওয়া হয়? কোন্ স্বার্থে? কোন্ স্বার্থে মেনে নেওয়া হয় অযৌক্তিক দাবী? আলাদা স্বতন্ত্র বোধের স্বকৃতি দেওয়া হয়, কেন?

সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্ত অথচ তখনও নিরন্ন, অশিক্ষিত ব্যাধিগ্রস্থ মানুষের ভেতরকার চেতনাশক্তিকে আহ্বান করতে, ভারতের ঐক্যে উদ্বুদ্ধ করতে, তাদের মধ্যে সচেতন দেশ-প্রেমকে অবচেতন সংস্কারে রূপান্তরিত করতে। তিনি চেয়েছিলেন, ধর্ম নয়—জাতিভেদ নয়, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। নবীন ভারতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষ শুধুমাত্র একটি পরিচয়ে পরিচিত হবে—সে পরিচয় মানুষের।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ 'সাইমন কমিশন' বয়কটের একটি সিদ্ধান্ত নেন, এবং যুগ্ম নির্বাচক মণ্ডলীর সমর্থন জানান। মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন ও কংগ্রেসের অধিবেশন সেবার কলকাতায় বসে। মুসলিম লীগ, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রস্তাব গ্রহণ করে। সে সময় পরলোক গমন করেছিলেন প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা হাকিম আজমল খান। তাঁর

প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে ১৯২৮ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি জনসভা আহুত হয়। আহ্বান করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ডঃ এম, এ, আন্সারী, ডঃ অ্যানি বেশান্ত, সরোজিনী নাইডু, জিন্না, মৌলানা মহম্মদ আলি, মৌলানা সৌকত আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডঃ কিচলু, মৌলানা সফি দাউদি, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, বিপিনচন্দ্র পাল, মহম্মদ ইয়াকুব ও আসফ আলি। আর ছিলেন জওহরলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। সভায় সকল দলের নেতারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় সুরু করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি সেদিন তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, "আজ আমি একটা বেদনাদায়ক কর্তব্য পালনের ভার পেয়েছি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশন সমাপ্ত হবার পরই মাতৃভূমির নিষ্ঠাবান সেবক হাকিম আজমল খানের মৃত্যুতে সারাভারতে জাতীয় শোকের ছায়া নেমে আসে। জাতীয় সংগ্রামের পক্ষে হাকিমজীর মৃত্যু এক অপূরনীয় ক্ষতি। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ব্যাপারে তাঁর অমূল্য অবদান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির কীর্তিত হবে। মাদ্রাজ কংগ্রেসে যে ঐক্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার সুফলগুলি তিনি যদি দেখে যেতে পারতেন তাহলে আরও শান্তিতে তিনি মৃত্যু বরণ করতে পারতেন। ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের অব্যবহিত পর যখন স্বরাজ পার্টি গঠিত হয় তখন বহু নেতা জনসাধারণের বিরাগ ভাজন হন। হাকিম আজমল খান তখন তাঁর নির্ভীক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে জামিয়াৎ উল—উলেমার সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেও স্বরাজ পার্টিতে যোগ দেন। হাকিমজী ছিলেন স্বরাজ পার্টির একটি স্তম্ভ স্বরূপ। অনেক মুসলমান সন্দেহ করতেন যে স্বরাজ লাভ হবার পর ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষিত

হবে না। হাকিমজী কিন্তু ভিন্ন কথা ভাবতেন। তাঁর মতে স্বরাজ লাভ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের কোনো সম্প্রদায়ের স্বার্থই সুরক্ষিত হবে না।

হাকিমজী যখন ইয়োরোপে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার বহু দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তিনি পর্যালোচনা করেছিলেন। তার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, ভারতের মুসলমানরা যদি সত্যই ইসলামের সেবা করতে চায় তবে দেশের হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে যোগ দিতে হবে। সকল খাঁটি মুসলমানই উপলব্ধি করেছেন যে আমাদের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে নিখাদ জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেওয়া। হাকিমজীর জীবন থেকে এই শিক্ষাই লাভ করা যায়।"

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে ঐক্য প্রচেষ্টার ওপর তিনি বার-বার জোর দেন। তাঁর দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ছিল, জনসংখ্যা সমস্যা, ভূমি ব্যবস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প।

জন সংখ্যার ব্যাপারে তিনি জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় দারিদ্র্য দূর করতে হলে কোনো-না-কোনো ভাবে জনসংখ্যার স্ফীতি রোধ করতে হবে। যদিও গান্ধীজী কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে অতি-মানুষের আত্ম সংযম দাবি করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে গান্ধীবাদী নেতার দলের আচ্ছন্ন দৃষ্টি দূর হতে বেশ কিছুদিন দেরি হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর দারিদ্র্যের মধ্যে ভারতবর্ষকে বেঁধে রাখার মোহ কেটেছিল। সুরু হয়েছিল কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ। প্রচার চালাও—শুধু প্রচার। দীর্ঘদিনের ভুলের সংশোধন প্রচারে ঢেকে দিতে হবে। ছোট পরিবার—সুখী পরিবার। দো ঔর তিন বাচ্চে ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি…

ভূমি ব্যবস্থা এবং শিল্প ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, সমাজ-

তান্ত্রিক ধারায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বণ্টন করার কথা। ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সংস্কারের পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, (জমিদারী প্রথা কংগ্রেসী সরকার উচ্ছেদ করেছেন, প্রভুদের কৃপায় জমিদারের দল স্বনামে-বেনামে, ইন্দুবালা নামে, ছাগলের নামে, গাভী ভগবতী দেবী, কুকুর কালু থেকে কালিপদ—জন মুনিস, পাড়া পড়সী কাউকে বাদ না দিয়ে উদার ভাবে জমিদারীর বেশ কিছু বাগিয়ে বসে আছেন। আইনের সাধ্য কি, সেসবে দাঁত ফোটায় ?) কৃষকদের পুরাতন ঋণ মুকুব, কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা (আগে আলোচনা করা হয়েছে), সমবায়ের প্রচার (হরি-হরি) এবং চাষের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন (আগে আলোচনা করা হয়েছে) শুধু… ।

আমাদের দেশে পূর্ব ইয়োরোপ থেকে আগত যে সব ট্রাক্টরের কথা শোনা যায় সেগুলো আসে পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়া থেকে। রুশ ট্রাক্টরের মডেলটি—রুশ-বিপ্লবের আগের। ইণ্টার ন্যাশনাল হার্ভেষ্টার ট্রাক্টর ১৯১৭ সালের আগেই রাশিয়ায় প্রচলিত ছিল। অবশ্য এখন তার অনেক যন্ত্রাংশ পাল্টানো হয়েছে, তবু খুব আধুনিক হয়নি। তবে রুশ ট্রাক্টর মজবুত, দাম কম, চাষের পক্ষে উপযোগী।

রুমানিয়ার ট্রাক্টর রুশ ট্রাক্টরের কপি হলেও তার চেহারা পাল্টানো হয়েছে, নতুন ইঞ্জিন যোগ করা হয়েছে। পোল্যাণ্ডের ট্রাক্টর (য়ুরসুম) চমৎকার জিনিস। বুলগেরিয়ার ট্রাক্টরও ভালো কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ট্রাক্টর এসেছে কিন্তু চালানো হবে কেমন করে ? তাছাড়া মেরামতের কোন ব্যবস্থা নেই, যন্ত্রাংশ বিকল হলে পাল্টানোর জন্যে নতুন যন্ত্রাংশ পাওয়া যায় না। কাজেই আমদানীর মাল অচল হয়ে পাহাড়ের আকার ধারণ না করলেও কিছুটা জায়গা জুড়ে আছে।

সবচেয়ে বড় অভিযোগ ১২৫০০ টাকার বিনিময়ে ক্রীত

পূর্ব-জার্মানীর দ্রব্যগুলির বিরুদ্ধে। যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে ১০০০০ টাকায় ভাল ট্রাক্টর খরিদ করা যায় কিন্তু পূর্ব-জার্মানী ট্রাক্টর পাঠাবার চুক্তি করে প্রতিটির মূল্য ১২৫০০ টাকা করে নিয়ে মাত্র ২০০০ হাজার 'টুল ক্যারিয়ার' পাঠিয়েছে - যেগুলি বর্তমানে ইয়োরোপীয় ফার্মে, ঘোড়া যে কাজ করত সেই কাজ করে, শুধু এখানে কোন কাজ নেই। কাজ না থাকলেও ঘোড়ার বিকল্প ২০০০ 'টুল ক্যারিয়ারের' মূল্য বাবদ ভারতের গেছে ২৫,০০০০০০ টাকা মাত্র।

কিন্তু টাকাটাই তো সব নয়। বন্ধু দেশ সব। বন্ধুত্বের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখতে, দাম বেশি নিয়ে, ট্রাক্টর অকেজো হলে তা সারাবার কোন উপায় না রেখে, এমন কি একরকমের বলে আর একরকম মাল পাঠিয়ে যদি ভুল করেই থাকে তাতে আর কি করা যায়। তাছাড়া যখন মালগুলো ফেরৎ দেবার কোন উপায় নেই তখন গরীব দেশের সামান্য কিছু টাকা (আমদানী-কৃত সমস্ত মালের মূল্য—?) যায় তো যাক। তাবলে বন্ধু দেশের সঙ্গে ঝগড়া করা তো শোভা পায় না। কি, তাই না?

শিল্পায়নের ব্যাপারেও সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন। বলেছিলেন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের কথা, বৈদেশিক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের সত্য পরিচয় তুলে ধরতে হবে। ভারতবর্ষকে নিজের সুন্দর কাজে দাঁড়াতে হবে। ভারত যেখানে গরীয়ান, বা তা হতে সচেষ্ট, তার বিষয়ে প্রচার চালাতে হবে। প্রচার 'প্রোপাগাণ্ডা' নয়,—(প্রোপাগাণ্ডার মধ্যে মিথ্যার ভাব আছে, যা আজ অনেক বিদেশীদের উদ্দেশ্য—এবং অভ্যন্তরে তাই চলেছে, সত্য মিথ্যায় মেশামিশি প্রোপাগাণ্ডাই তো আজ বহু জননেতা, সরকারী প্রচার যন্ত্রের সত্য প্রচার)।

সুভাষচন্দ্রের নীতি, গান্ধীজীর 'শত্রুকে ভালোবাসো' নীতির বিরোধী। গান্ধীজীর ধনিক অছিবাদের নীতির সঙ্গে মতান্তর ঘটেছিল তাঁর। তিনি সংগ্রামে কিষাণ-মজদুরদেরও চেয়েছিলেন।

চেয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা—মানুষের মুক্তি। গান্ধীজী চেয়েছিলেন, শাসককুলকে কোনমতেই বিপদে ফেলা অথবা বিপদগ্রস্থ করে তোলা চলবে না। তাই তিনি রাজবন্দীদের দাবী আদায়ের জন্যে অনশন পন্থাকে বারবার নিন্দা করেছেন। সুভাষচন্দ্র বন্দীর যন্ত্রণার প্রতিবাদকে পরম শ্রদ্ধায় বুকে তুলে নিয়েছেন।

গান্ধী নীতি অহিংসা ও ক্ষমার ওপর নির্ভরশীল। শাসক শক্তি যদি পশুত্ব প্রকাশে পিতার সামনে কন্যাকে, পুত্রের সামনে মাতাকে ধর্ষণ করে তাহলেও প্রতিবাদ করা চলবে না, শত্রুর টুঁটি চেপে ধরা মহাপাপ। শত্রুকে বোঝাতে হবে, সে যে ভুল করছে তা দেখিয়ে তার অন্তরের অনুশোচনার জগদ্দল পাথরকে গলিয়ে খাঁটি অহিংস করে তুলতে হবে। শত্রুর হৃদয় অহিংসা এবং ক্ষমার মন্ত্রে জয় করার মধ্যেই গান্ধী নীতির সার্থকতা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় (১৯৩২) পরাধীন ভারতের মানুষের ওপর কারা অত্যাচার করেছিল? ইংরেজ? ইংরেজ অত্যাচার করেছে, আর তাদের সহযোগি বেতন-ভুক দেশী পুলিশের দল আর সৈন্যরা। পুলিশ গ্রাম অবরোধ করেছে। কংগ্রেসীদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পাইকারি জরিমানা করেছে, মার-ধোর, সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেওয়া, স্ত্রীলোকের মর্যাদা হানী, লুঠ পাট, গালা-গালি দেওয়া, খাদ্যশস্য নষ্ট করে দেওয়া, পুরুষদের উলঙ্গ করে দিয়ে মেয়েদের দেখতে বলা—কি করেনি সেদিন ভারতীয় বীরপুরুষের দল?

আর আজ?

আজও কি বন্ধ হয়েছে পুলিশ-বাহিনীর সন্ত্রাস মূলক কাজ?

কেন বন্ধ হয়নি? কোন্ স্বার্থে?

অথচ গান্ধীবাদে পুলিশের ভূমিকা নাকি সমাজ সংস্কারকের!

সুভাষচন্দ্র গান্ধীবাদের তল্পিবাহকের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন নি বলে একদিন কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। গান্ধীবাদের সঙ্গে সুভাষবাদের দ্বন্দ্ব সুভাষচন্দ্রকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। বৃহত্তর স্বার্থের কাছে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ জয়ী হয়েছিল। তবে সে জয়ে আনন্দিত হওয়ার চেয়ে কলঙ্ক গোপনের চেষ্টাই ছিল প্রকট। ক্ষুদ্রস্বার্থের দাসত্বকারী মাননীয় নেতার দল সেদিন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। সুভাষ-ভীতি দূর হয়েছিল তাঁদের। পরম আরামে তাঁরা ভারতের প্রতি ঘরে-ঘরে কল্পনায় চরকার মধুর সঙ্গীত শুনেছিলেন। আজ অভুক্তের আর্ত হাহাকার।

গান্ধীজী চেয়েছিলেন রাম-রাজত্ব। অতীত ভারতের চিত্র তাঁর বাস্তবতায় ধরা দিয়েছিল। যন্ত্র বলতে, সেলাই কল। তার বেশি গ্রহণ করার মত মনোভাব তাঁর ছিল না। গ্রামীণ সমাজ। কুটির শিল্প—চরকা। মেঠো পথ। গরুর গাড়ি। টিপ্-টিপ্ আধছায়া অন্ধকারে লণ্ঠনের আলো। সূর্যের প্রদীপ্ত তেজে জ্বলবে শুধুমাত্র 'অহিংসা'। যন্ত্র সভ্যতা মহাপাপ।

যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যন্ত্রকে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য হয়নি ভারতের। একদিনের সুভাষ-বিরোধী গান্ধীভক্তের দল, গান্ধী চিন্তা—গান্ধী স্বপ্নকে খাটিয়ায় তুলে শ্মশান যাত্রী করে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রগতি কর্মে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল ভারতকে। যন্ত্রকে দূরে সরিয়ে রেখে চরকাকে আঁকড়ে থাকা সম্ভব হয়নি।

এই প্রগতি কর্মের মহানায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। মূক মুখে ভাষা ফুটিয়েছিলেন তিনি। নবীন ভারতকে দান করেছিলেন বাঁচার মন্ত্র। কি অদ্ভুত তাঁর মেধা, সৃজনী শক্তি—

'ডিস্‌কভারি অফ ইণ্ডিয়া'র লেখক তিনি, নায়ক তিনি—ন্যাশান্যাল প্ল্যানিং তো তাঁরই কীর্ত্তি।

বটে-বটে, ধন্য নেহেরু, ধন্য ভারত। পণ্ডিতজী অমর রহে!

সত্য-সত্যই অমর থাকবেন তিনি। অমর থাকবে তাঁর কীর্তি-গাথা। তাঁর 'ভারত আবিষ্কার' স্বার্থক। কি নির্লজ্জ বেহায়া-পণায় ন্যাশান্যাল প্ল্যানিংয়ের সুদীর্ঘ আলোচনায় ভুলে গেছেন সুভাষ-চন্দ্রের নাম। ভুলে গেছেন অতীতের সহকর্মী বন্ধুর স্মৃতি। সত্যি, মানুষের মত বেইমান জীব দুনিয়ায় আর একটিও নেই।

কিন্তু কেন এই বেইমানী? সত্য গোপন? কোন্ স্বার্থে?

বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি, গিরির স্বীকারোক্তি:

"He (Netaji) was primarily instrumental in establishing the National Planning Committee which laid down the foundations for realistic economic planning of our resources."

পরাধীন ভারতে গান্ধী ভক্তের যেমন অভাব ছিল না, তেমনি স্বাধীন ভারতে নেহেরু অনুরাগীর অভাব কখনো হয়নি। অবশ্য ভক্তের দল গুরুপ্রসাদী লাভের আশাতেই যে গুরুবন্দনা করে গেছেন সেটুকু বলার দুঃসাহস নেই। কিন্তু যাঁর উদ্যোগে ন্যাশান্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয় তাঁর নামটিই শুধুমাত্র সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে বিদগ্ধ পণ্ডিত মনীষি শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর গুরুবন্দনায় (Talks on Planning গ্রন্থে) নেহেরুকে নিয়ে অনেক ধানাই পানাই শেষে (কথাটা লেখার জন্য পাঠক ক্ষমা করবেন, ন্যায় ও সত্যের খাতিরে এ কথাটি লিখতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ, সত্যকে অস্বীকার অথবা মানবতা বোধকে ক্ষুণ্ণ করা ঐতিহাসিকের কলঙ্ক) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জনৈক কংগ্রেস সভাপতির কথা বলেছেন। নামোল্লেখের মহাপাপ অথবা মহা অপরাধ তিনি তাঁর ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ্য চাতুরী দিয়ে এড়িয়ে গেছেন।

কিন্তু কেন ?

গান্ধী নীতির অন্ধ ভক্তত্ব গ্রহণ করতে পারেন নি বলেই কি ?

সেইজন্যই কি সুভাষচন্দ্র অপরাধী ?

সত্য সত্যই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মন ভোলানো নীতিব বিরোধীতা করে মহা অপরাধ করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ, ভারতের লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষের কথা চিন্তা করা। তাদের দারিদ্র মুক্তির পথসন্ধান।

তবে, সেদিন সুভাষচন্দ্র প্রবর্তিত ন্যাশান্যাল প্ল্যানিং কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন, শ্রী ভি, ভি, গিরি। এবং সুভাষচন্দ্র গঠিত প্ল্যানিং কমিশনে সভাপতিত্বের পদ নিয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরু। গান্ধীবাদের গরুর গাড়িকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সুষ্ঠ চিন্তাধারার প্রয়োগের জন্যে গান্ধীজীর কাছের মানুষকে অনুরোধ করে ডেকে এনেছিলেন সুভাষচন্দ্র। সভাপতি হয়ে নিজের নামকে অক্ষয় করে রাখার পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন ভারতের মঙ্গল—দেশের উন্নতি, মানুষের উপকারই ছিল তাঁর ধ্যান-ধারণা। জওহরলালকে প্ল্যানিং কমিটিতে নেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য, গান্ধীজীর অন্ধত্ব অহমিকার বিরোধীতা থেকে কমিটিকে বাঁচানো। স্নেহ মানুষকে অন্ধ করে, আদর্শ বিসর্জন দেয়, গান্ধীজীও হয়তো জওহর-স্নেহে কমিটি ধ্বংস থেকে বিরত থাকবেন।

ন্যাশান্যাল প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন ভারতবর্ষের দুই বড় প্রতিভা। একজন কবি, অন্য জন বৈজ্ঞানিক। রবীন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ সাহা।

এবং আজকের দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার জন্মদাতা মেঘনাদ সাহা। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে মূল সভাপতির অভিভাষণে পরিকল্পনার খসড়া তিনি প্রথম উপস্থিত করেন।

ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনে জাতীয় পরিকল্পনার কথা তিনি দিনের পর দিন বলে গেছেন। নানান দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি অল্প সময়ের

মধ্যে কিভাবে জাতীয় উন্নতি ঘটানো যায় তা দেখিয়েছেন। জাতীয় পুনর্গঠনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন।

ফল?

একদিন, সুভাষচন্দ্রের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনিও। সুভাষচন্দ্রকে বাধ্য করিয়েছিলেন মহাত্মা এবং তার ভক্তের দল। মেঘনাদ সাহাকে পণ্ডিতজী এবং তাঁর অনুচররা।

কিন্তু কেন?

গান্ধী চরিত্রের অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গান্ধীবাদের বড় অংশের বিরোধী ছিলেন তিনি। আর মেঘনাদ সাহা কোনদিনই গান্ধী ভক্ত নন। তার প্রধান কারণ তিনি বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের পথ সস্তা ভাবাবেগ, অবনতির পথে যাত্রা নয়—বিজ্ঞান থেমে থাকতে জানেনা। বিজ্ঞান এগিয়ে যেতে চায়। গান্ধীজী থামিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের জনজীবন। ধনীক শ্রেণীর অছিবাদের তত্ত্ব কথায় ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন মানুষের মনকে। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন গ্রাম-ভারতের আদিম যুগের অন্ধকারে।

সুভাষচন্দ্র তাঁর শিল্পায়ন পরিকল্পনায় শুধুমাত্র বৈষয়িক সমৃদ্ধির দিকটাই বিবেচনা করেননি, ভারতীয় জন মানসের বিজ্ঞান ও চেতনার সম্পর্ক সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। সমস্যাগুলো ভাবাবেগ দিয়ে নয়, বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করতে হবে। বুঝেছিলেন, গান্ধীবাদের চরকাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, মানুষের মনে যুক্তি নির্ভর বৈজ্ঞানিক চেতনা জাগানো ছাড়া গত্যান্তর নেই।

কিন্তু হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র একটু অধিক মাত্রায় লেনিন-রাশিয়া এবং সমাজতন্ত্রের কথা ব্যবহার করেছিলেন। আর সবচেয়ে সর্বনাশা কথা তাঁর, স্বাধীন ভারতে 'হ্যাভস'দের খরচে 'হ্যাভ-নটস'দের উন্নতি ঘটাতে হবে।

সুভাষচন্দ্রের 'ন্যাশান্যাল প্ল্যানিং' কমিঠি গঠিত হওয়ার আট বছর

আগে (১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে) ইংরেজ-শুভার্থীদের উদ্বেগ এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। যদিও তাঁর যাওয়ার ব্যাপারে বহু ওজর আপত্তি--নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর গতি রোধ করা সম্ভব হয়নি। যদিও ইংরেজ তা পারতো। বিশেষ করে জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর কবির 'নাইট হুড' ত্যাগের জন্যে তিনি আর তখন ইংরেজের বন্ধু নন (বন্ধু তিনি কোনদিনই ছিলেন না)। কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেন্ট পাসপোর্ট না দিয়ে পারেনি।

কিন্তু কি দেখেছিলেন তিনি সেখানে ?

তাঁর নিজের কথায় :

"আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থ দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"

কেন ? রাশিয়া তীর্থ কেন ?

"আমি নিজের চোখে না দেখলে কোন মতেই বিশ্বাস করতুম না যে, অশিক্ষা এবং ও অবমাননার নিম্নতল থেকে আজ কেবল মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক, খ, গ, ঘ, শেখায়নি, মনুষত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি মন্দিরের প্রাঙ্গণে। মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয়, দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে।"

রাশিয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে বলেছিলেন, "রাশিয়ার বিপ্লবের বাণী বিশ্ববাণী।"

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার উন্নতির মূলে, শিক্ষা বিস্তার, কৃষি-সংস্কার, ব্যাপক শিল্প রূপায়ন।

তিনি বলেছেন, "১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে যে-বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এদেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলাস্ত্র চক্ষেও

(হতেই হবে, কারণ···)। তা হলেও তাদের বিস্তৃত ও সুদূর-প্রসারী রূপ দেখে আমি খুবই আনন্দিত (তা আর বলতে !) ।"

গুরুভার দায়িত্বের চিন্তায় অভিভূত পণ্ডিতজী, "সব গুণ না থাকলেও আমার দু' একটি বিশেষ গুণ আছে" তাঁর স্বকারোক্তি— "আমি কোন বিশেষ একটি দিক দিয়ে, বিষয়টিকে দেখি না; আমার মন শিল্পের নির্বিশেষ চরিত্র ভাবনায় আকীর্ণ।" জানালেন, "সংকীর্ণ ক্ষুদ্র দৃষ্টি চলবে না, আমাদের কাজ গোটা দেশের শিল্পদৃষ্টি বদলে দেওয়া (যদিও প্ল্যানিংয়ের কাজ করেন সুভাষচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহা। আসল খসড়া প্রস্তুত করেন পি. এন, ঘোষ ও মেঘনাদ সাহা)। আর গোটা ব্যাপারটাকে যদি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারা না যায়, তাহলে ঝিমানো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। জাতীয়তার ভিত্তিতেই প্ল্যানিং হওয়া উচিত।"

বললেন, "দেশে মূল প্রসারী জাতীয় আন্দোলন চলছে, তা দূরতম গ্রামের জীবনে পর্যন্ত বিপ্লব এনেছে। বস্তুতঃপক্ষে গত আঠারো বছর ধরে জাতীয় আন্দোলনে কুটীর শিল্পের বিশেষ সহায় রূপে অবলম্বন করা হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি কোনো পরিকল্পনা করা হয় তাহলে তা কেবল জীবনী শক্তি বিহীনই হবে না, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থও হবে। বুদ্ধিগত এবং মনস্তত্ত্বগত বাস্তববোধ চাই, তাকে তথ্যনিষ্ঠ হতে হবে, এবং সেই ধরণের বাস্তববোধের আবশ্যিক ভিত্তি হল জাতীয় আন্দোলনের জীবন্ত সমস্যা-গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমি আশা করি, কমিটি এই বিষয়টিকে স্মরণ রাখবে ; যদি না রাখা হয় তাহলে বদ্ধ জলায় গিয়ে পড়বে।"

অর্থাৎ,—সেই চরকা এবং খাদি। যে খাদি ভারত স্বাধীন হবার পর ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করে কংগ্রেসী নেতাদের, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের সুখের স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। খাদির মহিমায় কংগ্রেসীরা হয়েছে বাড় বাড়ন্ত। গৌরী সেনের টাকা—মানুষের টাকায় শয়তানদের সমবায় গড়ে উঠেছে।

সুভাষচন্দ্র বৃহৎ শিল্প-নির্ভর করে তুলতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে। অবশ্য তিনি কুটীর শিল্পকে শেষ করে দেওয়ার মনোভাব কোথাও দেখাননি। বরং তিনি চেয়েছিলেন বৃহৎ শিল্পগুলির সঙ্গে সঙ্গে কুটীর শিল্পগুলিও এগিয়ে যাবে।

যে সময় সুভাষচন্দ্রের ন্যাশানাল প্ল্যানিং কমিটির গঠন—সে সময় গান্ধীবাদের কুটীর শিল্পের সঙ্গে, ইংরেজ সরকার দেশের নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধারের প্রচার চালাচ্ছে।

সুভাষচন্দ্রই প্রথম বললেন, "কয়েকটি মধ্যযুগীয় শিল্পের 'পুনরুদ্ধার' ভারতের পক্ষে বিবেচনার বা সমস্যার বিষয় নয়, তার মূল চেষ্টা হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পায়ন। ভারত রয়েছে যন্ত্রশিল্পের পূর্ব যুগে। শিল্প বিপ্লবের কর্মে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। শিল্প বিপ্লব ঘটাতেই হবে ভারতবর্ষে, নইলে, ভারতের অগ্রগতি অসম্ভব, এই বৈজ্ঞানিক যুগে। ব্যাপারটা আমাদের ভাললাগা মন্দ-লাগার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।"

বললেন :

"We can at best determine whether this revolution, that is industrialisation, will be a comparatively gradual one, as in Great Britain, or a forced march as in Soviet Russia. I am afraid it has to be a forced in this country."

কুটীর শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বললেন :

"ভারতের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে যন্ত্র-শিল্পায়নের পরিকল্পনাকেই বোঝাবে। যন্ত্র-শিল্পায়ন বলতে ছাতার বাঁট বা ঘণ্টার ধাতুপাত তৈরি বোঝায় না, যেমন স্যার জন অ্যাণ্ডারসন বোঝাতে চেয়েছেন।"

অবশ্য সুভাষচন্দ্রের মত সকল কংগ্রেসীর মত নয়। তবে কংগ্রেসের তরুণ দলের মত (পণ্ডিত নেহেরুর মত কি)? এবং সে সময় অনেক কংগ্রেসীই বৃহৎ শিল্প বলতে দেশলাই কারখানা ভাবতেন,

শিল্লায়নের মূর্তিরূপে কল্পনা করতেন কার্ড বোর্ড তৈরির, সাবান কলের ব্যাপার।

সুভাষচন্দ্র শিল্লায়নকে কেন প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন ?

(১) বেকারী দূর করার জন্য। যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা উৎপাদন বাড়াবে কিন্তু বেকারীও বাড়াবে; সুতরাং উদ্বৃত্ত মানুষগুলির কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প প্রসার চাই।

(২) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। সমাজতন্ত্র ভাবী ভারতের আদর্শ—তার সঙ্গে শিল্লায়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

(৩) বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য।

(৪) জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য।

জাতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি নিয়ন্ত্রক নীতি সম্বন্ধে :

(১) শিল্পের দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী অখণ্ড ক্ষেত্র, এ কথা সত্য হলেও জাতীয় আত্মসম্পূর্ণতার প্রয়োজন আছে, বিশেষত অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ব্যাপারে।

(২) মূল শিল্পগুলির বিকাশের চেষ্টা করতে হবে, যথা বিদ্যুৎ সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, যান বাহন ও যোগা-যোগ বস্তু নির্মাণ ইত্যাদি।

(৩) শিল্প বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের অন্য দেশে পাঠাতে হবে, যাতে তারা নতুন শিল্প সুরু করতে পারে। শিল্পের গবেষণার ব্যাপারে সরকারের অযথা হস্তক্ষেপ নিবারণও করতে হবে।

(৪) স্থায়ী গবেষণা সংস্থা থাকবে।

(৫) জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনার পূর্ব-প্রস্তুতিরূপে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক সন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চালাতে হবে।

বলেছিলেন, ভবিষ্যতে ভারতে রাজনীতি ও বিজ্ঞানকে হাত ধরে চলতে হবে। দেশের নানা প্রয়োজন পূরণের পথ বিজ্ঞান দেখাবে

গবেষণার দ্বারা—সেই গবেষণালব্ধ বিজ্ঞান সিদ্ধিকে রাজনীতিকেরা প্রয়োগ করবেন জন কল্যাণে।

বলেছিলেন, "ভারত ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকার মতই খনিজ সম্পদে পূর্ণ। ভারতের খনিজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। এখন প্রয়োজন জাতির সর্বাধিক স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে ঐ সম্পদের প্রণালী বদ্ধ ও সুসংগঠিত ব্যবহার। পৃথিবীতে যে সকল দেশ অর্থ ও সম্পদশালী হয়েছে—তাদের সকলেই হতে পেরেছে শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা।

কিন্তু তা হলে কি ভারতের চলে?

চলে না।

না চলার ষড়যন্ত্রই সুরু হয়েছিল। কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি নির্বাচন নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাইকম্যাণ্ডের বিরোধ বেঁধে উঠেছে। তাছাড়া প্ল্যানিংয়ের ঘোষিত উদ্দেশ্যের মধ্যে সমাজতন্ত্রের কথা মুছে দেওয়া হয়েছে। কারণ, সমাজতান্ত্রিক সুভাষচন্দ্রের প্ল্যানিং কমিটির কর্তা তখন কমিউনিষ্ট নেহেরু, অথবা কমিউনিজমের সরব সমর্থক। তাছাড়া সুভাষচন্দ্র শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। এবং বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস চেম্বারের সভায় জানিয়েছিলেন, সমাজতন্ত্রের বিষয়ে তিনি সুদৃঢ় মনোভাব পোষণ করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস, স্যার ফিরোজ শেঠনা, স্যার চুনীলাল ভি মেহতা, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী অর্থ মন্ত্রী শ্রী এল. বি. লাথে প্রমুখ বহু বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক।

অতএব দেখা যাচ্ছে, সুভাষ বিতাড়ন পর্ব (সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই ইংরাজদের বিতাড়ন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দলীয় স্বার্থে—ক্ষুদ্র স্বার্থে তা করতে দেওয়া হয়নি। গান্ধীনীতি, গান্ধীবাদের অন্যায় আপোষ তিনি অন্তরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।) সেই সময় থেকেই সুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ কংগ্রেসের মধ্যের

তরুণ দল সুভাষ অনুগামী, (পণ্ডিত নেহেরুবাদে। কারণ, সুভাষ অনুগামী হলে ভারত ভাগ্যবিধাতার গদি তিনি পেতেন না) তাদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। ভারতে সুভাষ সমর্থকদের সংখ্যাও কম নয়। এবং ভারতের বুদ্ধিজীবি মহল প্রায় সর্বাংশে সুভাষ প্রবর্ত্তিত প্ল্যানিংয়ের সমর্থনে ধ্বনি তুলেছিল।

প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হওয়ার পর শিল্পায়নের অধিক গুণগানের পরিবর্তে তিনি স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছেন বারবার। ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে প্ল্যানিং কমিটির অধিবেশন বসার তিন দিন আগে কমিটির সদস্যবৃন্দ ও বিশিষ্ট নেতাদের চা-পান সভায় তিনি বলেছিলেন,—"আমরা এখনো দাস, আগামী সংগ্রামের জন্য তৈরী হওয়াই আমাদের প্রধান কাজ।"

প্যাটেল বলেছিলেন, "আমি কিষাণ হিসাবে বলছি, দেশের উন্নতির চাবিকাঠি আছে ব্যবসায়ী সমাজের হাতে। তারা যদি স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসে তবেই স্বাধীনতা মিলবে।"

বহুৎ আচ্ছা, লৌহমানব সর্দার প্যাটেল!

কংগ্রেসের খাদ্যনীতির, ধর্মরক্ষার অযথা প্রয়াসে ৭ই জুন ১৯৩৯ সালে নারায়ণগঞ্জ ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিক সভায় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন :

"ভারতের সামনে এখন বহু সমস্যা—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক, সেই সঙ্গে পরাধীনতা থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক সমস্যা। দারিদ্র ও বেকারী ভারতের কাছে এখন দুই প্রধান সমস্যা। দারিদ্রের পীড়নে জনগণের মন শুধু সরকারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী নয়, বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সে বিদ্রোহ ভাবাপন্ন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য অপেক্ষা করা যায় না। যাদের অন্ন-বস্ত্র নেই তারা সর্বপ্রথম ওই দুটি জিনিস চায়। সাক্ষাৎ সমস্যার সমাধান করতে হলে বিপ্লব অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতির

আমূল পরিবর্তন ঘটানো দরকার। ভারত যদি একসঙ্গে তার সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে তাহলে সে পৃথিবীর কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।"

নিশ্চই করছে। স্বাধীন ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। পি, এল,—৪৮০-র লেন দেন। শুধু দাও আর দাও। তারই মাঝে সবুজ বিপ্লব। আর ভোটের ক্যানভাসে 'গরিবী হটাও'।

কংগ্রেসের ধনীক তোষণ নীতিতে গরিবী হটবে কোনদিন?

আমলাতন্ত্র নির্ভর শাসন ব্যবস্থায় কি প্রগতিমূলক কাজ সম্ভব?

শিল্পায়নের ব্যাপারে প্রথম থেকেই খড়্গহস্ত ছিলেন গান্ধীজী। সাফ সাফ বলে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর মনের কথা। ভক্তদের দ্বারা বিতাড়িত করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে।

কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু?

চালাক ছেলে তিনি সাতঘাটে জল খেয়ে এক ঘাটে ভেড়ার কায়দাটা তিনি বেশ ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন। প্ল্যানিং নিয়ে খাটা-খাটুনি তিনি করেছিলেন। এবং এও আগে ভাগে বুঝে নিয়েছিলেন, সুভাষচন্দ্রের মত জাতীয় গোঁড়া সমাজতন্ত্রীরা বিদায় নিয়েছে যখন, তখন শিল্পায়ন ধনতান্ত্রিক পথেই হবে। কারণ শিল্পপতি আর ব্যবসাদারের দল রাতারাতি সব গান্ধীভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দু-হাতে দেদার টাকা বিলিয়েছিলেন চরকার কানামাছি খেলাতে। অভিযোগ, আজও নাকি তাঁদের সেই দেদার-হাত-দেদারই আছে। ভোটের সময় তাঁরা মুক্ত কচ্ছ হয়ে, মুক্ত হচ্ছে দেদার-দেদার ভাবে, এদিক ওদিকে ছোঁড়েন। যেদিকে হোক লাগালেই হল। ঘোড়-

দৌড়ের বাজি। সব ঘোড়াতেই একসঙ্গে গ্রুপ করে বাজি ধরা যায়, শুধু সন্দেহ, বাজির টাকাটা উঠলে হয়। এধারে কোন সন্দেহ নেই। টাকা উঠবে না মানে? দেশে জনপ্রিয় সরকার গঠিত হলে টাকা উঠতে কদিন? ফুঃ!

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ডিক্টেটার ছিলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রী সভার অন্তরালে তিনি ডিক্টেটারী চালিয়ে গেছেন। অন্যের ইচ্ছা, ইচ্ছা নয়—যুক্তি অগ্রাহ্য। তিনিই সব, তিনিই একমাত্র।

এ অভিযোগ কতখানি সত্য—কতটা মিথ্যা, তার প্রমাণ তাঁর শাসন সময়। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে ডিক্টেটার হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে এ তাঁর নিজেরই ঘোষণা। ডিক্টেটারী চালিয়েছেন ন্যাশান্যাল প্ল্যানিং কমিটিতে। সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতির পুনর্নির্বাচনে, সুভাষ বিতাড়নকারীদের খোঁয়াড়েই যোগদান করেছিলেন।

হরিবিষ্ণু কামাথ আই, সি, এস থেকে পদত্যাগ করে সুভাষচন্দ্রের কাছে এসেছিলেন, উদ্দেশ্য দেশসেবা। সুভাষচন্দ্র তাঁকে কমিটির সম্পাদক করে দিয়ে দেশসেবার দায়িত্বের রূপ বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কামাথ প্রবল উৎসাহে সুরু করেছিলেন তাঁর কাজ। কিন্তু জঘন্য ষড়যন্ত্রে যখন কংগ্রেসের হাই কম্যাণ্ড লিপ্ত তখন পণ্ডিত নেহেরু সুদ্ধ সকলকে সমালোচনা করতে এতটুকু দ্বিধা করেননি তিনি। ভেবে দেখেননি ফল কি হতে পারে। ফলে হলোও তাই। কমিটির সম্পাদক পদ থেকে কামাথকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করিয়েছিলেন নেহেরু।

আর সুভাষচন্দ্র?

কংগ্রেস নেতৃগণের প্রতিক্রিয়াশীল সংগ্রাম বিমুখ নীতির বিরুদ্ধাচারণের ফলে ভারতীয় কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন কিন্তু কংগ্রেস কর্তাদের শত সহস্র চেষ্টা সত্বেও বাংলা কংগ্রেস থেকে তাঁর আধিপত্য দূর করা সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে।

বাংলা দেশে প্রধান কর্মকেন্দ্র রচনা করার পর জাতীয় পরিকল্পনা

প্রস্তুতির কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন বাংলাকে। আহ্বান জানিয়েছিলেন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের। শিল্পোন্নত বাংলা দেশের শিল্প পরিচালনায় এবং মালিকানায় বাঙ্গালীর কোন স্থান নেই—এই অর্থনৈতিক অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর প্রয়াসে শান্তভাবে সানন্দে উৎসাহ দেখাবার মেজাজ দেশবাসীর ছিল না।

চেয়েছিলেন কৃষির উন্নয়ন। কৃষকের দুর্গতি দূর করতে।

চেয়েছিলেন শুধু বাংলা নয়, সমস্ত ভারতের সাধারণ মানুষের উন্নতি। কিন্তু তাঁর মতবাদ, কি কংগ্রেস—কি কমিউনিষ্ট, কাউকেই খুশি করতে পারেনি, তাঁর দৃষ্টিতে আগে মানুষ। দলমতের উর্দ্ধে মানুষের স্থান।

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই তিনি করেছেন।

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি?

গণতন্ত্র কি প্রকৃত গণতন্ত্রের রূপ নিয়েছে?

না, নেয়নি।

কিন্তু কেন? কেন মানুষ পেলনা তার অধিকার?

কাদের নির্লজ্জ বেসাতি, ক্ষমতা লোলুপতা, স্বার্থপরতা বাঁচার অধিকারে অন্তরায় সৃষ্টি করলো?

কেন আজ ভোট ভিক্ষার শ্লোগান তুলতে হয়, 'গরিবী হঠাও'?

কেন—কেন—কেন?

পৃথিবীতে যে দেশ শিল্প বিজ্ঞানে যত বেশি উন্নত, বিদেশে তার তত বেশি খ্যাতি ও খাতির; অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা তার তত বেশি। অবশ্য এসব রাষ্ট্রের মধ্যেও দুটো শ্রেণীভেদ রয়েছে; একটি স্বার্থপর, উগ্রত্ব আত্মসাৎকারী, অন্যটি প্রশান্ত ও কল্যাণ ধর্মী।

ভারত তার পরিবেশ ও ঐতিহ্য অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ১৯৪৯ সালে রচিত ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় আদর্শে, ভারত কল্যাণ রাষ্ট্ররূপে (Welfare state) ঘোষিত। সর্বজনের হিতে এর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড উৎকৃষ্ট। বিশ্বকল্যাণ যোগ্যতার চূড়ান্ত লক্ষ্য (আহা।!)। পৃথিবীর তাবৎ গণতন্ত্রী দেশের সার সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ভিত গড়ে তোলা হয়েছে (শাসন ব্যবস্থায় কালা কানুন, নির্বিচারে বন্দী করে রাখা, আটক আইন—প্রশাসন ব্যবস্থায় যাবতীয় দুষ্কর্ম সমেত)। •কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত নেই। সমাজবাদী আদর্শের স্বীকৃতি দিয়েছে। সূচনা হয়েছে রাষ্ট্রীক আদর্শের রূপান্তর। ১৯৫৫ সালে ২১—২৩শে জানুয়ারী আবাদী (মাদ্রাজ) কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রী ধাঁচের সমাজ বিন্যাস রচনার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এটি সমাজবাদী নয়, সাম্যবাদীও নয়, আবার ঠিক গণতন্ত্র সম্মতও নয়; মধ্যপন্থা-আপোষ রফা।

রাষ্ট্র নায়কগণ বহুবার বহুস্থানে সরবে মধ্যপন্থার গুণগান করেছেন। এমন কি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলও কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে এই মাঝ পথে চলার প্রবৃত্তি উচ্চকিত। বহুবার বলেছেন, ভারত কারো পদাঙ্ক অনুসারী নয়, কারো পতাকা-বাহীও নয়। ভারত—ভারতই।

শিল্পায়নে ভারতের নীতি: ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজিবাদ বরবাদ করা হবে না; বরং বিদেশী পুঁজি বেশি পরিমাণে আমদানী

করে দেশে আরো ধনাগমের পথ সুগম করতে হবে, পাঁচশালা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে তার সদ্ব্যায় করতে হবে। কাজেই সরকারী বেসরকারী দুটো কর্মোদ্যোগের ধারা পাশাপাশি চলেছে (ফলাফল অবশ্য প্রকাশ্য)।

১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল গৃহীত সরকারী শিল্পনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবে মাত্র ৯টি শিল্প ও জাতীয় সংস্থা পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও উদ্যোগ স্বীকৃতি লাভ করে। সাত বছর পরে ১৯৫৪ সালে সংসদে ভারতের সামাজিক ও বৈষয়িক আদর্শ রূপায়ণে সমাজতন্ত্রী ধাঁচের সমাজ সংগঠনের নীতি গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালের ১লা মে সংসদে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সংশোধিত শিল্পনীতি ঘোষণা করেন।

ভারত সরকারের শিল্পনীতি প্রস্তাবটিও পণ্ডিতজীর ঘোষণা :

"শিল্পক্ষেত্রে ভারত সরকার যে নীতি অনুসরণ করতে চান, তাঁদের ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিলের প্রস্তাবে তা ঘোষণা করা হয়েছিল। যে অর্থনীতির ফলে শিল্পনীতি অবিরাম বৃদ্ধি পাচ্ছে তার উপরও সম্পদের সমবণ্টনের উপর উক্ত প্রস্তাবে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয় যে, শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে সরকার ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ এবং আণবিক শক্তি ও রেলওয়ে যানবাহন (এই সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকবে) ছাড়াও ছটি মূল শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সংস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে। অবশ্য জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হলে ক্ষেত্র বিশেষে বেসরকারী প্রচেষ্টার সহায়তা গ্রহণ করা হবে। বাকী শিল্পগুলি বেসরকারী উদ্যোগের নিকট উন্মুক্ত থাকবে বটে, তবে সে সকল ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ক্রমশই বেশি করে অংশ গ্রহণ করবে।"

"ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকায় গ্রহণ করা হয়েছে যে, দেশের

প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।"

"সরকারের রাষ্ট্রনীতি পরিচালন সম্পর্কিত নির্দেশাবলীতে বলা হয়েছে যে, সরকার জনগণের মঙ্গল বিধানের জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবেন। এজন্য এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে জনসাধারণ সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার লাভ করবে। অধিকন্তু নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি সরকারকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে :—

(১) দেশের প্রত্যেক নাগরিকের, নারী পুরুষ সমভাবে—যথোপযুক্ত ভাবে জীবিকা অর্জনের অধিকার আছে।

(২) দেশের সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে সাধারণ লোকে যথাসম্ভব বেশি উপকৃত হয়।

(৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেন এমনভাবে পরিচালিত না হয় যার পরিনামে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে এবং উৎপাদনের উপায় গণস্বার্থবিরোধী হয়ে উঠবে।

(৪) নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই ধরণের কাজের বেতন যেন একই প্রকার হয়।

(৫) নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যের যেন অপব্যবহার না হয় এবং আর্থিক দুরবস্থার জন্য নাগরিকরা যেন এমন কিছু করতে বাধ্য না হয় যা তাদের বয়স বা সামর্থের পরিপন্থী—এবং

(৬) শিশু ও যুবকদের যেন শোষণ এবং নৈতিক ও বাস্তব অধোগতি থেকে রক্ষা করা হয়।

উদ্দেশ্য যে মহৎ সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহের অবকাশ

নেই। কিন্তু বিনীত নিবেদন এই যে, কর্তব্য কতটুকু পালন করা হয়েছে? পালন করা হল না কেন? কোন্ স্বার্থ এবং উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে ভাল ভাল নীতিকথাগুলো শিকেয় তোলা রইলো? দায়ী কারা?

সরকারী উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বেসরকারী উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত (হিসাব পরে দেওয়ার চেষ্টা করছি)। এর কারণ কি? কেন দিনের পর দিন সরকারের নামে জনসাধারণের পয়সা ফুটকড়াই করা হয়েছে? কোথায় গলদ? মূলে কারা?

অবশ্য সরকারী উদ্যোগের সামান্যতম ব্যর্থতার নমুনা, পশ্চিম-বঙ্গের সরকারী পরিবহনের ঘণ্টার দড়ি কেনার জন্যে যদি বেশ কয়েক হাজার টাকা লাগে তাহলে লাভটা হবে কেমন করে? হরিণঘাটার দুধের ডিপোয় দিনে কয়েক হাজার বোতল ভাঙলে কি আর লাভ হয়?

অথবা সরকারের রেলওয়ের ব্যবসায় একদিনের মোটা লাভ আজ পিঁপড়েতে খেয়ে নিচ্ছে।

কিন্তু কেন?

অভিযোগ অসংখ্য। কর্মীদের জন্যেই নাকি এমন হচ্ছে। কাজ নয়, পার্টিবাজি করা তার একটা কারণ। কর্মীরা নাকি ভাবেন, এ তাঁদের ঘরের কাজ নয়। ফাটছে-ফুটছে সরকারের। কিন্তু সরকার কাদের? জাতীয় সরকারের লাভ লোকসান নাকি সমগ্র জাতির ওপর বর্তায়। তাহলে কেন তাঁরা কাজে অবহেলা করেন? সরকার বিরোধী এই যে মনোভাব, এর কারণ কি? শুধুমাত্র বামপন্থী দলগুলির মন্ত্রণাই কি দায়ী? জনগণের সরকার বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির এটাই কি একমাত্র কারণ? কারণ কি, সরকারী উদ্যোগে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করে দু-পাঁচ হাজারী পরিচালক বাড়ানো?

ভারতের স্বরাষ্ট্রনীতি একটা বিশিষ্ট রীতি ও নীতির অনুগামী।

অনেক সহৃদয় সমালোচক যাকে জাতীয় প্রতিভার ধারানুযায়ী বলে মনে করেন। আর পররাষ্ট্র নীতিও একে কেন্দ্র করে বৃত্তায়িত। অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি পরস্পর সম্পৃক্ত। যেন বিহঙ্গের দুটো ডানা (আহা !)। একের বল অন্যের বল (তাই কি ?), একের শক্তিক্ষয়ে অন্যের শক্তিনাশ। আবার ঘর হলো শক্তির মূলাধার, বাইরের বহুমুখী বিচিত্র কর্মধারা তারই বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। যদি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির শতমুখী বিস্থার হয়ে থাকে, তার বিচ্ছ-শিখা বিশ্ব-গগন আলোকিত করার উপযোগিতা লাভ করে থাকে, তবে স্বরাষ্ট্র নীতির সফলতায় (জননায়ক মারাঠা বীর জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা শিবাজীর দেশের বীর পুঙ্গব মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত ওয়াই, বি, চবনের হুঙ্কারধ্বনি স্মরণীয়—পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্টের সময়কালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চবনের 'গেল গেল' রব—তার প্রতিকার বাঙালী নিশ্চই ভোলেন নি ?) তার মূল উৎস নিহিত এবং পণ্ডিত নেহেরুর পররাষ্ট্র নীতিই এ হেন সম্মান ভারতকে এনে দিয়েছে।

বর্তমানের পররাষ্ট্র নীতি সর্দার শরণ সিংয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত। পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে মধ্যমণি তিনি। জঙ্গী ইয়াহিয়ার আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে সাংবাদিক অপহরণেও নীরব থাকেন। কিন্তু কেন ? পররাষ্ট্র দপ্তরের নীরবতায় কালহরণের কারণ কি ? কোন অদৃশ্য আদেশের অপেক্ষা করা ?

১৯৩৯ সালের ১০ই থেকে ১২ই মার্চ কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনে ভাবী ভারতের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পণ্ডিত নেহেরু। বলেন :

The congress records its entire disapproval of British foreign policy culminating in the Munich Pact, the Anglo-Indian agreement and the recognition of Rebelspain. This policy has been one of deliberate betrayal of democracy, related breach of

pledges, the ending of the system of collective security and cooperation with Govts., which are avowed enemies of democracy and freedom. As a result of this policy, the world is being reduced to a state of International anarchy where brutal violence triumphs and flourishes unchecked and in the name of peace stupendous preparations are being made for rhe most terrible of wars. International morality has sunk so low in central and south-west Europe that the world has witnessed with horror the organised terrorism of the Nazi Govt. against people of jewish race and the continuous bombing from the air by rebel forces of cities and civilian inhabitants and helpless refugees.

The congress dissociates entirely from the British foreign policy which has consistently aided the fascist powers and helped in the destruction of democratic countries. The congress is opposed to imperialism and foscism alike and is convinced that world people and progress required the ending of both of these. In the opinion of the congress, it is urgently necessary for India to direct her own freign policy as an independent nation, thereby keeping aloof from both imperialism and fascism and pursuing her path of peace and freedom.

"—কংগ্রেসের মতে স্বাধীন জাতিরূপে নিজস্ব পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করাই ভারতের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এইভাবেই সে

সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ হতে দূরে থেকে শান্তি ও স্বাধীনতার পথ অনুসরণ করতে পারবে।"

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা থেকে প্রতি বছর দেশের শিল্পগুলির নানারূপ তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করা হয়। ১৯৫৯ সাল থেকে এই ব্যবস্থার আরম্ভ। কিন্তু এইসব তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রকাশে এত বেশি কালহরণ করা হয় যে বর্তমানের সঠিক হিসাব অনুমানের ওপরই ছেড়ে দিতে হয়। কারণ এখন ১৯৬৬ সালের হিসাব প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৫৯-১৯৬৬ সালের আট বছরে শিল্পবিকাশের ধরণ-ধারণ কেমন তা সরকারী হিসাবেই পাওয়া যাচ্ছে। এবং এই আট বছরকে তিনটি কালে ভাগ করলে পাঁচ বছর নেহেরুর প্রধান মন্ত্রীত্বের কাল, দুবছর লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও ইন্দিরা গান্ধীর।

১৯৬৬ সালের পর থেকেই দেশে অর্থনৈতিক মন্দা সুরু হয় এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকেও ছুটি দেওয়া হয়। অবশ্য ১৯৬৯ সালে আবার হাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ওপর নির্ভর করে এবং দেশের পুঁজিপতি ও জমিদার জোতদারদের স্বার্থে যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের রাস্তা গ্রহণ করে, আট বছর তার স্বর্ণযুগের শেষ কাল।

১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত দেশের অর্থনীতিতে ও শিল্পোৎপাদনে প্রাধান্য ছিল ছোট শিল্পের। তখন পর্যন্ত শিল্পে লগ্নীকরা উৎপাদনশীল পুঁজির শতকরা ৬০ ভাগই ছিল ছোট শিল্পের। বড় আয়তনের শিল্প ছিল অল্প কয়েকটি এবং তাদের মধ্যে প্রধান ছিল কাপড়ের কল শিল্প। তারপর থেকেই দ্রুতগতিতে বড় শিল্পের বিকাশ আরম্ভ হয়।

কারখানা আইন, যে সব কারখানায় খাটে, সে সব কল কারখানার তথ্যই কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের এই বাৎসরিক শিল্প সমীক্ষায় গ্রহণ করা হয়। এই কারখানাগুলো দু রকমের। ১০ জন অথবা তার বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে যে সব কারখানায় বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করা হয়, এবং ২০ জন বা তার বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে যে সব কারখানা বিদ্যুৎতের সাহায্য না নিয়ে উৎপাদন চালায়। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী কারখানাগুলোই হল বড় কারখানা ও বড় শিল্পের অন্তর্গত। আর বিদ্যুতের ব্যবহার যে সব কারখানায় নেই সেগুলো ছোট কারখানা ও ছোট শিল্পের অন্তর্গত।

সরকারী সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, বর্তমানের বড় আয়তনের কারখানাগুলোই দেশের শিল্পগত অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৫ সালে দেশে শিল্পে লগ্নী করা মোট স্থির পুঁজির (অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) শতকরা ৯৬ ভাগ এবং মোট উৎপাদনশীল পুঁজির শতকরা ৮৮ ভাগই এইসব বড় বড় কারখানায় লগ্নী করা ছিল। এদের নিয়েই দেশের বড় আয়তনের শিল্প। দেশে শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের শতকরা ৮৫ ভাগই এইসব বড় বড় কারখানায় কাজ করতো এবং মোট শিল্পের উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগই এই সব বড় বড় কারখানায় উৎপাদন হতো।

১৯৬৬ সালে দেশে এই রকম বড় কল কারখানার সংখ্যা ১২, ৩০০ আর ছোট ৩০০০০০-এর বেশি। কিন্তু লগ্নী করা পুঁজি, শ্রমিক নিয়োগ, উৎপাদন ইত্যাদি ছোট কারখানাগুলোর অংশ অনেক কমে গেছে ও কমছে।

১২,৩০০ বড় বড় কারখানায় ৭৫৪৮ কোটি টাকার পরিমাণ উৎপাদনশীল পুঁজি লগ্নী করা হয়েছে। বড় কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীর মোট সংখ্যা হল ৩৯ লক্ষ। ১৯৬৬ সালে তৈরি জিনিসের মোট মূল্য ছিল ৭,২১৩ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬৬ সালের মধ্যে এইসব বড় আয়তনের কারখানার সংখ্যা প্রতিবছর গড়ে

বেড়েছে মাত্র ৬.২ ভাগ, কিন্তু লগ্নী করা পুঁজির পরিমাণ বেড়েছে প্রতিবছর গড়ে ৪৮ ভাগ করে—সে তুলনায় উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ২৭ ভাগ হারে। সাতবছরে—প্রতিবছর বড় বড় কারখানা-গুলোতে শতকরা ৪৮ ভাগ হারে পুঁজি লগ্নীর পরিমাণ বেড়েছে, (পুঁজি গঠন হয়েছে) কিন্তু লোক নিয়োগ বেড়েছে বছরে শতকরা ৫.৩ ভাগ হারে মাত্র। ফলে দেখা যায় যে, এই সাত বছরে দেশের মোট বড় আয়তনের কারখানাগুলোতে প্রতি বছর শতকরা ৫.৩ ভাগ হারে লোক নিয়োগ বাড়লেও, প্রতিবছর কারখানা পিছু লোক নিয়োগ কমেছে শতকরা ২.১ ভাগ করে। হিসাবে দেখা যায়, কল-কারখানাগুলোর প্রত্যেকটিতে বছরে শতকরা ২৭ ভাগ করে উৎপাদনশীল পুঁজির লগ্নী বাড়লে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি কারখানায় প্রতি বছর লোক নিয়োগ কমেছে শতকরা ২ ভাগ।

দেখা যায় ১৯৫৯-৬৬ সালের মধ্যে কারখানাগুলোতে মাথাপিছু লগ্নী করা উৎপাদনশীল পুঁজির পরিমাণ ৬০০০ টাকা থেকে তিন গুণেরও বেশি বেড়ে ১৯০০০ টাকা হয়েছে, আর সেই সঙ্গে এক-একজন শ্রমিক বছরে যে পরিমাণ জিনিস পত্র উৎপাদন করেছে তার পরিমাণও ২৬৪৫ টাকা থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৪৬০০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ফলে শুধু দিনের পর দিন পুঁজিই বেড়ে চলেছে। বেকারদের কর্ম-সংস্থান দূরের কথা, ছাঁটাই চলেছে। আর ছোট কারখানাগুলো কাঁচা মালের অভাবে পরপারের উদ্দেশে যাত্রা করেছে—নয়তো করবো করবো করছে।

ম্যানেজিং এজেন্সি।

ভারতবর্ষের ব্যবসা ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সির বসবাস প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি। শোনা যায় পৃথিবীর কোন দেশেই

নাকি এই সুপ্রথাটির অস্তিত্ব নেই। ভারত-শোষণে ইংরেজ এই প্রথাটির জনক। আজ তাদের সঙ্গে মিলেমিশে দেশী ব্যবসায়ীর দলও জনকত্বের গৌরব অর্জন করেছে।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজ এদেশে এসে যখন কলকারখানা স্থাপন করে তখনই এই প্রথাটি আবিস্কার করে ফেলে। কারণ মূলধনের প্রথম টাকাটা তাদেরই গাঁটের কড়ি থেকে খরচ করতে হয়—অবশ্য আরম্ভের প্রথম দিকে। তারপর বাজারে শেয়ার কিনে ভারতীয়দের থেকে টাকাটা তুলে নিত। কিন্তু লাভের গুড় পাছে নেটিভদের দিতে হয় বা কোম্পানী পরিচালনার ক্ষমতা হস্তচ্যুত না হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখেই ম্যানেজিং এজেন্সি উদ্ভাবন এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যেত তাদের টাকার তুলনায় বাইরের লোকের টাকাই বেশি। কিন্তু প্রথম টাকাটা তারা দেওয়ায় প্রথম শেয়ার হোল্ডাররা হোত তাদেব হাতের লোক এবং এদের সঙ্গে প্রথমেই এই মর্মে একটা চুক্তিনামা করে দেওয়া হতো, যে কোম্পানীর অস্তিত্ব যতদিন বজায় থাকবে ততদিন ম্যানেজিং এজেন্সি কর্তৃক কোম্পানী পরিচালনার ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকবে। ম্যানেজিং এজেণ্ট পরিচালিত কোম্পানীতে ডিরেক্টর বোর্ড একটা থাকবেই, কারণ সেটা লিমিটেড কোম্পানী, এবং ডিরেক্টররা সকলেই হাতের লোক। কোম্পানী পরিচালনে এদের কোন স্বাধীন মতামত খাটে না, কারণ ম্যানেজিং এজেন্সির চুক্তি মেনে এদের চলতে হয়।

ব্রিটেন ও আমেরিকার নিয়ম এই যে, যারা কোম্পানী আরম্ভ করে, কারবার চালু হাওয়ার পর তারা তা শেয়ার হোল্ডারদের হাতে তুলে দেয়, নিজেদের শেয়ার রাখতে চাইলে সারাজীবন অংশীদার রূপে থেকে যায় অথবা একটা কমিশন নিয়ে সরে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে ম্যানেজিং এজেণ্টরা সরে যেতে জানেন না। অবশ্য যতদিন না কোম্পানী লালবাতি জ্বালে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় চার লক্ষ কাঁচা মাল সরবরাহকারী, অনেক সময় নায্য দাম পায়না,

ক্রেতাদের বেশি দাম দিতে হয়, শেয়ার হোল্ডাররা লভ্যাংশ পায় না, এবং গভর্ণমেন্টের ট্যাক্স ফাঁকি পড়ে।

ম্যানেজিং এজেন্টদের মোট শেয়ারের এক চতুর্থাংশের বেশি হাতে রাখতে হয় না। বাকি শেয়ার দেশের চতুর্দিকে ছড়ানো থাকে। কোম্পানীর বার্ষিক সভায় শেয়ার হোল্ডাররা আসে না বললেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ স্থানীয় শেয়ার হাতে থাকলেই ম্যানেজিং এজেন্টের হাত শক্ত।

আর আয়ের পথ?

ম্যানেজিং এজেন্টের আয়ের উপায় একটা নয়, অসংখ্য। কোম্পানীর লাভ না হলে শেয়ার হোল্ডাররা একটা পয়সাও পায় না কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্টের আয় কে বন্ধ করে? ম্যানেজিং এজেন্টের আসল আয় তো কোম্পানীর ব্যয়—লাভ লোকসানে বড় বয়েই গেল। তারপরও যদি লাভ হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা—হুঁহুও খায় আবার তামুকও খায়। তখন লাভের ওপর কমিশন ও তার শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ আদায় করে।

তার উপায়ের কটা রাস্তা, যথা :—কারখানার কাঁচা মাল কিনতে কমিশন, মাল বিক্রী করতে কমিশন, যন্ত্রপাতি আমদানীতে কমিশন, ব্যাঙ্কে টাকা ধার করে তার গ্যারান্টি দিতে কমিশন ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি……

এছাড়া ম্যানেজিং এজেন্টের অফিসের খরচ বাবদ একটা মোট থোক টাকা, কোম্পানী পরিচালনায় ম্যানেজিং এজেন্ট যে কি কঠোর পরিশ্রম করছেন তার জন্যে একটা মোটা টাকা আদায় হয়। কোম্পানীর লাভ হোক, লোকসান হোক তার বড় ঘণ্টাটা—এ টাকাগুলো আদায় হবেই এবং এগুলো সোজা রাস্তায় আদায়।

চোরা পথে কত রাস্তা, একমাত্র ভগবানই জানেন আর জানেন ম্যানেজিং এজেন্ট। কোম্পানীর হিসাবের খাতা ম্যানেজিং এজেন্টের কাছে। ম্যানেজিং এজেন্ট বৃটেন, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড থেকে

হাওয়া খেয়ে খাতায় ইনটু বিনটু করা হল, কোম্পানীর কাজে বিদেশ গমন। এ ছাড়া এক কোম্পানীর গাড়ি এক কোম্পানীর ড্রাইভার, এক কোম্পানীর পেট্রোল—এভাবে ম্যানেজিং এজেন্ট বছর বছর নতুন নতুন গাড়ি চড়তে পারে।

আর বাড়ি?

বাড়ি নয়, প্রাসাদ। তাতেও আটকায় না। কোম্পানীর খাতায় কারখানা সম্প্রসারণেব কলমটা আছে কি করতে? শুধু আঁচড় কেটে দিলেই হলো।

কোম্পানীর নামের লক্ষ লক্ষ টাকা ম্যানেজিং এজেন্টরা বেনামে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া এক কোম্পানীর টাকা অন্য লালবাতী জ্বলা কোম্পানীতে চালানো?

সাবসিডিয়ারি কোম্পানী গঠন কোম্পানীর টাকা মারার আর একটা সোজা পথ।

ম্যানেজিং এজেন্সিগুলো অনেক সময় লিমিটেড কোম্পানী রূপে পরিচয় দেয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওগুলো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। প্রধানতঃ একটা শ্রেষ্ঠ পরিবার বাইরের কটা অনুগত লোক নিয়ে ওগুলো গঠন করে থাকে।

এতদিন ভারতের বৃহত্তম প্রায় সব কোম্পানীই ম্যানেজিং এজেন্সির অধীনে ছিল। এখন আইন বলে তা উঠে যাচ্ছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ব্যবস্থাটা একই থাকছে—শুধু নাম পরিবর্তন।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ-ভারতীয় যে সব ম্যানেজিং এজেন্সী ভারতের শিল্পজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতো:—

বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি	পরিচালিত কোম্পানীর সংখ্যা
ডানকান ব্রাদার্স	৫৮
গিলাণ্ডার্স	৭০
এণ্ড্রু ইউল	৭৮
বার্ড	৪২

অক্টেভিয়াস ষ্টীল	৫৭
মেকিনন ম্যাকেঞ্জি	১১
ব্যারি	১৪
হিলজার্স	১৩
গোভাস ব্রাদার্স	১৪
কিলবার্ণ	৩০
বামার লরি	২৯
ম্যাকলিন	৪১
মার্টিন বার্ণ	৪০
শাওয়ালেস	৩৭
ম্যাকলিয়ড	৩৯
জার্ডিন হেণ্ডারসন	২৬
বেগ ডাললজ	২৫
কিলিক নিক্সন	১৭
	৬৪১

চট, কাপড়, কয়লা, চিনি, কেমিকেল, লোহা, চা, জাহাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, কাগজ প্রভৃতির সমস্ত বড় কল কারখানা এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখনও সংখ্যায় কমলেও আছে।

ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সি (১৯৪৭)	কোম্পানীর সংখ্যা
ডালমিঞা জৈন	১৯
বালচাঁদ হীরাচাঁদ	১৩
বিড়লা	৬১
টাটা	২৫
যুগীলাল কমলাপত (জে. কে.)	৪০
করমচাঁদ থাপ্পড়	২৩
	১৮১

অধীনে চট, কাপড়, চিনি, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিমেণ্ট, কাগজ, কেমিকেল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব রকম প্রধান শিল্প আছে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এঁদের বাড় বাড়ন্ত হয়েছে।

কারণ, ভারতের অর্থনৈতিক ভাগ্য বিধাতারাই তো বহু পরিমাণে রাজনৈতিক ভাগ্য বিধাতা। ম্যানেজিং এজেণ্টরা সবগুণের গুণনিধি। এঁদের সম্পর্কে অভিযোগ নানান। বিদেশে রপ্তানী কৃত চটের থলে নাকি এঁরা বেশি দামে বিক্রী করে কম হিসাব দেখাতেন। টাকা লেন-দেনের অসুবিধা কি, ব্যাঙ্কগুলো সব নিজেদের খাসে ছিল না? এবং অভিযোগ বহুজনের, বিদেশের ব্যাঙ্কে বহু টাকা জমা আছে।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় করণের ফলে অতীতের ইংরাজ আমলের কু-সুখ্যাত কালেক্টর সাহেব মোরারজী ভাই এবং তাঁর বন্ধু বান্ধবের গোঁসাটা নাকি একটু অধিক পরিমাণে হয়েছিল? হবারই তো কথা। কি সুন্দর ভাবে তিনি গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে দেশ সেবা করেছেন! অর্থ মন্ত্রী হয়ে সাধারণ মানুষ আর গরীবের হাড়ে দুর্বো গজিয়ে দিয়েছেন। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন করে সোনার চোরা কারবারের পথ সহজ করে দিয়েছিলেন। গরীব কারিগর গুলোকে না খাইয়ে মেরেছেন—কেউবা খিদের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর পর ভারতের ভাগ্য বিধাতা হওয়ার জন্যে কি সলজ্জ রেসারেসি। আবার একদিন নীতি বজায় রাখতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ!

শুধুমাত্র মোরারজী দেশাই নয়, পালের গোদা বড় বড় কংগ্রেসীদের মধ্যে সৎ-এর সংখ্যা কজন? সাম্প্রদায়িকতা, ভেদনীতি, প্রাদেশিকতা এদের মজ্জায় মজ্জায়। মোরারজীর ছেলে সামান্য চাকর থেকে এখন বড় ব্যবসায়ী হয়েছে। কিন্তু বেশি সংখ্যায় অন্যান্য মন্ত্রী, সদস্য আর কর্মীর দল? দেশ স্বাধীন হবার আগে যাদের কিছু ছিলনা, যাদের অবস্থা ছিল অতি সাধারণ, আজ মাত্র

কয়েক বছরে বাড়ি ড় ব্যাঙ্কে টাকা কোথা থেকে এলো? কি ভাবে তারা অবস্থা ফেরালো? তদন্ত করলে সবই বেরোয়—কিন্তু করবে কে? নীতির চেয়ে দলীয় সংহতি রক্ষা করাই যেখানে আসল সেখানে মানুষ কি আশা করতে পারে?

গত ১৯৬৮ সালে বাংলা দেশে বেশ কয়েকশো কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ হওয়ার কারণ, কাজের অভাব। সরকারী মহল থেকে প্রচার করা হয়েছিল দেশে মন্দা এসেছে। কিন্তু মন্দাটা কি শুধুমাত্র বাংলা দেশের জন্যে? এবং এই মন্দার একমাত্র কারণ নাকি চাহিদার অভাব। অথচ এই মন্দার বাজারেই মোরারজীর সাতাম টাকা বেতনের পুত্র রাতারাতি বেশ কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়েছে। বিড়লারা মাত্র এক বছরে তাদের সম্পত্তি ৪৬ শতাংশ বাড়িয়ে ফেলেছে।

১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রণ্টের আট মাসের শাসন কালে ঘেরাও ও শ্রমিক বিক্ষোভের ফলে নাকি হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছিল, হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে দেখা যায় যে যুক্তফ্রণ্টের আট-মাসের শাসনকালে যত লোক বেকার হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি লোক চাকরী হারিয়েছিল তার আগের বছর প্রফুল্ল চন্দ্রের রাজত্বকালে। অথচ প্রচার, ঘেরাওয়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

আসলে বাংলা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অধোগতির জন্যে একমাত্র দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাত মূলক নীতি। বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের সর্বনাশ সুরু হয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনার সময় থেকে। বাংলা দেশ তথা পূর্বাঞ্চলের সর্বনাশ সাধন করে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটকে রাতারাতি ফাঁপিয়ে তোলার চক্রান্ত। প্রচারিত মন্দার বাজারে গুজরাট এবং মহারষ্ট্রে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাফে লাফে বেড়েছে—আর পূর্বাঞ্চলের ঘরে ঘরে বেকারদের হাহাকার। বাংলার

সর্বনাশের মধ্য দিয়ে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মাদ্রাজ আর পাঞ্জাব সুদিনের মুখ দেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি অনেকখানি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প নির্ভর। এই শিল্পকে ধ্বংস করার জন্যেই মন্দার চক্রান্ত। কারণ ইংরেজের আমল থেকেই বাংলার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প দিনের পর দিনে বেড়ে ওঠে। ইংরেজ বণিকরা এদেশে ওই শিল্পের পত্তন করে তাদের মূলধনের সদর দপ্তর রেখেছিল এখানেই ; তাছাড়া গোড়ায় প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, ইস্পাত, কয়লা, বিদ্যুৎশক্তি এখানে যত সহজ লভ্য ছিল, অন্যত্র ছিল না। তাছাড়া চাহিদাও ছিল এখানে বেশি। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাংলা দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সম্প্রসারণ ও স্বাধীনতার পর প্রথম দুই পাঁচশালায় দস্তুরমত সমৃদ্ধি ঘটায়।

এ রাজ্যের বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলোর মালিক সর্বভারতীয় পুঁজিপতিরা। ছোট ছোট কারখনার মালিক স্থানীয় অধিবাসীরা। বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বাড় বাড়ন্ত দেখে অন্যান্য প্রদেশের বণিকেরা ককিয়ে উঠলো। তাদের সেবাদাসের দল কংগ্রেসী নেতারা প্রভুদের দুঃখ মোচনার্থে ভারত সরকার মারফৎ আমদানী হ্রাসের ছুতোয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রয়োজনীয় বিদেশ থেকে আমদানীকৃত তামা, সীসা, টিন, দস্তা (আমাদের দেশে লৌহ ধাতুর একান্ত অভাব) একেবারে কমিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়ত বণ্টনের যে নীতি গ্রহণ করলেন তা এক কথায় বলতে গেলে অতীব চমৎকার। ঠিক হল, প্রত্যেক রাজ্য তার লোক সংখ্যার অনুপাতে এই দ্রব্যগুলির ভাগ পাবে। সিংহ ভাগ মেরে দিল মহারাষ্ট্র-উত্তরপ্রদেশ। বলার কিছু নেই, লোক সংখ্যা তার বাংলার থেকে অনেক বেশি। অথচ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলতে উত্তরপ্রদেশে বিশেষ কিছু নেই, মহারাষ্ট্রে সম্প্রতিকালের ঘটনা। বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সমৃদ্ধ—তার চাহিদা প্রচুর, কিন্তু দিচ্ছে কে?

অতএব দরোজা বন্ধ করো। আর অন্যদিকে মহারাষ্ট্র-উত্তরপ্রদেশে কোটা কিছুটা কাজে লাগিয়ে সরল পথে বেশি দামে বেচে সেই টাকায় অন্য ব্যবসায় লক্ষীলাভের চেষ্টা। এই হচ্ছে মন্দার কারণ (শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের রাজত্বকাল থেকেই এই শিল্প শ্লথ হতে সুরু করে)।

বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কাঁচা মালের অভাব ঘটতে সুরু করেছে ১৯৬০ সাল থেকে। এবং চরম আকার ধারণ করে বিগত যুক্তফ্রন্টের সময়। এই রাজ্যে তার (wire) উৎপাদন ক্ষমতা যখন বার্ষিক ৫৪০০ টন, তখন তার (wire) উৎপন্ন হয়েছে মাত্র ২৮৯১ টন। যেখানে কাঁচা মালের চাহিদা ছিল ৫৭০৮ টন, সেখানে নিরপেক্ষ (?) কেন্দ্রীয় সরকার সরবরাহ করেছে ২৯৪৮ টন। নাট-বলটু উৎপাদনী ক্ষমতা যখন ছিল ৬৩৬৫ টন, সেখানে উৎপন্ন হয়েছে (অবশ্যই কাঁচা মালের অভাবে) ৩১৪২ টন। এক্ষেত্রেও কাঁচা-মালের চাহিদা ছিল ৭৩২১ টন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে ৩৭৩০ টন। সমগ্রভাবে ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলো তাদের উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৪১ শতাংশ কাজে লাগাতে পেরেছে। তাও আবার একটি শিফ্‌টের (shift) ভিত্তিতে।

তৃতীয় পাঁচশালা যত এগুতে থাকে ততই বাংলার ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলো বেশি করে মার খেতে থাকে (অথবা মার দেওয়া হতে থাকে—কারণ ওগুলি স্থানীয় স্বধিবাসীদের যে)। বৃহৎ শিল্পগুলো (সর্বভারতীয় বণিকদের) তাদের চাহিদার ৮০ শতাংশ সরবরাহ লাভ করলেও ক্ষুদ্র শিল্পগুলো ৩০ শতাংশের বেশি পায়নি। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাডহক বরাদ্দ (কাঁচামাল) ব্যবস্থায় কাঁচা মালের দুষ্প্রাপ্যতা সকল রাজ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে না দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়েই পুরোটা চাপিয়ে দিয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে ক্ষুদ্র কাঁচামাল হিসাবে তামার যে চাহিদা ছিল, তার মাত্র ৯.২২ শতাংশ দেওয়া হয়েছে। আর মহারাষ্ট্র পেয়েছে ১৪.৪৮

শতাংশ, পাঞ্জাব ১৪'১১ শতাংশ, গুজরাট মাত্র ৭২'৯৭ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ তামা ব্যবহারকারী ধাতব-শিল্প আয়তনে বৃহত্তম হলেও তামা সরবরাহের ক্ষেত্রে তাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে চতুর্দশ স্থানে। এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীর মধ্যে ৪৯'৩৭ শতাংশই ধাতব শিল্পে নিযুক্ত। অপর দিকে মহারাষ্ট্রে ২৯'২৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পের, যার ১০০ টন মাল তৈরীর ক্ষমতা আছে, তাকে ১০ টন মাল তৈরি করে কারখানা বন্ধ রাখতে হয়। কিন্তু কারখানা চালু রাখার খরচ চালাতে গিয়ে উৎপন্ন পণ্যের দাম না বাড়িয়ে উপায় থাকে না। ফলে সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতা থেকে পেছু হঠতে হয়।

মন্দাটা পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে এবং ছোট শিল্পে। ১৯৬৮ সালে মন্দার বাজারে টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড লোকো মোটিভস কোম্পানী বছরের প্রথম সাত মাসে টাটা মার্সিডেস বেন্‌জ্ মোটর গাড়ি বিক্রী আগের বছরের তুলনায় ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রাক চেসিসের বিক্রী বেড়েছে ১০৪ শতাংশ। প্রিমিয়ার অটোমোবাইল কোম্পানি চার মাসে ১২১১টি ট্রাক, ৪১০৯ খানি মোটর কার তৈরি করেছে। এই চার মাসে (১৯৬৭ সালে) তার উৎপাদন ছিল, ট্রাক ৮১৭ আর কার ৩৭২৪। কুপার ইঞ্জিনীয়ারিং (বোম্বাই) জানিয়েছিল যে, তাদের ডিজেল ইঞ্জিনের কারখানায় প্রচুর মুনাফা হবে। লিক্ষ মেসিনারির চেয়ারম্যান বলেছিলেন, তাঁদের লিস্টার মেসিনের চাহিদা ভীষণ বেড়ে গেছে। কুপার ইঞ্জিনীয়ারিং-এর চেয়ারম্যান জানিয়েছিলেন, তাঁদের সুতী কলের মেসিনের চাহিদা ক্রম-বর্দ্ধমান। মুকুন্দ আয়রণ এণ্ড ষ্টীলের চেয়ারম্যান শেয়ার হোল্ডারদের জানিয়েছিলেন, তাঁদের কোম্পানী প্রথম ছ মাসে সাড়ে সাত শত কোটি টাকার মাল বেচেছেন। ৬৭তে বিক্রীর পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। লরসন এণ্ড টৌবরো কোম্পানীর (বোম্বাই) চেয়ারম্যান বলেছিলেন, ৬৭র চেয়ে ৬৮তে উৎপাদন ৩৫ শতাংশ

বেশি হবে। মন্দার বাজারে বড় বড় প্রায় সব কোম্পানীর সব কিছুই বেড়েছে,—বেড়েছে বাংলার বাইরের ছোট শিল্পগুলোর উৎপাদন। বাড়েনি শুধু বাংলার। কংগ্রেসীদের এবং নেতার দলের চিৎকার, ঘেরাও শ্রমিক বিক্ষোভ পশ্চিম বাংলার বিপুল সংকটের একমাত্র কারণ। দলীয় সংহতি বজায় রাখতে দেশী কংগ্রেসীর দলও সুরে সুর মিলিয়েছে। কিন্তু অবাঙালী প্রাদেশিকতা, কেন্দ্রীয় সরকারের (অবশ্যই নেতা নির্ভর) বিমাতৃ সুলভ বদমাসী যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বাঁচার অধিকার হরণের প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, একবারও মুখ ফুটে বলেন নি। কারণ? কারণ নিশ্চই আছে—নেতা হওয়া তো নিজের আখের গোছানোর জন্যে। জনগণের সেবার ধার কে ধারে? আর ১৯৬৩-৬৮ সাল পর্যন্ত বিড়লা গোষ্ঠী কংগ্রেসকে মাত্র সাড়ে আটত্রিশ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে (অবশ্যই চাঁদা হিসাবে) ৩৮০ কোটি টাকা কামাবার সুযোগ করে নিয়েছে। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের শ্লোগানধারী কংগ্রেসের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের দিয়ে দেশসেবা করিয়ে নেওয়ার কি সুন্দর নমুনা! আর টাটাদের গুজরাটের মিঠাপুরে সার তৈরি করার কারখানা? খরচ হবে ২০০ কোটি টাকা মাত্র। টাটারা দেবেন ৫ কোটি, বাকি ১৯৫ কোটি টাকার মধ্যে ২০ কোটি টাকা শেয়ার, বাকিটা দিতে হবে সরকারী লগ্নী সংস্থাগুলোকে। না বললে তো চলবে না, চাঁদার টাকা কি এমনি এমনি দেওয়া হয়?

বাংলাদেশ তথা কলকাতা ছিল সৌভাগ্যের স্বর্ণখনি। অবাধ সহুরে স্বাধীনতা প্রাপ্তির তেইশ বছরে গুজরাটি, মাড়োয়ারী অবাঙালী ব্যবসাদারের দল নরক গুলজার করেছে। বাঙ্গালী সংকীর্ণচেতা, তাই দিনের পর দিন মার খাচ্ছে। ফাটকাবাজি, জালিয়াতির প্রতিবাদ না করে রাজনীতির কোন্দল নিয়ে মত্ত থেকে তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা দেওয়ার সময় পাচ্ছে না। আজকের দুটাকার মাল কাল দশ টাকা হলে কি এসে যায়? খেয়ে পরে বাঁচতে গেলে

যে কোন মূল্যেই বাঁচতে হবে। কিন্তু বোম্বাই সর্বভারতীয়ের সাধন পীঠে (তেইশ বছরেই তার বাড় বাড়ন্ত) সর্বভারতীয়তা ছাড়াবার মতলব নিয়ে শিবসেনার জন্ম। মুসলিম লীগকে যেমন মদত দিয়েছিল ইংরেজ, তেমনি শিবসেনাদের মদত দিয়েছে কংগ্রেস। অবশ্য শিবসেনা দলের (যদিও এ দলটি গুণ্ডা-বদমাস, পকেটমার চোর জোচ্চরে ভর্তি) আদর্শ কমিউনিষ্ট-বিরোধী বলে প্রচারিত হয়। ব্যাস আর যায় কোথা, বোম্বাইয়ের কংগ্রেসীরা এবং শিল্পপাতর দল দুহাত তুলে এগিয়ে আসে। কারণ, জুজুর ভয়ের মত কংগ্রেসীদের কমিউনিষ্ট-ভীতি প্রবল। আমেরিকার তাঁবেদার কংগ্রেসী সরকার (বর্তমানে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, রাশিয়ারও) কমিউনিষ্ট নিধনে অক্লান্ত। যদিও মুসলিম লীগের মত সম্প্রদায়িকতাব ভিত্তিতে জন্মগ্রহণ করা দল সম্বন্ধে তাঁরা উদার। কিন্তু কমিউনিষ্টদের শত্রু পরিচয় দিলেই প্রাণের ধন।

কিন্তু শিবসেনারা যে কমিউনিষ্ট-বিরোধী দল নয় তার প্রমাণ, ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভি, কে, কৃষ্ণমেনন বোম্বাই থেকে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে মাননীয় এস, কে, পাতিল ঘোষণা করেন, মেনন স্থানীয় লোক নন, তাঁর বোম্বাইতে দাঁড়ানো উচিত নয়। কারণ, মহারাষ্ট্র অ-মহারাষ্ট্রীয়দের জন্যে নয়। তবু যখন ভারতীয় নাগরিকের অধিকার নিয়ে মেনন বোম্বাই থেকেই নির্বাচন প্রার্থী হলেন তখন শিবসেনার দলকে মেননের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিলেন। আর শিবসেনার দল মেননের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারের নামে পাইকারী হারে দক্ষিণ ভারতীয়দের খুন-জখম করতে লাগল, বিষয় সম্পত্তি পুড়িয়ে দিতে লাগল। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড়—কংগ্রেসীরা নীরব। পরে দেখা গেল, শিবসেনাদের নায়ক বাল থ্যাকারের সঙ্গে মার্কিণ গুপ্তচর বিভাগের ঘনিষ্ট যোগসূত্র রয়েছে।

আবার ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সুরু

হল শিবসেনার তাণ্ডব নৃত্য। অ-মহারাষ্ট্রীয়দের খুন জখম, লুঠ পাট, অগ্নিসংযোগ (কংগ্রেসের বড় সমর্থক জি, ডি, বিড়লার একটা অতি সুদর্শন শো রুমও পুড়ে যায়)—সবশেষে হিসাবে ৪০ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট (অবশ্য কিছু মহারাষ্ট্রীয়ের সম্পত্তিও নষ্ট হয়েছিল। লুঠপাটের সময় কি বাছাবাছির ধার ধারলে চলে?)। চারদিনের যে গুণ্ডাশাহী কায়েম হয়েছিল বোম্বাইয়ে সেটা দমন করার কোন চেষ্টা হয়নি পুলিশের তরফ থেকে। বরং তারা নিরীহ পথচারীদের গুলি করে হত্যা করেছে (স্বাধীন ভারতে পুলিশের তাই কাজ)। সাহায্য চাওয়া হলে দূরে দাঁড়িয়ে হেসেছে (না হেসে উপায় কি, কংগ্রেসের নীতি তারা পালন করবে তো!)। এবং সেই হত্যাকাণ্ডের সময় বার্ষিক উৎসবে যোগ দেন অনেক কংগ্রেসী নেতারা। বোম্বাইয়ের গুণ্ডাবাজী সম্পর্কে সেদিন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়েক যে বেতার ভাষণ দেন তাতে তিনি, শিবসেনাই যে অরাজকতার জন্যে দায়ী, বলতে ভুলে গিয়েছিলেন।

আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মারাঠা বীর চবনলাল?

হরি-হরি! তিনি যে মারাঠী। মারাঠা শিবসেনাদের নৃত্য তাঁকে সহ্য করতেই হবে। না হলে যে সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ হবে না। অ-মহারাষ্ট্রীয়রা মহারাষ্ট্রে শিকড় গাড়বে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে?

এখানে পাটের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন জাতীয় আয়। এখানে ডাল কলাই ইত্যাদি নিয়ে অবাঙালী ব্যবসাদাররা নিশ্চই ফাটকাবাজী করবে। এখানে খুনোখুনি বন্ধ করার অজুহাতে, বাড়ানো হবে। এখানে বিশেষ বিশেষ দলের রাজনৈতিক কর্মীদের অবাধে পেটানো হবে। ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়ে পিছন থেকে গুলি করে মারা হবে। রাজনীতি করার শাস্তি এখানে বড় মৃদু! যেমন, গুহ্যদ্বারে লোহার রড পুরে দেওয়া, বরফ চাপা দেওয়া, শিক্ষিত ছেলেকে চিরদিনের মত অকর্মণ্য পঙ্গু

করে দেওয়া, শাস্তি ভোগ কালে গুলি করে বা পিটিয়ে মারা, বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কোথাও না কোথাও মেরে ফেলা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে মেরে রাজনৈতিক খুন বলে প্রচার করা, পুলিশ মিলিটারী দিয়ে বাড়ির উঠতি ছেলেদের ধরে নিয়ে যাওয়া (যার অর্থ, রাজনীতি করাতে উৎসাহ দান)। এখানে বাংলা ও বাঙ্গালীর সংহতি নষ্ট করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টায় শতেক কৌশল প্রয়োগ। মিরজাফরের দল প্রস্তুত। কেউ প্রকাশ্যে—কেউ অন্তরালে আফিং কেনার ধান্দা খুঁজছে। বাংলা মরছে—মরুক। বাঙ্গালী মরছে—মরুক। অবশ্য সবই অভিযোগ। এ অভিযোগ কি মিথ্যা?

শুধু বাঙ্গালী মরছে না। মারা হচ্ছে বিহারকে, আসামকে, উড়িষ্যাকে। দেশ অথবা জাতি নয়, দল বজায় রাখাই একমাত্র কাজ। বড় তরফের বড় কর্তারা যদি দেশের জন্যে রাজ্যপাটের বিলি ব্যবস্থা গুছিয়ে নেয়তো নিক,--নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ বজায় থাকলেই হল।

কিন্তু কেন?

কেন এই অবিচার? নীতিহীন স্বার্থপরতার নির্লজ্জ বেসাতি?

ভারতবর্ষ এক। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ এক প্রাণ—একতা। কোথায় একতা? গণতন্ত্রের ধ্বজায় সমাজতন্ত্রের সাধনা কোথায়? ভিক্ষার স্বাধীনতা শুধু বিশেষ বিশেষ প্রদেশের মানুষ আর সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্যেই কি নেওয়া হয়েছিল? তা যদি না হবে তাহলে সাধারণ মানুষের জীবন স্বাধীনতালাভের তেইশ বছর পরেও অনিশ্চিতের অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কেন? মার খাচ্ছে কেন সমগ্র ভারতের সর্বহারার দল?

কেন? কেন? কেন?

সুরজমল নাগরমলের ম্যানেজিং এজেন্ট বাজোরিয়া ও জালানদের উত্থানের ইতিহাস কম চমকপ্রদ নয়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাজোরিয়া পরিবার কলকাতায় এসেছিল ভাগ্যান্বেষণে। প্রথমে শুধুমাত্র পণ্যের দালালি, পরে মাল কেনা বেচা সুরু করে। বাজোরিয়া পরিবারের জামাই জালানও একদিন কলকাতায় আসে ব্যবসায় যোগ দিতে। জালানরা বাজোরিয়াদের ব্যবসার অংশীদার হয়। প্রতিষ্ঠানের নাম পালটে রাখা হয় সুরজমল নাগরমল। ক্রমে এই সুরজমল-নাগরমলকে একদিন জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। ঐ কোম্পানী কটা পাট কল, চিনি কল কেনে এবং কয়েকটি শিল্প সংস্থার ম্যানেজিং এজেন্টস হয়।

সুরজমল-নাগরমল কোম্পানীর দ্রুত প্রসার-উন্নতি সুবিপুল অর্থ-সম্ভার—তাদের ব্যবসার নানা রকম অখ্যাতি রটার ফলে আয়কর বিভাগ সজাগ হয়। তারা আয়কর তদন্ত কমিশনকে তদন্ত করতে নির্দেশ দেয়। তদন্তের বিষয়গুলি :—

(১) চিরঞ্জীলাল বাজোরিয়া ও তাঁর ভাইয়েরা

(২) কে, ডি জালান, তাঁর ভাইয়েরা ও কাকা প্রভৃতিরা

(৩) এন, কে, জালান

যে সব কোম্পানী ও সংস্থা পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করেন সে সব কোম্পানীও সংস্থার শিল্প এবং বাণিজ্য কর্ম।

তদন্ত কমিশন সুরজমল-নাগরমলের বহু দুর্নীতির সন্ধান পান। যথা :—

১। রপ্তানী-বাণিজ্যে আণ্ডার ইনভয়েসিং

২। আমদানী বাণিজ্যে ওভার ইনভয়েসিং

৩। তাঁদের নিজস্ব ব্যবসায়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মারফৎ কাঁচা মাল ক্রয় বিক্রয়ে এবং

৪। আরও বহু রকম উপায়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও সমাজ বিরোধী কার্য কলাপের আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

কাষ্টমস্ ও আয়কর বিভাগ খবর পান, সুরজমল-নাগরমলের অংশীদাররা তদন্ত কমিশনকে সব তথ্য জানতে দেয়নি ও সরকারকে তাঁর প্রাপ্য কোটি কোটি টাকা কর থেকে বঞ্চিত করছে। মহাত্মা গান্ধী রোডে জালানদের বাড়িতে একদিন অকস্মাৎ পুলিশের সাহায্যে কাষ্টমস্ ও আয়কর বিভাগ চড়াও হয়ে তদন্ত চালান। জালান পরিবারের আইনজ্ঞ (কে তিনি!) অনুসন্ধানে আপত্তি জানান। তবু অফিসারের দল কোন বাধা না শুনে অনুসন্ধান চালান। বার করেন হিসাবের বাইরের রাশি রাশি টাকা, দলিলপত্তর, বে-আইনী সোনা ইত্যাদি-ইত্যাদি।

শুধু জালান-বাজোরিয়া নয়, গোয়েঙ্কা প্রভৃতিদের বিরুদ্ধেও বহুবার কর ফাঁকির বহু অভিযোগ উঠেছে—অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে টাটা-বিড়লাদের ব্যাপারেও। অভিযোগ উঠেছে নরহত্যার, বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাতের। কিন্তু কিছুই হয়নি। বরাবর সাতখুন মাপ হয়ে গেছে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তাদের কোটি কোটি টাকার অর্থ সাহায্য দিয়েছে। এবং সেই টাকা যথা সময়ে তারা সরকারকে ভুল বুঝিয়ে নিজেরা আত্মসাৎ করেছে। সরকারী হোমরা চোমরা মন্ত্রীর দল শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে সাধারণের টাকা ফাঁকিতে চেলেছে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে ধনী হয়েছে আরো ধনী—গরীব আরো গরীব। শহর ঘিরে গড়ে উঠেছে ইমারত—গ্রামের পর্ণকুটীর পড়েছে হেলে, সভ্যতার পিলসুজ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে অর্দ্ধহারে অনাহারে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ।

মানুষ দেখছে আর দেখছে। শুধু দেখার জন্যেই জন্মেছে যেন সে। দেখছে, স্বাধীনতার হীনতায় তার মরার বাড়া হয়ে বাঁচা। দেখছে, তার মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনি মিনি খেলা। দেখছে, তাকে

তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার শতেক অপকৌশল। দেখছে আর ভাবছে। না, ভাবতে পারছে না সে। ভাববার অবসর কোথায় তার? সে ছুটে চলেছে—ছুটছে—ছুটছে আর ছুটছে। হোঁচট খাচ্ছে, পদে পদে তার বাধা, যন্ত্রণা-দাহ। তবু ছুটছে, আর ছুটতে ছুটতে ভাবছে, কোথায় চলেছি? কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? কোথায় যেতে চেয়েছিলাম? কোথায় যাচ্ছি?

আমরা আশ্রয় চেয়েছি, নিরাপত্তা চেয়েছি, শান্তি চেয়েছি।

কেন এই অশান্তি—হাহাকার—কান্না?

কারা আমাদের আশ্রয় কেড়ে নিয়েছে? নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে? শান্তির পথ অবরুদ্ধ করেছে?

তারা কারা? কোন্ স্বার্থে তারা অভিলাষী। দোষী কি আমরা? আমাদের অসংখ্য জীবন অথবা পথের ভ্রান্তি? কোন্‌টা—কোন্‌টা সত্য?

আমরা কোথায় চলেছি?

আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন মাষ্টারমশাই। বলাই সাধুখাঁর কণ্ঠস্বর। লজ্জার ক্ষমা প্রার্থনা। বলাই সাধুখাঁ কোন অন্যায় না করেই ক্ষমা চেয়েছে।

কৌতুক অনুভব করেছিল বিনোদ। বলেছিল, ক্ষমা চাইলেই কি ক্ষমা পাওয়া যায়?

—আপনি বিশ্বাস করুন মাষ্টারমশাই, সেদিন যখন আমরা গেলুম, তখনও বুঝতে পারিনি, আপনি খুন হয়েছেন। সকালে সময়

পাবনা বলে, আগের দিন বিকালে দেখা করে এসেছিলাম কমলের সঙ্গে। লজ্জিত কণ্ঠে বলেছিল, আপনার কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে, বিনোদ কিছু বলার আগেই বলেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার কথাটাও আমার মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, বড় অন্যায় হয়েছে। তীর্থ দর্শনে চলেছি, চেনা পরিচিত সকলকেই বলেছি, দেখা করে এসেছি সকলের সঙ্গে, কিন্তু আপনি আমার চেনা জানার একজন হলেও, আপনার কথা ভুলে গেছি। আমি যেন…… …

হেসে ফেলেছিল সে। সহজ সরল মনের অধিকারী মানুষটার স্বীকারোক্তিতে নিজেই লজ্জা পেয়েছিল বারবার। বলেছিল, দেখা করাটা তো আমারই উচিত ছিল।

আশ্চর্য হয়েছিল বলাই সাধুখাঁ। কিন্তু কিন্তু করে বলেছিল, একি বলছেন আপনি, মাষ্টারমশাই?

—আমিও সত্যি কথাই বলছি। হেসেছিল বিনোদ। কমলের মারফৎ আপনার সঙ্গে আমার আলাপ, তার সঙ্গে আপনার ওখানে আমার যাওয়া-আসা। সে যখন অসুখে শয্যা গ্রহণ করলো, তখন তাকে দেখতে যেতে পারলাম আমি, দু পা এগিয়ে একদিনও আপনার সঙ্গে দেখা করে এলুম না।

—তাতে কি হয়েছে, আমি জানি আপনি কাজের মানুষ। আমার ওখানে যে যান, কত ভাগ্য আমার। একটু থেমেছিল বলাই সাধুখাঁ। বলেছিল, কিন্তু মাষ্টারমশাই, একাজ কারা করলে?

সেই এক প্রশ্ন, জানতে চেয়েছে সকলেই। কাদের একাজ? বিনোদ নিশ্চই তাদের চিনতে পেরেছে, নাম বলুক। কিন্তু তারপর? যদি তাদের চিনেই থাকে সে, যদি নাম বলে,—কি হবে? পুলিশ তাদের ধরবে। হয়তো বা ধরবে না। সন্দেহ? সন্দেহটা মিথ্যা কি? হয়তো মিথ্যা নয়। অভিযোগ, শুধু আজ আর অভিযোগ

নয়। কটা মাসের এই যে খুনোখুনী—বলতে পারা যায় দীর্ঘদিনের; নতুন নয়—খুনোখুনীর রাজনীতি ইদানীং কেবল মাত্র বেড়েছে। খুনোখুনী ছিল—হয়তো বা থাকবে। কিন্তু কেন?

আজকের এই যে খুন জখম, একি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে? বিনোদ কি রাজনৈতিক খুন হয়েছে? অথবা সেই বাচ্চা ছেলেটা, যে ছেলেটাকে কজন মিলে মারতে চেয়েছিল, মাস্টার আদেশ জানতে চেয়েছিল, আরো কজনের নাম?

কাগজে প্রতিদিনের খবর, অমুক দলের কর্মী অমুক দল কর্তৃক নিহত। অমুক দলের সঙ্গে অমুক দলের সংঘর্ষ। মূলে কি রাজনৈতিক বিবাদ? সব ক্ষেত্রে নয়। ব্যক্তিগত আক্রোশ, তুচ্ছ কারণের পরিণতি। কুকুর মরলো দলহীন গৃহস্থের, শুরু হল দু দলের সংঘর্ষ। গৃহস্থকে কোন দলে যেতে হল। কুকুরটাই দল ঠিক করে দিয়ে হাসতে হাসতে যাত্রা করলো মহাপ্রস্থানের পথে। হাসতে হাসতে গেল এইজন্যে, সে যদি চলন্ত বাসের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে না মরে, স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতো তার, তাহলে পুরানো মণিব তার মরা দেহটাকে আস্তাবলে ফেলে দিয়ে একটা নতুন কুকুরের নতুন মণিব হতো নিশ্চই, তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মৃত্যু উৎসবে কটা প্রাণ বলি দেখে না হেসে পারলো না,—তার জীবনের মূল্য মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক—অনেক বেশি। একটা পশুর জীবনের বিনিময়ে অনেকগুলো তাজা প্রাণের রক্ত ঝরে অবলীলায়।

তাকে নীরব থাকতে দেখে বলাই সাধুখাঁ জিজ্ঞাসা করেছিল, কি ভাবছেন মাষ্টারমশাই?

হেসেছিল বিনোদ। বলেছিল, কিছু ভাবতে চাইছিনা আমি।

—কেন মাষ্টারমশাই?

—আমি ভাবতে চাই না।

—কেন?

—আমি ভুলতে চাই।

অবাক হল বলাই সাধুখাঁ। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, ভুলতে চাইলেই তো ভোলা যায়না মাষ্টারমশাই।

—কি? চমকে উঠেছিল বিনোদ।

—সব—সব কিছুই।

—কেন?

—তা ঠিক জানিনা। স্বীকার করেছিল বলাই সাধুখাঁ। আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। সব কথা গুছিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু মাষ্টারমশাই, আমার মনে হয়েছে, কিছুই ভোলা যায় না। একদিন-না-একদিন গোপন পাপ পারা হয়ে ফুটে উঠবেই। পাপকে গোপন করলে পাপ কি গোপন থাকে?

—থাকে না?

—না মাষ্টারমশাই, থাকে না। থাকতে পারে না। সে গোপন পাপই আজ পারা হয়ে ফুটে উঠেছে। শতেক কৌশলে পাপীরা ঢাকতে চাইছে পারা। নিষ্পাপীর দল কেউ পারাকে—কেউ বা পাপীকে শেষ করতে চাইছে। আর জানেন, কে পাপী আর কে পাপী নয়, ভুল হচ্ছে সেখানে। কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য পারার বিনাশ।

—আমি তাহলে……

হেসেছিল বলাই সাধুখাঁ। বলেছিল, ভুলের শিকার। ভুল যারা করেছে, জেনে শুনেই করেছে। ভুল না করে তাদের উপায় ছিল না। ভুল করার জন্যেই ভুল করেছে তারা। অথবা বলতে পারেন, ভুল করানো হচ্ছে তাদের দিয়ে।

অবাক বিনোদ প্রশ্ন করেছিল, কেন?

—কেন? গম্ভীর হয়েছিল বলাই সাধুখাঁ। বলেছিল, এক একখানা গ্রামে একজন মোড়ল থাকতো মাষ্টারমশাই। মোড়ল ছিল গ্রামের মাথা। মোড়ল গ্রামবাসীদের মরতে বললে মরতো, বাঁচতে বললে বাঁচতো। কেউ চিন্তা করতো না কেন মরবে তারা? সে

দিন আজ আর নেই। কিন্তু সে গ্রাম আজও আছে। আছে সেই গ্রামের মানুষ। শুধু জড়ো হয়েছে বহু মোড়ল। ভাগ করে নিয়েছে মানুষগুলোকে। একমাত্র শত্রু জমিদার। জমিদারকে শেষ করতে চায় তারা। শেষ বলতে, জমিদারকেও সকলের একজন হতে হবে। একসঙ্গে চলতে হবে সকল মানুষের সঙ্গে। মোড়লের দল জমিদারের বিরুদ্ধে জেহাদ জানায়। একদল বলে, জমির খাজনা কমাতে হবে, কারণ, এ বছর আজন্মা। একদল বলে, তিন বছরের খাজনা মকুব করতে হবে। একদল বলে, খাজনা টাজনা দোব না আমরা। জমিদার বলে, বেশ-বেশ, এ বছর খাজনা দিও না। অন্যদলের চাপে বলে, ঠিক আছে তিন বছরের খাজনার কথাটা ভেবে দেখবো। অন্যদলের কথায় বলে, খাজনাটা বন্ধ করলে কি চলে? এর মধ্যে আবার আর একদল বলে, ওসব খাজনা টাজনা নয়, জমি আমাদের, জমির মালিক সবাই, জমিদার বলে কেউ নেই—কেউ থাকবে না। সুরু হয়ে যায় লাঠা-লাঠি। মার দেওয়া হয় শেষের দলটাকে। সব দলের সঙ্গে জমিদারও এগিয়ে আসে। সেটা মিটতে না মিটতে সুরু হয় নিজেদের মধ্যে। কারণ, সন্দেহ। সন্দেহ থেকেই সংঘর্ষ। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ। সকলের চোখে সকলে দালাল। একটা গ্রামের মানুষ অনেক মোড়েলের হাতে পড়ে ছন্নছাড়া হয়ে এ ওকে মারছে, ও একে মারছে। আর মোড়লের দল? তারা সকলেই আলাদা, আবার এক। তাদের মোড়লিটা থাকলেই হল। চুপ করেছিল বলাই সাধুখাঁ। বলেছিল, আমার সবচেয়ে দুঃখ কোথায় জানেন মাষ্টারমশাই, আমরা যখন সবাই এক, আমাদের সকলের উদ্দেশ্যও যখন অভিন্ন তখন আমরা ভিন্ন হয়ে আছি কেন? কেন আমরা একসঙ্গে হচ্ছিনা? একসঙ্গে না হলে কি কোন কাজ হয়, আপনিই বলুন?

—একসঙ্গে হওয়া কি সম্ভব?

—কেন সম্ভব নয় মাষ্টার মশাই?

—কি জানি।

—নিশ্চই জানেন, বলবেন না।

—না-না, সত্যিই আমি জানিনা।

—জানেন না? একটু যেন হতাশ হয়েছিল বলাই সাধুখাঁ। বলেছিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো মাষ্টার মশাই? বলুন, সত্যি উত্তর দেবেন?

—জানা থাকলে নিশ্চই দেব।

—মনে করুন, আপনি আর আপনার ভাই। একই বাপের ঔরষজাত, একই মায়ের সন্তান। একই সঙ্গে ওঠা বসা খাওয়া দাওয়া, কিন্তু কর্মক্ষেত্র আপনাদের আলাদা, আপনারা ভিন্ন মত এবং পথের পথিক। শাসক শ্রেণীর শোষণ মুক্তির প্রতিজ্ঞা আপনাদের দুজনেরই। কিন্তু দুজনের মত-পার্থক্য বড় বেশি আপনাদের। সেক্ষেত্রে আপনি বা আপনার ভাই কি পরস্পরের শত্রু?

—শত্রু কেন হবে?

—তাই হচ্ছে মাষ্টার মশাই। রক্তের সম্বন্ধ নয়, রাজনীতির দাবা খেলাটাই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা এক হতে পারছি না, একসঙ্গে হতে দিচ্ছেনা রাজনৈতিক মতবাদ। আমরা পরস্পরকে আঘাত হানছি, দুর্বল হচ্ছি, ভাইয়ের মৃত্যুতে গুমরে কাঁদছি অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে—তবু এক হতে পারছি না। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ, ভারতের অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নির্যাতীতের দল, আমরা এক। আমরা শাসকের অন্যায় শাসন রুদ্ধ করবো, আমরা ধনীকের শোষণ শেষ করবো। আমরা একসঙ্গে বাঁচবো, আমরা বাঁচতে চাই। আমরা মুক্তি চাই। কেন-কেন, আমরা তা পারছিনা মাষ্টার মশাই?

বলাই সাধুখাঁর সেই আকুল প্রশ্নটা যেন এখন—এই মুহূর্তে স্পষ্ট শুনতে পেল বিনোদ। বলাই সাধুখাঁ যেন প্রশ্ন করছে। জানতে চাইছে। কেন আমরা এক হয়েও, এক নই? কোথায় বাধা? কিসের বাধা? সে বাধা কি অনড় অটল? মানুষের অসাধ্য কি সে বাধা অপসারিত করা?

মানুষ। ভারতবর্ষের মানুষ। লক্ষ কোটি অন্তরে তার একটি মাত্র প্রশ্ন, কেন-কেন-কেন?

কেন আমরা স্বাধীন হয়েও মুক্ত নই?

কেন আমরা সুস্থ ভাবে বাঁচার অধিকার হারা হয়ে আছি?

কেন আমরা দিনের পর দিন মার খাচ্ছি, মরছি?

কেন? কেন? কেন?

শাসক শ্রেণীর অন্যায়, অহমিকা, দম্ভ, অহঙ্কার, আত্মতোষণ নীতি আমাদের জীবনকে মনুষত্ব হীনতার চরম পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে গেছে। দুর্নীতির বীজ বপন করেছে আমাদের মধ্যে। অভাব আমাদের আত্মসুখী হতে প্ররোচিত করেছে। আমাদের একদল ক্ষুদ্রতর স্বার্থের পূজারী হয়ে দেখা দিয়েছে। হাত মিলিয়েছে শাসক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে। জাতীয়তাবাদের মেরুদণ্ডে আঘাত হেনেছে শাসক শ্রেণী। আমাদের এক হতে দেয়নি—দিচ্ছে না। আমরা এক হয়েও পৃথক, একই সরাইখানায় ভিন্ন পথের পথিক।

সে জানতে চেয়েছিল, দেশ ভ্রমণ কেমন হল?

বলাই সাধুখাঁ যেন বুঝতে পেরেছিল, বিনোদ অন্য কথা বলতে চায়—শুনতে চায়। বলেছিল, মাঝে মাঝেই আমার বাইরে যাওয়ার রোগ আছে মাষ্টার মশাই। আমি সাধু মহাপুরুষ নই যে, এই আমার কাশী মথুরা বৃন্দাবন বলবো। সংসার নেই যে, আষ্টে পিষ্টে জড়ি জাপ্টি হয়ে পড়ে থাকবো। একলা মানুষ, মনটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে

পড়তে চায় বলেই বেরিয়ে পড়ি। ভাল লাগে নতুন নতুন দেশ দেখতে, মন্দিরের ঠাকুর দেখি, পথের মানুষ দেখি। রথ দেখা আর কলা বেচা দুইই চলে আমার। অভিজ্ঞতা প্রতিবারেই কিছু না কিছু হয়। মানিয়ে নিই। কিন্তু মাষ্টারমশাই, এবারের অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন কিছুটা।

—কি রকম ?

—এবার আমার সঙ্গী ছিল এক ছোকরা। ক'জায়গায় ঘোরার পর বললে, দিল্লী যাবো। গেলুম দিল্লী। ছোকরা বললে, থাকবার জায়গার অভাব হবে না। বাঙ্গালীদের জন্যে ঠাকুর বাড়ির দ্বার সব সময়ের জন্যে মুক্ত। গিয়ে দেখলুম, সত্যিই মুক্ত মাষ্টার মশাই, অফিসে যেতেই চশমা চোখে, গাল তোবড়ানো, রং কালো, পাকা চুল ভদ্রলোক সোজা উন্মুক্ত দ্বার দেখিয়ে দিলে। জায়গা নেই। আমার সঙ্গের ছোকরা বললে, সেকি,আমরা কত আশা করে এসেছি। অফিসে একটি বুশ-জামা গায়ে দেওয়া বাবু ছিল, বললে, এসেছেন কেন, আমরা কি মাথার দিব্যি দিয়ে রাস্তা থেকে ধরে এনেছি ? শুনে মনে হল, বলিহারি—ধর্মশালা লেখা রয়েছে সাইন বোর্ডে, অধর্ম না করে ধর্মভাবে আশ্রয় কামনা করেছি, এই উত্তর ? আমার ছোকরা বললে, দেখুন না দাদা দয়া করে যদি···থামিয়ে দিয়ে এক উত্তর, হবে না, জায়গা নেই। এমন সময় স্যুটে বুটে এক ফ্যামিলী এল। আমাদের কথা কিছু শুনে বললেন ভদ্রলোক, ঘট টর···। ছোকরা বললে, না। তারপর চোখে চোখে ইসারা। অন্তরালে গমন। ফিরে এসে বললে, হল ঘরে থাকতে হবে, পারবেন ? তাই সই। দিন পাঁচ টাকা, খাওয়া থাকা। আর কাল সকালেই চলে যেতে হবে। তাই হবে, বলে রইলুম। রইলুম ধর্মশালার নিয়ম ভঙ্গ করে পাঁচটি দিন। আপত্তি ? আমার সঙ্গের ছোকরা বুঝে সুঝে মিটিয়ে ফেলে ছিল। ঘর পেয়েছিলুম তার পরদিনই। খেয়েছিলুম তিন দিন, কিন্তু ধর্মশালার হোটেলের নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ টাকা করেই

দিতে হয়েছিল। আর মাষ্টার মশাই, রাজধানীতে মানুষের শৃঙ্খলা বোধ দেখেছিলুম। বাসের লাইন যেন তিনটে সিনেমা হলের হাউস ফুলের লাইন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা। বাস আসছে, দুজন নামছে দুজন উঠছে। তিনজন থাকলে পরের লোককে লাইন ছেড়ে দিচ্ছে। আমার সঙ্গের ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, হ্যাঁ হে, দিল্লীর মানুষ—যাঁরা বাসে চড়েন তাঁদের সময়ের কোন দাম নেই, তাই না? আমার ছোকরা বলেছিল, সময়ের দাম যদি কড়ায় গণ্ডায় উশুল করে নিতে চাও তাহলে ট্যাক্সি চড়ো, নাহলে মোটর কেনো, অন্ততঃ স্কুটার একখানা।

মনে পড়ছে আরো অনেক কথা। মধ্যরাত্রির অন্ধকারে একাকী জাগ্রত বিনোদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে দৃশের পর দৃশ্য—কত কথা। সে জেগে উঠেছে।

হাসপাতালে থাকাকালীন একদিন রাত্রে তাকে জাগিয়েছিল ডিউটিরতা নার্স। জানতে চেয়েছিল, কি হয়েছে তার?

হাসপাতাল থেকে বিদায় নেবার আগের দিন বিনোদ তার নার্স'কে দিয়ে ওকে ডাকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ পরে আসবার পর হাসি মুখেই বলেছিল, আমার আগামী কাল ছুটি হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্তেই……

হেসেছিল সে। বলতে পারেনি, অবার আসবেন। ও কথা বলা যায় না।

বিনোদ বলেছিল, একটা কথা আমি জানতে চাইছি। একদিন আমি যখন ঘুমের ঘোরে গোঙাচ্ছিলাম, তখন কি আপনি আমার মৃত্যুর সময় হয়েছে বলে মনে করেছিলেন?

সে তেমনি হেসেছিল।

বিনোদ বলেছিল, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের কথা আমি ভুলবো না।

সে তেমনি হেসে বিদায় নিয়েছিল।

দেখা করে গিয়েছিলেন, দিনের বেলায় নার্স। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বিনোদবাবু জোর করে অনেক ওষুধ খাইয়েছি, ইন্‌জেকসন দিয়েছি—যখন হাঁটা-চলা করতে পারবেন স্বাভাবিকভাবে, একদিন আনবেন।

বিনোদ বলেছিল, আপনিও আসবেন একদিন।

—যাব। হেসেছিলেন তিনি, আর বিয়ের সময় নিমন্ত্রণ না করলেও যাব।

—অবাক হয়েছিল বিনোদ।

তিনি বলেছিলেন, মাষ্টারমশাইয়ের কাছে সব শুনেছি আপনার কথা। আমাদেরও তো ঘরসংসার আছে। জানতে ইচ্ছা করে না?

অমূল্যবাবু যাবার আগে বলেছিলেন, এ যাত্রায় ফিরে চললুম মাষ্টারমশাই। ডাক্তারবাবুরা বলছেন, অপারেশন করা উচিৎ হবে না। ওষুধ খাইয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। আবার হয়তো আসতে হবে। তখন ফিরতে পারবো কিনা জানি না।

ডাক্তার সান্ন্যালের গলাটা গম গম করে উঠেছিল, কি হে ছোকরা, অত মনোযোগ দিয়ে কার কথা ভাবছো?

উঠে বসেছিল বিনোদ। বলেছিল, আসুন ডাক্তারবাবু।

—আমার কথা নিশ্চয়ই ভাবছো না?

—আজ্ঞে আপনার কথাও আমার মনে হয়েছে।

—সর্বনাশ। আঁৎকে উঠেছিলেন তিনি। ভুলে যাও, ভুলে যাও। মনে কর আমাকে দেখনি, চেন না। ডাক্তার সতীকান্ত সান্ন্যাল নামে কেউ নেই।

—সে কি?

—হ্যাঁ, আমি থাকতে চাই না। অন্ততঃ তোমার মন থেকে আমি মুছে যেতে চাই।

—এ আপনি কি বলছেন ডাক্তারবাবু?

—বলছি কি হে, বলতে বাধ্য হচ্ছি। ভয়ে বলছি এ কথা। যে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে রোগীর প্রাণ ফিরিয়ে আনি, সেই মৃত্যুর ভয়েই এ কথা বলছি। মাষ্টার যখন, তখন তোমার হাতে বাধ্য ছাত্রের অভাব নিশ্চই নেই। একটা ছুরি বা বোমা ধরিয়ে দিয়ে কোনদিন পাঠিয়ে দিলেই হলো।

—কেন ?

—কেন কি হে ? তোমাকে আকথা-কুকথা কি কম বলেছি ? গুণ্ডা বদমাস বলেছি। অতএব আমি তোমার শত্রু। তোমাদের ভাষায় প্রতিক্রিয়াশীল দালাল। দালালকে নিশ্চই খতম করতে হবে।

—কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি তো বলেছি আমি রাজনীতি করিনা। রাজনীতি করা আমার কাজ নয়। আমি শিক্ষক।

—বটে বটে! হেসেছিলেন ডাক্তার সান্যাল। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, দেখ মাষ্টার, কিছু মনে কোর না। কথাটা তোমাকেই যে বলছি তাও নয়। তবে সব কিছু, অর্থাৎ যা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয়, আজ রাজনীতিই আমাদের জীবনের স্পেশাল কোয়ালি-ফিকেসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতি নামক সংক্রামক ব্যাধিটির হাত থেকে আজ আমাদের কারো নিস্তার নেই। দলীয় রাজনীতি আজ আমাদের জীবনের একমাত্র মানদণ্ড। মাষ্টার, তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছো, অনেক জনের সঙ্গে মেলামেশা তোমার, কেন এমন হল বলতে পারো ?

—আপনি.........

বাধা দিয়েছিলেন ডাঃ সান্যাল। বলেছিলেন, বাঙ্গালীর বহু দোষ, ত্রুটি কম নেই। কিন্তু বাঙ্গালীর যা আছে আমার অন্ততঃ মনে হয়, আর কারো তা নেই। সেই বাঙ্গালী কেমন করে দিনের পর দিন এমন সংকীর্ণচেতা হয়ে পড়ছে ? কেন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিভেদের বীজ ? কেন বাঙ্গালী একসঙ্গে পারছে না মাথা তুলে দাঁড়াতে ?

মাষ্টার, বাঙ্গালী যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সমস্ত ভারতবর্ষও যে মাথা তুলতে পারবে না।

—ডাক্তারবাবু·········

—মাষ্টার, একদিন আমি জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। সরে এসেছিলাম তখন, যখন দেখেছিলাম, অন্ততঃ আমার মনে হয়েছিল, জাতীয়তাবাদের অপমৃত্যু ঘটছে অনুভব করে। আরাম হারাম হ্যায়-এর বদলে হারামের পরিবর্তে আরামকে গ্রহণ করার সুযোগ নিশ্চই আমি নিতে পারতাম। আমার বিবেকে বেধেছিল। মাষ্টার, আমি অতি বদ লোক। অনেকের সঙ্গেই আমার মতের অমিল ঘটে পদে পদে। নিস্ফল আক্রোশে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাই। একি হচ্ছে মাষ্টার? কেন সমস্ত মানুষ এক হতে পারছে না?

—কেন?

—কেন? চিন্তা করেছিলেন ডাঃ সান্যাল। ম্লান কণ্ঠে বলেছিলেন, দুনিয়ার মানুষের মুক্তির স্বপ্ন আমি দেখি। দুনিয়ার মানুষের মুক্তির সংগ্রাম আমার আদর্শ। কিন্তু ভারতের মানুষের মুক্তির পথ সন্ধানই আমার জীবনের পথ, প্রথম এবং প্রধান।

—আপনার অপারেশনের টেবিলে?

—ঠাট্টা করছো মাষ্টার?

—আমি জানতে চাইছি।

—আমার কাছে?

—সকলের কাছেই।

—আমার উত্তর?

—আমি শুনতে চাই?

—আমাদের মুক্তি—সকলের মুক্তিই কাম্য। শাসন এবং শোষণ মুক্তির সংগ্রামে আমরা সবাই এক এবং অভিন্ন।

—তাকি সম্ভব ?

—যা অসম্ভব তা কিন্তু মিথ্যা নয় মাষ্টার। ইতিহাস তো মিথ্যা বলেনা। শোষিতের সংগ্রাম মাথা তোলে একসঙ্গে। বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে নয়, চূর্ণ করে।

—ডাক্তারবাবু!

—মাষ্টার, এ আমাদের জীবনের লজ্জা না অভিশাপ আমি বুঝতে পারি না। আমি বুঝতে পারি না মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণকে কেন বারবার স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। কোন্ স্বার্থে ?

—আমি জানিনা ডাক্তারবাবু।

—কিন্তু জানিনা বললে তো চলবে না বিনোদবাবু। জানিনা বলে দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে পাশ কাটাবার মনোভাব ত্যাগ করতে হবে।

—কি করবো ?

—জানেন না ? তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ডাঃ সান্যালের।

বিনোদ বিস্মিত, বিমূঢ়। ডাঃ সান্যালের নতুন সম্বোধনটায়, প্রশ্নের তীব্রতায় অসহায় বোধ করেছিল। বলেছিল, আমি, মানে ডাক্তারবাবু·········

হেসেছিলেন ডাঃ সান্যাল। নীরব হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে প্রসান্ত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, সাধারণ মানুষ বড় শান্তিপ্রিয়, তাই না মাষ্টার ?

—হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু।

—সাধারণ মানুষ নিশ্চই অশান্তি কামনা করে না ?

—না ডাক্তারবাবু।

—তাই সাধারণ মানুষকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয় মাষ্টার।

—কি ? চমকে উঠেছিল বিনোদ।

—তুমি একজন সাধারণ মানুষ, মাষ্টার। অশান্তি এড়াতে দিনের

পর দিন তুমি সব কিছু মেনে নিচ্ছ। তুমি সুখী হতে চাও, পার না। শান্তি কামনা কর, পাওনা। কিন্তু কেন মাষ্টার? কেন তুমি সুখী হতে পার না? শান্তি চেয়েও পাওনা। কেন?

—কেন?

আবার হেসেছিলেন ডাঃ সান্যাল। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, প্রশ্নটা আমি তোমাকেই করেছি।

—উত্তর আমার জানা নেই।

—কিন্তু জানা নেই বললেই তো চলবে না মাষ্টার—জানতে হবে। আর·········

—আর?

—আজ এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষকে, তোমাকে—আমাকে। আমাদের আজ আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। দূরে দাঁড়িয়ে থেকে বাঁচতে চাইলে বাঁচতে পারা যাবে না।

—কেন ডাক্তারবাবু?

—কেন তা বুঝতে পারছ না? কেন তুমি আঘাত পেলে? কার জন্যে তোমাকে আঘাত সহ্য করতে হোল? যে ছোট্ট ছেলেটাকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি মার খেলে, সে যদি মরেই যেতো, তাতে কি লাভ হোত—কোন্ উদ্দেশ্য সাধন হোত বলতে পারো?

—ডাক্তারবাবু······

—মাষ্টার, আজ তোমাকে আমাকে—প্রতিটি সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। বন্ধ করতে হবে এই অহেতুক হানাহানি।

—কেমন করে?

—ভাবতে হবে মাষ্টার। চিন্তা করে পথ সন্ধান করতে হবে। না হলে······

—কি?

—ব্যর্থ হয়ে যাবে মানুষের বাঁচার সংগ্রাম। মুক্তির পথের শেষে

কোনদিনই পৌঁছাতে পারা যাবে না। ভুলতে হবে বিভেদ। এক হতে হবে মাষ্টার। আমাদের সকলকে একসঙ্গে হাত মেলাতে হবে।

মাষ্টারমশাই, আমি আসবো—আমি এসে নিয়ে যাব আপনাকে। বলেছিল বলাই সাধুখাঁ।

সেই কণ্ঠস্বর। কত স্পষ্ট—এই যেন শুনলো সে। আমি আসবো মাষ্টারমাশাই, আমি আসবো। আমি এসে নিয়ে যাব আপনাকে।

এসেছিল বলাই সাধুখাঁ। কথা রেখেছিল তার।

কিন্তু.........

না-না-না। আর্ত চিৎকারে হাহাকার করে উঠলো বিনোদের অন্তরাত্মা। দুরন্ত আক্রোশে ফেটে পড়লো যেন সে, কেন? কেন? কেন?

আমরা বাঁচতে চাই, মুক্তি চাই। আমরা মানুষের অধিকারে বেঁচে থাকতে চাই। কে আমাদের অধিকারহারা করেছে? কাদের গোপন লিপ্সা আমাদের সুস্থ জীবনবোধে পরিপূর্ণ বাঁচার আকাঙ্খাকে আজ ভুলের সংকীর্ণতায় মাথা কুটে মারছে? তারা কারা? কারা আমাদের এক হতে দিচ্ছে না স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করে? কেন দিচ্ছে না? কেন?

আমার ভাই আজ আমার শত্রু। আমার বাবা আজ আমার চোখে শাসক শ্রেণীর কৃতদাস। আমি সাচ্চা। আমার মত এবং পথ ঠিক। আমার মতের বিরোধী, আমার পথে যে অন্তরায় সৃষ্টি করবে তার ক্ষমা নেই। আমার চোখে ভাইয়ের ভুল অক্ষমনীয়

অপরাধ। আমার চোখে আমার বাবার নীরব দাসত্ব ক্ষমার অযোগ্য। সেখানে বাধ্যতার কোন প্রশ্ন নেই, আমি চিন্তা করবো না, আমি যা পারি, বাবা তা পারে না। আমার দায় নেই, দায়িত্ব নেই—আমার বাবা সংসারের চাপে পিষ্ঠ-বিব্রত। বাবার অন্তরের মুক্তি কামনা আমার কাছে মূল্যহীন। আমার ভাইয়ের সংশোধনের পথ রুদ্ধ। শত্রু-শত্রু। সমাজ শত্রু, সংসার শত্রু। শত্রু আমার বাবা মা ভাই বোন, আত্মপরিজন। আমি তাদের বলবো না, তোমরা ভুল করছো—তোমরা অন্যায়কে সমর্থন করে রুদ্ধ করছো মুক্তির পথ। তোমরা মুক্তি চাও—আমিও চাই। এসো, আমরা আমাদের মত ও পথের পার্থক্য মিটিয়ে ফেলি —সন্ধান করি সত্য পথের, একটি পথ। উদ্দেশ্য যখন আমাদের একই, তখন কেন আমরা অযথা দ্বন্দ্বে মেতে ক্ষয় করি নিজেদের?

কেন পারি না? কেন পারবো না আমরা।

আমরা মানুষ। মনুষত্ব বোধে আমরা উজ্জ্বল দীপ্ত। মানুষকে আমরা ভালবাসি, সম্মান দিই মনুষ্যত্বকে। অযথা হানাহানি করে কেন আমরা দুর্ব্বল করে তুলি নিজেদের? একটি প্রাণের মূল্য তো কম নয়। প্রাণের মূল্য বোধকে কেন স্বীকৃতি দিচ্ছি না? জীবন যে অমূল্য। ভুলে ভরা জীবনের সংশোধণের পথ কি নেই?

কেন থাকবে না, আছে। কিন্তু ওরা—ওই শয়তানের দল, যারা আমাদের ঠকিয়েছে, আমাদের ধোঁকা দিয়েছে বারবার। আমাদের উপকারের নামে অপকার করেছে। সর্ব্বনাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে আমাদের ন্যায় বোধ, অন্যায় নীতির নিষ্পেষনে নীতিহীন করে তুলেছে আমাদের। সেই সুযোগে, আমাদের ক্ষণিকের বিভ্রান্তির কালে গলায় পরিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতা নামের সোনার শিকল। চালিয়েছে অবাধ শোষণ—নিষ্ঠুর শাসন। আমরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠেছি। ওরা ছুঁড়ে

দিয়েছে রুটির টুকরো। সে রুটিতে আমাদের পেট ভরেনি। পেট ভরতে না দেওয়ার ছলনা ওদের। প্রতিবাদ করেছি, আবার পেয়েছি রুটি। সেই পেট না-ভরার মত আহার। আমরা জানি আমাদের পেট ভরতে ওরা দেবে না। আমাদের পেট ভরানো ওদের সাধ্যের বাইরে। তাহলে যে ওদের শোষণ করার মত কিছু থাকবে না। আমরা মেনে নিয়েছি ওদের দয়ার দান, তাই শিকল ছিঁড়তে গিয়েও আমরা পারছি না।

শিকল কি তাহলে অটুট থাকবে? ওদের শাসন আর শোষণের শৃঙ্খল কি ছেঁড়া যাবে না কোনদিন?

কেন যাবে না? আমরাই ছিঁড়বো সে শিকল।

আর ওরা?

ওরা? ওরা কৃতদাস। ওরা শাসকশ্রেণীর ক্রীড়ানখে পরিণত হয়েছে। ওদের পথ ভুল। ওরা পারবে না। ওদের পক্ষে কোনদিন সম্ভব নয় শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। ওরা শত্রু। শত্রু ওই শাসকশ্রেণী। বিভ্রান্ত করছে মানুষকে। ভুল বোঝাচ্ছে। ক্ষমতার দম্ভে স্ফীত ওদের মন। ওরা—ওরা……

ওরা ছিল। ওরা আছে। কিন্তু আমরা?

আমরা কি করেছি? আমরা কি করছি? আমরা কি করবো?

কেন আমরা, ভারতবর্ষের প্রতিটি শোষিত মানুষ এক হতে পারবো না? কেন পারবো না?

আমরা বাঁচতে চাই। মুক্তি চাই। অধিকার চাই।

সেই অধিকার অর্জনের সংগ্রামে আমরা এক। আমরা একপ্রাণ—আমরা মানুষ। মানুষের বাঁচার লড়াই আমরা ব্যর্থ হতে দেব না।

আমি, বিনোদ। বিনোদের অন্তরাত্মা প্রবলবেগে মাথা তুললো। অভ্রভেদী হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরে তার আরোহণের প্রতিজ্ঞা।

সে যেন চিৎকার করে উঠলো, আমরা ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ এক। শত সহস্র লক্ষ কোটি নির্যাতিত মানুষের একই লক্ষ্য। আমরা ভাঙবো ওদের অন্যায়ের অচলায়তন। আমরা যুক্ত হবো, বাঁচবো। আমরা মুক্তি চাই—বাঁচতে চাই।

কিন্তু······

বলাই সাধুখাঁ গিয়েছিল। কথা রেখেছিল তার। বিনোদের বিদায়কালে পুলিশ প্রহরায় পৌঁছেছিল তার মৃতদেহটা। বলাই সাধুখাঁ খুন হয়েছিল তার দোকান ঘরের সামনে।

কেন?

কেন মরলো বলাই সাধুখাঁ?

কেন মারা হোল তাকে? কোন্ উদ্দেশে?

কেন-কেন-কেন?

অন্ধকার রাত্রি। আলো নেই। ঘুমিয়ে আছে সমস্ত জগৎ চরাচর।

আমি জেগে আছি। বিনোদ নামের একটা মানুষ, সমাজে সংসারে বারবার মার খাওয়া একটা মানুষের সমস্ত বোধ শক্তি নিয়ে আমি জেগে আছি। আমি জেগে থাকবো। পৃথিবীর ঘরে ঘরে অন্যায় আর অসতের মাঝে আমার জাগ্রত চেতনা। আমাকে মারা হয়েছিল। আমি মরিনি। আমি মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছি। আমাকে ফিরিয়ে এনেছে সমবেত চেষ্টা—আমি নিজেও ফিরতে চেয়েছি তাই আমি ফিরে এসেছি।

যদি না ফিরতুম?

যদি আমার ফিরে আসা সম্ভব না হোত?

জন্মিলে মরিতে হবে—আমি জানি, আমরা জানি। কিন্তু এতো মৃত্যু নয়, আত্মহনন, ধ্বংস। এ ধ্বংস আমি চাই না। আমি মরতে চাই—বাঁচতে চাই। বাঁচার জন্যে যে মরা সেতো শুধু মৃত্যু নয়, মৃত্যুর আর এক নাম জীবন, সেই জীবন আমার অকাম্য নয়। কিন্তু

একি? কেন এই ধ্বংসের পাশা খেলা? কোন্ মহৎ উদ্দেশে? কাদের স্বার্থে?

কেন মারা হচ্ছে আমাদের? কেন মরছি আমরা?

এই মৃত্যু উৎসবের মধ্যে দিয়ে কোন্ লক্ষ্যে আমাদের যাত্রা?

কোথায় চলেছি? কেন চলেছি?

আমরা কোথায় চলেছি?

কোথায়? কোথায়? কোথায়·········